মাসিক রহমত-এ প্রকাশিত কামরুজ্জামান লস্‌কর রহ এর
নিবন্ধসমূহের অনবদ্য সংকলন

কামরুজ্জামান লস্‌কর রহ.

হাবিলের কাক

সম্পাদনা

মনযূর আহ্‌মাদ

সম্পাদক, মাসিক রহমত

হাফেজ্জী পাবলিকেশন্স

আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা-১২১১

মোবাইল- ০১৯২৫৯৪০৭৫৬

কামরুজ্জামান লস্‌কর রহ.

হাবিলের কাক

সম্পাদনা ঃ মনযূর আহ্‌মাদ
সম্পাদক, মাসিক রহমত

প্রকাশক ঃ মাওলানা আব্দুল হান্নান
হাফেজ্জী পাবলিকেশন্স
জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া
আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
ফোন- ০১৯২৫৯৪০৭৫৬, ০১৭৫০১১১৪৫৯

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল-২০১১ইং

বর্ণ বিন্যাস ঃ তরজমা কম্পিউটার, হাজারীবাগ, ঢাকা।
মোবাইল- ০১৯২৫ ৯৪০৭৫৬

মূল্য ঃ ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকা

উৎসর্গ

তাদের জন্য

ইসলাম সে তো পরশমানিক
পেয়েছে তারে খুঁজি
পরশে তাহার সোনা হলো যারা
তাদেরেই মোরা বুঝি

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা
আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী আমরা গড়েছি
বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি

কেবল মুসলমানের লাগিয়া
আসেনিকো ইসলাম
সত্য যে চায় আল্লায় মানে
মুসলিম তারি নাম

সফল ব্যক্তির অনন্য ফসল

হৃদয়ের উপলব্ধিগুলো শব্দমালা কতটুকু প্রকাশ করতে সক্ষম তা অবশ্যই একটি প্রশ্নবোধক বিষয়। ভালোলাগা-মন্দলাগা রুচি ও হৃদয়জাত বিষয়। যতো সহজে বলা যায়, ভালো লেগেছে, ততো সহজে এই *ভালোলাগা* বুঝিয়ে বলা যায় না। শব্দ দিয়ে কষ্টের জাল বোনা যায়, আনন্দের বর্ণপাপড়ি ছড়ানো যায়, কখনো কখনো বিশেষ উদ্দেশ্যে শব্দজট সৃষ্টি করা যায়– কিন্তু যন্ত্রণাদগ্ধতার কথা, আত্মমর্মের কথা, বিশ্বাসের গভীর থেকে উৎসারিত আলোকমালা কি কোনো কায়িক বর্ণমালায় প্রকাশ করা যায়? সত্য বলা হবে যদি বলা হয়, মহাকঠিন বটে!

আমাদের প্রিয় লস্‌কর সাহেব এই *মহাকঠিন*কে জয় করেছেন, সহজ করেছেন। নিজস্ব গদ্যরীতি তাঁকে অনন্যতা দান করেছে। নিজের সাথে কথাবলার মতো করে তিনি সকলের সাথে কথা বলেছেন। আবেগ, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এখানে একাকার হয়ে গেছে। অহী বিশ্বাসের উত্তমসব উপমা তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর *হাবিলের কাকে*। মানুষের ভাবনার স্বচ্ছতা ও আবিলতার রূপগুলো বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে। সত্য মিথ্যার অবয়ব ও উপলব্ধি, ব্যাখ্যা ও ভাবনার বিশ্লেষণ-চিত্রণের অভিনব অভাবিত শত শত উদাহরণ তুলে ধরেছেন তিনি পাঠকদের জন্যে। তাঁর লেখায় একই সাথে দ্বীনদার ও দ্বীনহারা উভয়ের জন্য রয়েছে আবেগসিক্ত সুগভীর আবেদন। তাঁর নিবন্ধগুলোর শিরোনাম বলে দেবে কত ভিন্ন ও অন্যরকম তাঁর হৃদয়মথিত আকুতিগুলো! একটি জাতির প্রতি কী পরিণাম দরদ ও শুভকামনা তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীরে লালন করতেন তা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তাঁর প্রতিটি লেখার ভাজে ভাজে। তিনি শুধু মানুষ, মানবতা ও দ্বীনদারীকে ভালোবাসতেন। তাঁর একটিই দুঃখ ছিলো, আল্লাহর বান্দা আল্লাহর বন্দেগি থেকে গাফেল হতে পারে কিভাবে! কাবার প্রভু, প্রভুর কাবা এবং মদীনার রাসূল, রাসূলের মদীনার প্রতি তিনি তাঁর অন্তরে যে কী পরিমাণ প্রেম লালন করতেন তা পরিমাপ করা তাঁর মতো আরেকজনের পক্ষেই কেবল সম্ভব– আমরা কেবল তাঁর আবেগাকুল হৃদয় নির্ঝরিত অঝোর অশ্রুধারা দেখেছি। তাঁর মুখে গেলাফ আচ্ছাদিত কাবা, গেলাফমুক্ত কাবা এবং কাবার ভেতর বাইরের গল্প শুনেছি, মদীনার প্রতিটি বালুকণার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তি-ভাবালুতার অভিব্যক্তি তাঁর মুখ থেকে তন্ময় হয়ে শুনেছি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিলো কাবার মাটিতে, আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী হয়ে যেন তাঁর মৃত দেহটি কোথাও শুয়ে থাকার সুযোগ লাভ করে। আল্লাহ্‌ তাঁর সে বাসনা পূর্ণ করেছেন। তিনি হেরেমের নিকটেই ইন্তেকাল করেছেন, বাইতুল্লাহ-য় তাঁর জানাজা হয়েছে, জান্নাতুল মাওয়ায় তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। তিনি এখন কাবার চিরপ্রতিবেশী– যে আকাঙ্ক্ষা তিনি আজীবন হৃদয়ে লালন করতেন। আল্লাহ্‌ তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন, তাঁকেও কবুল করেছেন। আল্লাহ্‌ নিজ অনুগ্রহে তাঁকে তাঁর কাবার প্রতিবেশী হিসেবে কবুল করেছেন। তিনি আমাদের নিকট আল্লাহর একজন প্রিয়বান্দার প্রতিচ্ছবিরূপে চিরদিন অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

তাঁর অমরকৃতি এই বইটিও বেঁচে থাকবে চিরদিন। আল্লাহ্‌ আমাদের সকলকে তাঁর অনুগত বান্দা হিসেবে কবুল করুন। এ বইয়ের প্রতিটি পাঠককে উম্মাহর প্রতি অন্তত তাঁর মতো দরদ ও প্রভুভক্তি দান করুন। একমাত্র তিনিই হেদায়েতের মালিক। আমরা তাঁরই করুণা ও ক্ষমার ভিখারি। হে প্রভু! আপনি আমাদের সকলকে আপনার দ্বীনের জন্য কবুল করুন।

মনযুর আহ্‌মাদ
সম্পাদক, মাসিক *রহমত*

আব্বার জন্য দু'আ প্রার্থনা

আব্বা যখন জান্নাতবাসী হয়েছেন তখন আমি বয়সে অপরিণত-যুবক। তবে আব্বার সবকিছু আমার মনে আছে। তাঁর অবয়ব আমার দু' চোখের তারায় চাঁদের মতো ভাসে। এই চাঁদের আলোক-পরশে আমি নিসিক্ত হচ্ছি প্রতিমুহূর্ত। আমার মানস-মননে আমি তাঁকে সর্বক্ষণ উপলব্ধি করি। আমার মনে হয় তাঁর আদর-পরশেই এখন আমি বেড়ে উঠছি। আমাদের জন্য আব্বার আকুল দানে আমরা সবসময় কৃতজ্ঞতায় অবনত। আমাদের সুন্দর মসৃন ভবিষ্যতের জন্য তিনি কী না করেছেন! কিন্তু তাঁর জন্য আমরা কী করতে পারছি!

যখন শুনলাম আব্বার লেখাগুলোর একটি সংকলন প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন শ্রদ্ধেয় মনযূর কাকা, সেদিন আবেগে আপ্লুত হয়েছি এবং আব্বার জন্য কিছু করার সুযোগ খুঁজে পেয়েছি। আব্বার এই বইটি তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য উৎসর্গ করছি। বাজারে বইটির চাহিদা যতোদিন থাকবে ততোদিন মনযূর কাকাকে এটি সরবরাহ অব্যাহত রাখার অনুরোধ করছি। এ বইটির সত্ত্ব মনযূর কাকার হাতে তুলে দিচ্ছি। সাথে সাথে সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। সকলের নিকট আমার জান্নাতবাসী আব্বার মর্যাদা বুলন্দির জন্য একান্ত দু'আ প্রার্থনা করছি। আমরা যেন আব্বার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইহ-পরকালে সাফল্য লাভে ধন্য হতে পারি সকলের নিকট এই দু'আর দরখাস্ত পেশ করছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে ইহ-পরকালে চূড়ান্ত সাফল্য দানে মণ্ডিত করুন।

আহমাদুজ্জামান লস্কর জকি
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।

আমি আপ্লুত

আমরা লস্‌কর সাহেবের লেখার ভক্ত পাঠক ছিলাম। তাঁর দরদমাখা প্রতিটি লেখাই আমাদের আপ্লুত করতো। তাঁর লেখা যেই পড়তো সেই মুগ্ধতায় সিক্ত হতো। তিনি নেই, এখন বিভিন্ন প্রসঙ্গে শুধু তাঁর কথা মনে পড়ে। এই কঠিন সময়ে তাঁকে খুব বেশি মনে পড়ে। এই বিরল ব্যক্তির শূন্যতা কি কোনোভাবে কোনোদিন পূরণ হবে!

শুনতাম, তাঁর লেখার একটি সংকলন প্রকাশ হচ্ছে। সময় গড়িয়ে একসময় সেই প্রকাশের ভার যে আমাকে বহন করতে হবে তা ছিলো কল্পনার অতীত। নন্দিত লেখকের বই প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমি সত্যই আনন্দিত। বইটি সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তবুও পাঠকের দুরবিনে অনেক ভুল ধরা পড়বে। সুহৃদ পাঠক সেই ভুলগুলো আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের সুযোগ পাবো। বিনয়ের সাথে নিবেদন করবো, সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। হাফেজ্জী পাবলিকেশন্স এর পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম।

- প্রকাশক

সূচিপত্র

লাকুম দ্বীনুকুম ওলিয়াদীন

মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম জঘন্য পাপ হলো কাবিল কর্তৃক হাবিলকে হত্যা। হাবিলের লাশকে কেমন করে গুম করবে সেই চিন্তায় কাবিল যখন অস্থির, তখন আল্লাহ্ তা'আলা একটি কাক পাঠালেন তাকে নসিহত করতে। কাকটি একটি মৃত কাককে গর্ত খুড়ে মাটি-পাথর চাপা দিচ্ছিলো। এই দৃশ্য দেখে কাবিল অনুতপ্ত হয়ে বললো, *হায়! একটি কাকের বুদ্ধিও আমার নেই!* আজকের দুনিয়ায় যারা ইসলামকে কটাক্ষ করে, হেয় করে তাদের ওই কাকের বুদ্ধিটুকুও নেই।

'বল, হে কাফিররা! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা করো এবং তোমারাও তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।'

এ হচ্ছে সূরা কাফিরুনের পরিস্কার তরজমা। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, মুহাম্মদ রসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফজরের সুন্নত নামাজে পাঠ করার জন্য দু'টি সূরা উত্তম : ১. সূরা কাফিরুন ২. সূরা ইখলাস।

প্রতিদিন প্রত্যুষে নিদ্রা থেকে জেগে উঠে দিনের শুরুতে অদ্বিতীয় আল্লাহ পাকের দরবারে দাঁড়িয়ে একজন মুসলমান সর্বপ্রথম যে কথাগুলো উচ্চরণ

করবেন, তা এই হাদীসখানা থেকে জানা গেছে এবং নবীজি তাকে উত্তম বলেছেন।

কোনো রাখঢাক নয়, কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নয়, কোনো ঘোরপ্যাচ নয়, অত্যন্ত স্পষ্ট করে একজন মুসলমানের নিজের অবস্থান জেনে নিতে ও জানিয়ে দিতে এই সূরাটি নাজিল হয়েছে। নিজের ধর্ম ও অপরের ধর্মের সীমারেখা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে মুসলমানকে। অবিশ্বাসকারীকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে *অবিশ্বাসকারী* বলে সম্বোধন করতেও বলা হয়েছে। অবিশ্বাসকারীর উপাস্যকে অস্বীকার করতে বলা হয়েছে এবং অবিশ্বাসকারী আল্লাহর উপাসনা করে না একথাও জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে মুসলমানকে।

অবিশ্বাসীর কর্ম ও মুসলমানের কর্ম এক নয়। তাদের কর্মফল এবং মুসলমানের কর্মফল এক নয়। এই ঘোষণা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী প্রতিটি মুসলমানের।

ইদানিং আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির তথাকথিত মহাজনরা কথায় কথায় কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের প্রয়াস পাচ্ছেন। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতার সাফাই গাইতে তারা যখন সূরা কাফিরুনের উদ্ধৃতি দেন, তখন তাদের নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হতে হয়। যে অমুসলিমের মনকে জয় করার জন্য তারা *লাকুম* বাণী শুনিয়ে থাকেন, তারা সূরা কাফিরুন হয়তো পুরোটা পড়েননি। কিংবা পড়লেও পুরো অর্থ জানেন না। যদি জানতেন, তাহলে সম্ভবত সূরাটি তরজমা করে তারা আর কাউকে নসিহত করতে চাইতেন না। কেননা প্রথম লাইনের তরজমা শুনেই তাদের বান্ধবরা নাখোশ হয়ে যেতো এবং পরবর্তী প্রতিটি লাইনেই তারা বুঝে নিতে পারতো, আমাদের জ্ঞানপাপীরা কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলি পরে অমুসলিমদের সাথে মস্করা করছেন!

আমাদের কতক *মূর্খবুদ্ধিজীবি* নিজেদের চিন্তাপ্রসূত বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করে চলেছেন। *বুদ্ধিই* যাদের জীবিকা তাদের জন্য দুঃখ করা-ই উচিত। আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান তারা অর্জন করেন না সঙ্গত কারণেই। কেননা এই জ্ঞান জীবিকা অর্জনের জ্ঞান নয়।

দ্বীনের ইলম দিয়ে পেট ভরে না, প্রাণ ভরে। দ্বীনের ইলম দিয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবি হওয়া যায় না, দ্বীনদার হওয়া যায়। দ্বীনদারী দুর্লভ বস্তু, বুদ্ধি বেচাকেনা থেকে তা সম্পূর্ণ পবিত্র।

আমাদের জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবিরা মুসলিম ও অমুসলিমের ব্যবধান মুছে দিতে চান। এই ইচ্ছা তারা ইশারা-ইঙ্গিতে হামেশা প্রকাশ করে থাকেন। নানা ফন্দি-ফিকিরে ছলচাতুরীতে তারা মনের গোপন পঙ্কিলবাসনা পূরণ করতে চান। জ্ঞান-বুদ্ধির বাকচাতুরীতে মায়াজাল সৃষ্টি করে মানুষের মনে মোহ জাগাতে

সচেষ্ট থাকেন। মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের মোহনবাঁশী বাজিয়ে মিথ্যার ধুম্রজাল সৃষ্টি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। এই দিকভ্রান্তরা নিজেরা যেমন পথের দিশা হারিয়ে অন্ধকারের ঠিকানায় দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছেন, সেই সাথে আরো কিছু অবুঝ ও সরল মানুষকে ধোঁকা দিয়ে আপন নিবাসের বাসিন্দা করে নিচ্ছেন।

অথচ ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছে এবং এই সীমানা অতিক্রমের বিষয়ে নিয়মনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই সাথে বিশ্বাসীর নিরাপত্তা ও অবিশ্বাসীর নিরাপত্তা উভয়টির উপর প্রচণ্ড গুরুত্বারোপ করেছে। কোনো কারণেই এই সীমানারেখা অতিক্রম করতে পারবে না। ইসলাম কোনো মুসলিমকে এমন সুযোগ দেয়নি, সে কোনো অমুসলিমের উপর চড়াও হতে পারে। ইসলাম মুসলমানের দ্বীনের হেফাজতে যেমন কঠোর, তেমনি অমুসলিমের ইজ্জত-হুরমত, মানমর্যাদা ও ধনসম্পদ সবকিছুর হেফাজতেও কঠোর।

ইসলাম একটি বিশ্বাসের নাম। একটি জীবনবিধানের নাম। পরকালীন জীবনের মুক্তিসনদের নাম। তাই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেম-প্রীতি, মঙ্গলপ্রদীপ, পূজারবেদি এসবের সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই ইসলামের।

তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের, আমাদের কর্ম ও কর্মফল আমাদের।

রবীন্দ্রসংগীতের *ইবাদত* করে ইহকালে *বুজুর্গী* অর্জন করা সম্ভব। পরকালে যাদের বিশ্বাস নেই, তারা ইবাদতের অর্থই বুঝে না। নাস্তিকের বুদ্ধি মাথায় থাকে না, থাকে হাঁটুতে। ওদের বিবেচনায় দুই হাঁটুর বুদ্ধি এক মাথার চেয়ে বেশি বলে বয়সকালে নাস্তিকেরা বেশি জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় দেয়। পৃথিবীর সব নাস্তিকই জগতে উত্তরাধিকারীদের জন্য ওয়ারিশী সম্পদ হিসেবে শুধু লাঞ্ছনা ও ঘৃণা রেখে গেছে। যাদের ধর্মে বিশ্বাস নেই তারা *লাকুম দ্বীনুকুমের* নসিহত করে। এটা বিশ্ববেয়াকুফী বৈ আর কি হতে পারে? তথাকথিত তরজমাকারীরা এটা খুব বুঝে, ধর্মে বাড়াবাড়ি নেই। এটা বুঝে না, এই ধর্মে মাখামাখিও নেই। এই দ্বীন মানুষকে পবিত্র করে, সেই জন্য পবিত্র হবার পর কেউ অপবিত্র হলে এই দ্বীন তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তার প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

রবীন্দ্রসংগীত যাদের ইবাদত, তারা মৃত্যুর সময় কবিগুরুর কোনো কবিতা পাঠ করার বাসনা হয়তো রাখে। তার আত্মার কোনো আত্মীয় মৃত্যুকালে তাকে *সোনারতরী* কিংবা কোনো ঘুমপাড়ানীয়া সংগীত শোনাবে আর সে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বে–এরকম সে ভাবতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এমনটি হবে না। দৌড়াদৌড়ি শুরু হবে। তখন কলেমার জন্যে সে যেমন পেরেশান হবে তার নিকটাত্মীয়রাও তেমনি পেরেশান হবে। মৃত্যুর পর ওরা নানান কথা বানিয়ে বলবে। কত আসান তরিকায় কলেমা পড়তে পড়তে জান্নাতের দিকে তাকে যেতে দেখলো, সেকথা বারবার বলবে।

আজ যে মুসলমানের ঔরসে জন্ম নিয়ে দ্বীনের সাথে বাগাওয়াতি করে, মুশরিকের সাথে ঘর করতে যায়, সে তার সন্তানের জন্য কি অসিয়ত করে যায়? তার তো কোনো ধর্ম নেই। কিন্তু সে যাকে অপবিত্র করলো সেই দুর্ভাগা সন্তানের মুক্তির পথটি কেন সে বন্ধ করে গেলো? লাকুম দ্বীনুকুমের ভুল অর্থ বুঝে নিজে দ্বীনহারা হলো, ভবিষ্যত বংশধরের মুক্তির পথটাও বন্ধ করে দিলো।

এরা অন্যের বাড়াবাড়ি নিয়ে মেতে থাকে, নিজের বাড়াবাড়িটা দেখে না। নিজের বাড়াবাড়িতে নিজেই যে ধ্বংস হয় সেই বুঝ ওদের না থাকলেও তাদের বংশধররা ঠিকই বুঝতে পারে, অভিশম্পাত দিতে থাকে এবং এভাবেই আল্লাহ তা'আলার লানত ও শাস্তি যথারীতি কার্যকর হতে থাকে।

আমার এক মুরব্বী জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে হঠাৎ করে এক রাজনৈতিক দলের ঘোর সমর্থক হয়ে উঠলেন। তার সমস্ত চিন্তা-চেতনা এখন ঐ আন্দোলনের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। শেষবয়সে এমন বেসামাল অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়েছি। তবে তার দীর্ঘ কর্মময় জীবনের শেষ দিনগুলির পরিণতি দেখে বুঝা যায়, আল্লাহর নিকট কোনো অতীত নেই, কোনো ভবিষ্যত নেই, সবকিছু বর্তমান। তিনি আজ জানেন কাল আমি কি করবো। আমরা আমাদের পিতৃপুরুষের চিন্তা-চেতনা ও আশা-আকাঙ্খার উপর পাথর চাপা দিয়েছি, তাদের রেখে যাওয়া ক্ষেত-খামার উজাড় করে দিয়েছি, সকল বাঁধের অর্গল খুলে দিয়ে অবাধ বিচরণের চারণভূমি বানিয়েছি, তখনি তাদের রক্তের অভিশাপ উত্তরপুরুষের সংসারকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। আজ যে সংসার ছারখার হতে চলেছে, তাকে যারা নির্মাণ করেছিলো, তারা অসংখ্য দংশন সহ্য করে নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে গিয়েছিলেন আমাদের জন্য। কিন্তু আমরা তা বুঝতে চাই না।

জ্ঞানীরা তখন পূণ্যবান ছিলেন, এখন জ্ঞানপাপীরা তাদের মুখে চুনকালি মেখে দিয়েছে। এরা মানুষকে বুঝায় সব নদীর উৎস এক এবং সব নদীর সঙ্গমস্থল অর্থাৎ পরিণতিও এক! কিন্তু নিজের পরিণতির কথা চিন্তা করে না।

বহুদিন আগের কথা। সিলেটের চা-বাগানে শ্রমিক নিয়ে এসেছিলো ইংরেজরা। শ্রমিকরা আর দেশে ফিরে যায়নি। চা-বাগানই এদের বাড়িঘর, সবকিছু। বাগানের ম্যানেজার সাহেবই ওদের মা-বাপ। চা-বাগানের কাজ থেকে শুরু করে ম্যানেজার সাহেবের পায়ে জুতা পরানো পর্যন্ত সব কাজই ওরা করে আসছে বংশ পরম্পরায়। বাইরের জগতের সাথে ওদের কোনো সম্পর্ক নেই। সারাদিন ঝড়বৃষ্টি রৌদ্রতাপে কঠোর পরিশ্রম, সামান্য পারিশ্রমিক, আর রাতভর তাড়ি আর মদে চূর হয়ে পড়ে থাকাই এই *কুলি* জীবনের ইতিহাস। এই জীবনেই তাদেরকে অভ্যস্ত করে রাখা হয়েছে। ম্যানেজার সাহেব মারা গেলে ওরা হাউমাউ করে কাঁদে আবার ম্যানেজার সাহেবের মেয়ের বিয়েতে দিনরাত

মাতাল হয়ে নেচে গেয়ে ফূর্তি করে। এক বাগানের কুলিরা অন্য বাগানের ম্যানেজার সাহেবের সুখে-দুঃখেও অংশগ্রহণ করে। কিন্তু নিজেদের দুঃখে ওরা মাতমও করে না, সুখে আনন্দ প্রকাশও করে না। এভাবেই তাদের বানিয়ে নেয়া হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর বাগানগুলিতে বাইরের কিছু হাওয়া লাগতে শুরু করলো। বিশেষ করে জাতীয় দিবসগুলোতে বাগানেও বিভিন্ন কর্মসূচি হতে লাগলো। শোকদিবস, মৃত্যুদিবস পালন হতে লাগলো। এইসব দিনে বাগানে ছুটি দেয়ার নিয়ম চালু হতে লাগলো। মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর মৃত্যুতে চা-বাগানের শ্রমিকেরা ছুটি পেয়ে অবাক হয়ে গেলো। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হলে সারা দেশে শোকের ছায়া নামে। সবকিছু বন্ধ হলো। চা-বাগানেও ছুটি ঘোষণা করা হলো। কুলিরা দলবেঁধে তাদের সরদারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হারে ছরদার, ইউ জাবাবুর রহমান কাউন হায়রে? সরদার কিছুক্ষণ চিন্তা করে জবাব দিলো, *হোয়েগা কোয়ি বড়ি বাগানকি ম্যানিজার ছাব।*

এই কুলি আর সরদারের মত আমাদের মহান পিতৃপুরুষের বহু উত্তরাধিকারী আজ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে। আবু জাহেলী অজ্ঞতায় ওরা অবতার আর মুহাম্মদে তফাৎ বুঝে না। ওরা যিশুখৃস্টকে ঈশ্বর মনে করে আবার আল্লাহকেও ঈশ্বর বলে। ওদের ধারণা সব নদীর উৎস যেমন এক, তেমনি সব ধর্মের উৎসও এক। অতএব ইসলামের উৎসও তাই। এই ঐকিক নিয়মে ওরা বুঝে, সব নদীর সঙ্গমস্থল এক মোহনায় লীন হয়ে যায়। অতএব ইসলাম ধর্মের শেষও ঐখানেই। অর্থাৎ মুসলমানের পরিণতিও তাই, যা অন্যের পরিণতি। অথচ আল্লাহ বলেছেন, *একমাত্র ইসলামই তার মনোনীত দ্বীন।*

আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, তাঁর কিতাব ও তাঁর দ্বীনকে চিনে না বলেই ওরা ওদের পথ প্রদর্শকদের শেখানো মালিকদেরকেই শুধু চিনে। তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমাদের দ্বীন আমাদের। এই স্বাধীনতার অর্থ আপোষ নয়। আমরা যার ইবাদতকারী সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের উপর দৃঢ়পদ থাকাই আমাদের ইবাদত, আমাদের অঙ্গীকার। এই দ্বীনে হানিফ থেকে না এদিকে না ওদিকে সামান্যতম হেলে যাবার কোনো অবকাশ আছে। আলোর সাথে অন্ধকারের কোনো আপোষ হয় না। হয় আলো, নয়তো অন্ধকার। আলো নিভলে সবকিছু অন্ধকার হয়ে যাবে। আলোর উদ্ভবে অন্ধকার বিলীন হবে। আলোময় ইসলামই আমাদের জীবনবিধান। এই আলোরভূবনে বসবাসকারী যেসব হতভাগা চোখ থাকতে অন্ধ হয়েছে তাদের সাথে পথ চললে পরিণতি কি হবে সেকথা বুঝার ক্ষমতা যাদের নেই, তাদের কথাও কোরআনে আছে।

কোরআনুল কারীমে সব মানুষের পরিচয় আছে। যে কোরআন পড়ে সে নিজেকে চিনে, অন্যকেও চিনে। যে পড়ে না তাকে অন্যরা চিনে।

আমার এক সহকর্মীকে প্রায়ই দেখি কানাকানি করতে। তার কাছে যারা আসেন, তারাও আকার ইংগিতে কথা বলেন। আমি পরিস্কার যা নিয়ে তারা কথা বলেন, সে সব সর্বজনীন ব্যাপার। তাহলে এই ইশারা ইংগিত কেন? আসলে তারা এমন এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আছেন, যার সাথে তাদের দ্বীন কখনো কখনো আপোষ করে থাকে। এরা আলোর ভূবনে বসবাসকারী। কিন্তু অন্ধকার জগতেও তাদের বান্ধবরা আছে। কুরআনের ভাষায় একবার এদিকে তো একবার ওদিকে; এই ইতিউতি কানাকানি করে আত্মপ্রবঞ্চিত জীবনে নিষ্ফলতার বোঝাই বাড়িয়ে চলেছে। আল্লাহ্ বলেন, *এদের কান আছে তবু এরা শুনে না।* কি শুনে না? আল্লাহর পবিত্র কিতাবের কথা শুনে না, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর সা. অসিয়তকৃত মুজাহিদের আযান শুনে না, নবীর ওয়ারিশরা ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছেন। তাদের ডাকে কানে আঙুল দিয়ে আপন আদর্শে উৎফুল্ল হয়ে অভিশপ্ত পথের দিকে চলতে থাকবে। এইসব অন্তরের একটি দ্বারও যেন খুলবার নয়। বরং দ্বীনের ব্যাপারে বুজুর্গী দেখাবে ওস্তাদের মতো। আল্লাহ ও রাসূলের নামে আপন ধ্যান-ধারণার কথা বলার ওস্তাদি শ্রোতাকে বিস্মিত করে দেবে। লাকুম দ্বীনুকুমের তাফসীর করে নিজে বুঝেছে অন্যকেও বুঝিয়েছে, ধর্মে ধর্মে তফাৎ নেই, সবই মানবধর্ম। যে আমার আমি তার; পরকাল যদি একান্তই থেকে থাকে, মুক্তির পথ খোলা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। হতভাগারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে বলে দাবি করে, অথচ আল্লাহর দাবিকে উপেক্ষা করে নিজে আরেক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকে। কুরআন মানে বলে দাবি করে অথচ কুরআনের কথায় আর তার নিজের কথায় কোনো মিল না থাকলেও আপন বক্তব্যে অবিচল থাকবে। পরিবারের সুখ-দুখে নবীর নামে মিলাদ পড়াবে। কিন্তু নবী জীবনের কোনো আদর্শই নিজের জীবনে, পারিবারিক জীবনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাস করবে, অথচ ইসলামি জীবনবিধানকে গ্রহণ করা অসম্ভব বলে জ্ঞানগর্ভ মতামত দেবে। যারা কৌশল জানে, আত্মস্বীকৃত বুদ্ধিজীবি হয়ে কথার মারপ্যাচে রা᐀কে দিন বুঝায়, সত্যকে আড়াল করে মিথ্যার মায়াজালে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। ইসলামের শ্বাশ্বত সরল পথের পথিককে বিভ্রান্তি ও অভিশপ্ত পথের দিকে নিয়ে যায়। তাদের অনুসরণকারীরা এখন বিজয় মিছিল বের করছে। নির্বোধদের মিছিল পথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর অর্থ এই নয়, তাগুতের বরপুত্ররা কামিয়াব হয়ে গেছে। দুনিয়াতে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দার উপর সে কখনো বিজয়ী হতে পারবে না। দ্বীনে হানিফের উপর যে দৃঢ়পদ থাকবে সে কখনো

পরাজিত হবে না। সূরা কাফিরুন যে মুখে ও অন্তরে নিঃশঙ্কচিত্তে পরম বিশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারবে, তার অভিভাবক হবেন স্বয়ং বিশ্বজগতের প্রভূ। শয়তান তার শত্রু হলে হতে পারে, এটা কোনো পরোয়া করার বিষয় নয়।

একদল মানুষ কুরআন অধ্যয়ন করে মানুষকে নসিহত করার জন্য। আরেকদল পড়ে অন্যকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এমন অনেক আছে যারা কুরআন ও হাদীস খুব জানে কিন্তু কথাবার্তায়, চলাফেরায় অন্য তাল অন্য সুর। তাহলে কুরআন-হাদীসের এই জ্ঞান তাদের কি কাজে লাগে? অবশ্যই কাজে লাগে। তর্ক করতে লাগে, আপন মত ও পথের অনুসারীদের বিভ্রান্ত করতে কাজে লাগে। *লা ইকরা-হা ফিদদ্বীন*-এর মত ছোট ছোট লাইন অথবা সূরা কাফিরুনের মত ছোট ছোট সূরার কিছু অংশের যেসব হাস্যকর অর্থ ও ব্যাখ্যা করে বসে, না জানি পুরো কুরআনের কি অর্থ এদের উর্বর মস্তিকে মওজুদ হয়ে আছে। ভাবতেও অন্তর কেঁপে উঠে।

আপন মত ও পথকে কুরআন ও হাদীসের স্ববিকৃত অর্থ দিয়ে গ্রহণযোগ্য করার কৌশল কিভাবে তাদের অনুসারীদের বিভ্রান্ত করে তার একটি নজির আমি কিছুদিন আগে দেখেছি।

আমার বসবাস তখন আরবের জেদ্দা শহরে। আমার বাসায় একটি যুবক ছেলে এলো দেখা করতে। প্রতিবেশীর আত্মীয়, দেশ থেকে এসেছে ওমরাহ করতে। কথা প্রসঙ্গে জানলাম, ওরা বেশ কয়েকজন বন্ধু দলীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের পরমপ্রিয় নেতার নামে ওমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররামায় এসেছিলো। বন্ধুরা এদিক সেদিক ঘুরছে, সে আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে এসেছে। রাতে ফ্লাইট, সকলে একসাথে দেশে ফিরে যাবে। জিজ্ঞেস করলাম, বাবা-মা কেউ আছেন? জবাব দিলো নেই। মা ছোট রেখে মারা গেছেন, বাবা লালন পালন করেছেন, এখন তিনিও নেই। আবার জিজ্ঞেস করলাম, তাদের জন্য ওমরাহ্ করেছো? হঠাৎ যেন ছেলেটির কি হলো। আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো, কোনো কথা নেই। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেলো। মুহূর্তে টানটান হয়ে উঠে দাঁড়ালো। আত্মীয়ের দিকে ফিরে বললো, মামুজান, আমি একটা অমানুষ। ওদের বলে দিবেন, আমি আজ ওদের সাথে দেশে ফিরে যাচ্ছি না। দরজার কাছে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, বড় ভাই আমি মক্কা যাচ্ছি। চেয়ে দেখি, তার দু'চোখে অশ্রু টলমল করছে।

حسبنا الله ونعم الوكيل

কোনো এক মনীষী বিদ্রুপ করে বলেছিলেন, বর্তমান বিশ্বের মুসলমানরা শ্রেষ্ঠধর্মের নিকৃষ্ট অনুসারী। কথাটায় শ্লেষ আছে, অপমান আছে তবে বাস্তবতার নিরিখে এটি একটি সত্য কথাও বটে। ধর্মকে নিয়ে এ যাবত যতো যাচাই-বাছাই চিন্তা-বিশ্লেষণ হয়েছে, তাতে ইসলামের সার্বিক শ্রেষ্ঠত্বে দ্বিমত করার কোনো অবকাশ অবশিষ্ট নেই। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের অধর্ম নিয়ে কথা বলার দরকার বা ইচ্ছা আমাদের নেই। কারণ সেইসব ধর্মের অনুসারীরাই ইতোমধ্যে যথেষ্ট নিরাশ হয়ে গেছে তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ও আচার-আচরণে; তাদের ধর্ম ও কর্ম এখন দু' বিপরীত বস্তু। তাদের জীবন ও অন্তরের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্ম আছে ধর্মশালায়, ধর্মগুরুদের পাঠশালায়। মাঝে মধ্যে সেখানে যাবার সুযোগ হলে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে আসে এবং ধর্মের ব্যাপারে এতোটুকু আত্মতৃপ্তি তাদের এখনও অবশিষ্ট আছে।

পক্ষান্তরে ইসলাম তার মান ও মর্যাদায়, বিশ্বাসে ও সততায়, বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতায় তার আবির্ভাবেই যে শিখরে অবস্থান নিয়েছিলো এখনও সেই সর্বোচ্চ শিখরই তার উপযুক্ত আসন। নিচে নেমে গেছে তার অনুসারীরা কেবল। তাই যথার্থই বলা হচ্ছে, একটি উত্তম দ্বীনের আমরা সব অধম অনুসারী। এই দ্বীন দয়াময়ের একমাত্র মনোনীত দ্বীন। কারা ছিলেন এই পথের অভিযাত্রী আর আজ এই কাফেলায় আমরাও একদল যাত্রী। যাদের নিকৃষ্ট বলার কারণটাও আমরা জানি না। একদল উৎকৃষ্ট মানুষ যদি এই পথে বহুদিন বহুদূর পর্যন্ত না চলতেন

তাহলে আমাদের কেউ নিকৃষ্ট বলতো না। এই পথে তাদের পায়ের চিহ্ন অমলিন হয়ে আছে। তাদের কর্মময় জীবন, তাদের অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, তাদের তরবারির ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা এই পথকে এতোই পরিচিত করেছিলো, যুগে যুগে মানবজাতি এই পথের ঠিকানা খুঁজে ফিরেছে। এর পাশে বসতি করে উন্মুক্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করেছে কখন একদল মুজাহিদ তীরবেগে ছুটে আসবে পথঘাট ধুলোয় অন্ধকার করে।

আরবের মরুভূমির এক ঘোড়সওয়ার লোহিতসাগরে জাহাজ ভাসিয়ে আরবসাগরের তীরে এসে অবতরণ করেছিলেন। সেই থেকে সিন্ধু নদীর অববাহিকায় মুসলমানরাই বাস করছে। এখন কিছু গোত্রীয় দাঙ্গায় সিন্ধে রক্তপাত হয়। অনেকেই সিন্ধুকে নিজের বলে দাবি করে।

মূলত সিন্ধু হলো মুহাম্মদ বিন কাসিমের, এক অমিততেজ যুবকের, তরবারি দিয়ে মজলুমের প্রতি ইহসানকারী মরণজয়ী মুজাহিদের।

বিশাল ভারত ভূখণ্ডের নদনদী পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল অতিক্রম করে আরেক প্রাণচঞ্চল যুবক একেবারে এই সীমান্ত পর্যন্ত– বঙ্গোপসাগরের তীরের কাছে পৌঁছলেন। কত কাপালিকের কৃপাণ হাত থেকে খসে পড়েছিলো, কত তন্ত্রমন্ত্রের বাণকে পায়ে পিষে জানবাজ ঘোড়সওয়ার ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি এই জনপদে পৌঁছেছিলেন।

এখানে যারা উৎসের সন্ধান করেন তারা বখতিয়ারের মানসপুত্রদের অন্য তথ্য দিতে সচেষ্ট। বর্গীরা এদেশে বহুবার এসেছে সত্য, তাই বলে এদেশ বর্গীদের রাজ্য বলে কখনও খ্যাত হয়নি। বরং তাদের হানা দেবার কথাই বেশি খ্যাত। এদেশ পীর-ফকিরের দেশ বলেই খ্যাত। কিন্তু এ পীর সে পীর নয়। এসব পীরের নাম মজনু শাহ, পীর জঙ্গী ও বিজয়ী শাহজালাল ইয়ামানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

একটি উন্নত জীবনব্যবস্থার জন্য একদল উন্নত মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজন। এখন তো উন্নত মানবরা (!) পশু প্রবৃত্তির অনুসারী। এদের যা কিছু মানবিক তা আসলে পাশবিক।

চোখ-কান-হৃদপিণ্ড থাকলেই সে মানুষ!

যারা মানুষের জন্মরোধ করতে পারে। অসম যুদ্ধে আকাশ থেকে বোমা ফেলে মানুষ মারতে পারে, তাদের উন্নত (!) আচরণ দেখে মুসলমানরা বেকুফ হয়ে বসে আছে। ইসলামের অনুসারীরা আজকের দুনিয়ার *উন্নত মানবদের* দেখে ঘৃণায় লজ্জায় অধোবদন হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তব তার বিপরীত। ইতর প্রবৃত্তির মানুষের কাছে ইসলামের পুত-পবিত্র জীবনবাদীরা এখন দায়বদ্ধ। ভোগবাদীদের অন্নে দ্বীনদাররা হচ্ছে প্রতিপালিত। দুনিয়াদাররা জায়গা না দিলে

দ্বীনের পতাকাবাহীরা বুঝি উচ্ছেদ হয়ে যাবে। উন্নত মানবশ্রেণীর রূপ যে পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেনি তা তো নয়। একটি দু'টি নয়, এক দু'দিন নয়, এক দু'যোজন নয়; বরং লাখ লাখ মানবের শত সহস্র মাইলজুড়ে যুগ-যুগব্যাপী তাদের বিচরণ পৃথিবীর ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে। অবিস্মরণীয় এ স্মৃতি কেউ কখনও মুছে দিতে পারেনি।

আমাদের দ্বীনহারা বান্ধবরা দ্বীনহীন বান্ধবদের সন্ধান করে মরছে। ওদের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে। এই ঘুম যে আর ভাঙবে না বলাই বাহুল্য। কালমরণ আর কাকে বলে? যারা এ রকম ধারণা পোষণ করতে কষ্ট বোধ করেন, অচিরেই এদেশে মুসলমানরা প্রতিমাপূজা করবে ও সগর্বে এসব অর্চনাকে তাদের সংস্কৃতির অংশ বলে ঘোষণা করবে, তারপরও নামাজ রোজা প্রয়োজনমাফিক কায়েম রাখবে, এমন অনিবার্য সম্ভাবনা এখনও যাদের বোধের বাইরে রয়েছে তারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তান বলে বিবেচনা করেন একথা শুনলে হাবিলের কাকও বিস্মিত হবে।

দেশপ্রেম ও দেশাচারের দোহাই দিয়ে এ পর্যন্ত যেসব কীর্তিকলাপ ও আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়ে গেছে সেসবের পরিণতি ভোগ করার জন্য যাদেরকে রেখে যাওয়া হবে তাদের পক্ষ থেকে দুটি বিনিময়ের যেকোনো একটি আমরা সহসাই পেয়ে যাবো।

হয় তারা আমাদের অভিশম্পাত দেবে নয়তো সম্পূর্ণ পথচ্যুত হয়ে আমাদেরকে চিরঅভিশপ্তের পরিণতি ভোগের যোগ্য করে দেবে। আমাদের তৈরি বেদিমূলে বহিরাগত কেউ অর্ঘ্য দিলে সেটা তাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা। কিন্তু আমাদের বিষবৃক্ষের ফল আপন সন্তান-সন্ততিরা কর্তব্যজ্ঞানে আপ্লুত হয়েই পরবর্তী যজ্ঞানুষ্ঠান এই আঙ্গিনাতেই সম্পন্ন করবে এটা বুঝার জন্য দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন নেই।

আমার এক বৈমানিক বন্ধু ছিলো। অবাঙালির নাম শুনলে তার মাথা খারাপ হয়ে যেতো। দেশ স্বাধীন হবার পর অবাঙালিরা চলে গেলেও তার মাথা ঠিক হয়নি। টেকনিক সামান্য পাল্টালো। এবার মোল্লা-মৌলভীদের কাজকর্মে সে বিরক্ত হতে লাগলো। মনে হলো, কাবাব মে কুচ হাড্ডি হায়। পরে জানলাম, হিন্দুস্তানের সবকিছুতে সে অজ্ঞান। মাতৃভাষীর চেয়ে হিন্দিভাষী বন্ধুই তার বেশি। হায় হতোস্মি! কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ালো। এই পদের জিনিস আমাদের সমাজে কত আছে হিসাব করতে চাইলে কম্বল সাফ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দুর্ভাগা বৈমানিকের দাড়িতে এখনও টান পড়েনি তাই ইদানিং সে নবীদের উপর দারুণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। পাপিষ্টটি নিজের নবীকে কটাক্ষ করে কথা বলে একথা শুনে অনেকে আঁৎকে উঠেন।

আশ্চর্য হবার কি আছে? যে উৎস থেকে সে যাত্রা করেছে সেখান থেকে কি আরো বহু *সোনার সন্তান* পাল তুলে নৌকা ভাসায়নি? সেই একই স্রোতস্বীনীর পরিচিত বাকগুলো ঘুরে তারাও কি আজ কালের কিনারায় পৌঁছে যায়নি? কেউ পাল তুলে এসেছে, কেউ ডুব সাঁতরিয়ে এসেছে। আমরা দেখি আর না দেখি, বুঝি আর না বুঝি ওদের নিঃশব্দ চলাচল শিয়রের কাছেই। যারা দেখেও বিভ্রান্ত তারা জানে না মনিটা যে সাপের মাথায়।

সর্বোত্তম ধর্মের অনুসারীরা সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিলো। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষরাই ছিলেন এর অনুসারী। শুধুমাত্র খোলস পরে আজ অসংখ্য মানুষ ইসলামের নিরাপদ আশ্রয়ে ঠাঁই নিয়েছে; হয়তো এ জন্যই দ্বীনের একনিষ্ঠ বান্দাদের সহজে চোখে পড়ে না।

কাদিয়ানীদের মতো স্বঘোষিত কাফেররাও দিব্যি মুসলমান সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারো কোনো খবর নেই।

যাত্রীসেবায় নিয়োজিত এক বিমান ক্রুকে দেখেছি প্রতি মাসের এক বিশেষ দিনে সে লণ্ডন যায়। লণ্ডন পৌঁছে কাদিয়ানীদের মাসিক ইজতেমায় যোগদান করে এবং সেখান থেকে বার্তা নিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে তা পৌঁছে দেয়। তার এই পরিকল্পিত যাত্রা নির্ধারণে নির্বোধ মুসলিম সহকর্মীরা খুবই সহযোগিতা করে থাকেন। কেননা সে আবার সংস্থার যাত্রীসেবা সংক্রান্ত এসোসিয়েশনের একজন কর্মকর্তা। অতএব তার প্রভাব আছে এবং এসব প্রভাবের অতিরিক্ত আছে তার দারুণ জনসংযোগ ক্ষমতা ও নীরব প্রক্রিয়া।

দ্বীনের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তারপরও মুসলমান তার শ্রেষ্ঠত্ব খুইয়েছে। একমাত্র মৃত্যুর পরই মুসলমানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রাণ ফিরে পায়। আল্লাহর বান্দা যতোদিন জীবিত ছিলো তার ঘরে দ্বীন মৃত ছিলো। বান্দার মৃত্যু হয়ে গেলো দ্বীন জীবিত হলো। আল্লাহর মনোনীত দ্বীনকে এভাবেই যারা বুঝে নিয়েছে তাদের ওজন দ্বীনের পাল্লায় কতটুকুই বা হবে? ইসলামের মতো মহান ধর্ম তার অনুসারীদের দ্বারা অপমানিত হওয়ার, অমর্যাদা পাওয়ার কাবিল নয়। কেননা ইসলাম কেবলমাত্র এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষের অনুসরণীয় ধর্ম নয়।

যারা ইসলামের অনুপযুক্ত, ইসলাম তাদের প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ পাক দ্বীন নির্ধারণ করেছেন। মানুষ নির্ধারণ করবে এই দ্বীনে থাকার যোগ্যতা তার আছে কিনা? আল্লাহর নির্ধারণ অপরিবর্তনীয়। মানুষ উঠানামা করছে। আর দ্বীন তার আপনবিভায় মহিমামণ্ডিত হয়ে আছে।

দুনিয়ার আদি ও অকৃত্রিম রীতিই এমন, আল্লাহ তা'আলাকে মান্যকারী একদল বান্দা (!) দুনিয়াতেই জান্নাতের শান্তি কামনা করে। তাই জিহাদের মতো জরুরি কাজকেও নানা বাহানায় এড়িয়ে চলে। অন্যদিকে আরেকদল বান্দা

জিহাদের সুবাস না পেলে দু'চোখের পাতা এক করে না, না জানি কখন মুনাফিক অবস্থায় মৃত্যু হয়ে যায়!

এরাই সেই পথের যাত্রী যে পথে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. সাথীদের বলেছিলেন : *এসো! আমার হাতের উপর হাত রেখে বায়'আত করো, জীবনের বিনিময়ে যুদ্ধ করার শপথ করো।*

আর তখন সিপাহী সাহাবীরা সেই মুবারক হাতের উপর হাত রেখেছিলেন।

সে সম্পর্কে দয়াময় বলেছেন, *তোমাদের হাতের উপর আমার হাতখানিও রেখেছিলাম।*

এই পথে কেউ যদি ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতে চায় থাকুক। কেউ যদি উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরেফিরে ফিরুক। যে যতোটুকু বুঝেছে তাই সে করুক। জিহাদের বায়'আত গ্রহণকারীরা যে সৌরভে মোহিত হতে চায়, যে স্পর্শে ধন্য হতে চায়, যে নির্দেশ পালন করতে চায়, যে ঠিকানায় পৌঁছে যেতে চায়, সে যাবার জন্য চাই মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন। সর্বোচ্চ ত্যাগের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হবে এটাই তো স্বাভাবিক।
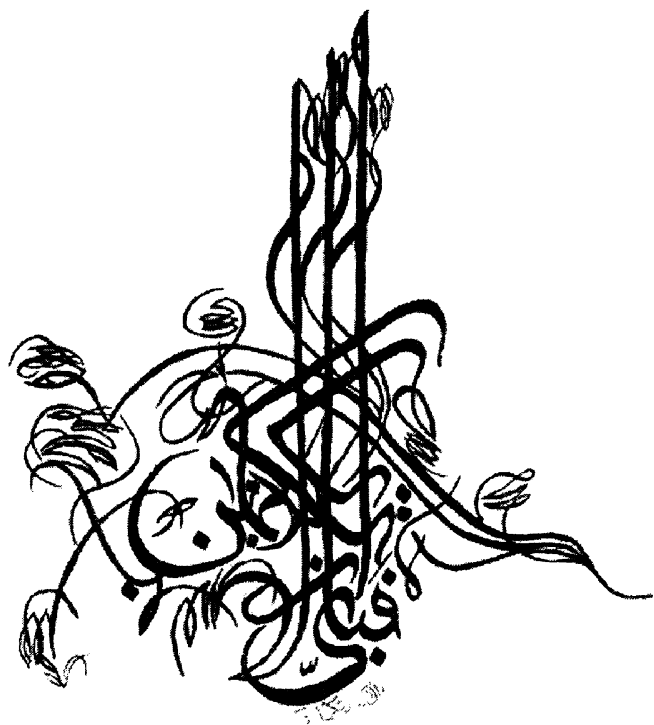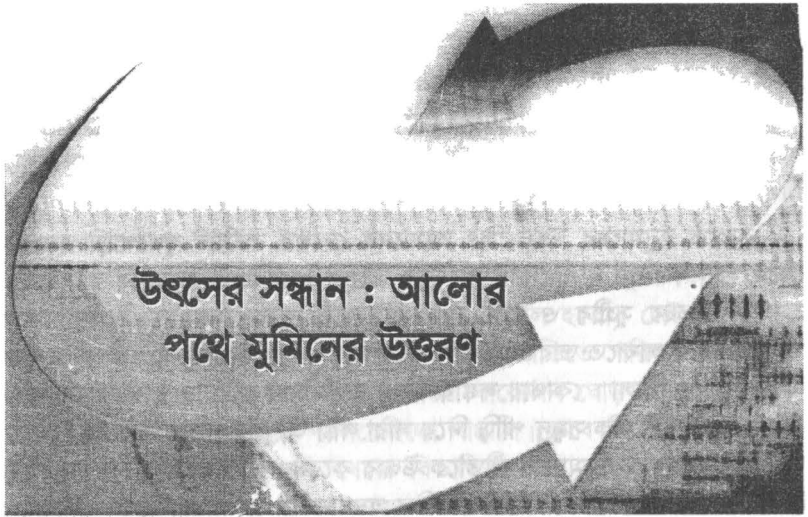
যদি বলি, পদ্মা নদীর উৎস কি? নদীর পার ধরে হেঁটে যেয়েও দেখে আসতে পারেন। হিমালয় খুব দূরে নয়, ভারতের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত।

যদি বলি, গাছের উৎস কি? একই পদ্ধতিতে যদি আপনি উৎস খুঁজেন তাহলে পাবেন মাটির নিচে তার শিকড়-মূল অর্থাৎ তার শেষপ্রান্ত। কিন্তু এটাকে কি তার উৎস বলা যাবে? না। গাছের উৎস হলো তার বীজ। যে বীজ মাটির উপরে অথবা সামান্য নিচেই বোনা হয়েছিলো। এই বীজ থেকেই বিরাট মহীরুহ সৃষ্টি হয়েছে।

পদ্মা নদীর উৎস হিমালয় হতে পারে, তাই বলে পদ্মার পানি, বালি, মাটি কোনোটির সাথে হিমালয়ে তার উৎসের কোনো কিছুর মিল পাওয়া যাবে না। কাঠাল গাছের উৎস যদি মনে করা হয় তার ঐ বীজটি, তাহলে তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। বরং কিছুদিন অপেক্ষা করলে গাছে কাঠাল ধরবে, কাঠালের বীজ হবে–ঐ একই বীজ, যা দেখে তার উৎসের বীজ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে।

ফরিদপুরের পদ্মার সাথে কোনো মিল পাওয়া যাবে না ভারতের একই নদীর উৎসের সাথে। অথচ একই নদী, একই উৎস। তবুও বিরাট তফাৎ রয়েছে পদ্মার চাঁদপুরের ইলিশে আর রাজশাহীর ইলিশে। পানিতে তফাৎ, ইলিশেও তফাৎ। যে বীজ থেকে গাছ হলো তাকে দিয়েও গাছের বা ফলের বিচার ঠিক হবে না। সিলেটের কমলালেবুর বীজ থেকে ঢাকাতে গাছ হবে, দু'একটা কমলালেবু হবে, কিন্তু সিলেটের কমলালেবুর সাথে ঢাকার কমলালেবুর পার্থক্য থাকবে বহু।

কেননা ঢাকার কমলালেবুর উৎস শুধু তার বীজ নয়, উৎস হলো ঢাকার মাটি, পানি, আবহাওয়া এবং আরো অনেক কিছু।

যদি বলি, বানরের উৎস কি? আপনি কি ডারউইনের বিবর্তনবাদের কথা বলবেন? না বলাই উচিত। বিজ্ঞানীরা এই মহামানবকে (!) ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছেন।

তাহলে হনুমানের উৎস কি? আমাদের দেশের বর্তমান মুখপোড়া হনুমান দেখে মনে করবেন না এদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন লঙ্কাবিজয়ী হনুমান। রামায়নের হনুমান ভ্রাতৃদ্বয় সুগ্রীব ও বালী যখন ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন তখন তাদের গদার আঘাতে ভারতবর্ষের পাহাড়-পর্বত কেঁপে উঠেছিলো, ভেঙেচুরে সব একাকার হয়েছিলো। কোথায় লঙ্কায় সীতা বন্দী আর কোথায় ভারতবর্ষের রাম বনবাসে? বিশাল এক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সারা লঙ্কা আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে তবেই না রামভক্ত হনুমানজী সীতাকে উদ্ধার করেন। একি চাট্টিখানি কথা! সেই বিশালকায় অসীম শক্তিধর বীর প্রজাতির হনুমানজীর বংশধররা এখন কোথায়? রামভক্তদের বর্তমান হালচাল দেখে কি এরা কোনো দূরদেশে হিজরত করেছেন?

কোথায়, আফ্রিকায়? মেরু দেশে? নাকি শ্রীলংকায়? আসলে এদের কোনো অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে বলে প্রাণীবিজ্ঞানীরা সাক্ষী দেন না। এরা কোনো দৈব কারণে একসাথে সংহার হয়ে গেছেন এমন কথাও ইতিহাস বলে না। এরা তো বীরের জাতি। শুধু বীর নয় ছিলেন দেব তুল্যও। এরা গেলেন কোথায়!

মুসলমানদের ভারত আক্রমণে এদের প্রতি কোনো অবিচার হলো কি?

সোমনাথ বিজয়ী সুলতান মাহমুদ সতেরবার ভারত আক্রমণ করেছেন। কিন্তু তিনি কখনো ভারতে এসে হনুমানদের আক্রমণ করেছেন এমন কথা কেউ বলেন না।

তবে মোঘলদের আমলে কিছু হলো কি?

আকবর তো মহান সম্রাট ছিলেন। তিনি হনুমানজীর বংশধরদের পেলে নবরত্নের আসনে বরণ করে নিতেন কিংবা কোনোভাবে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা করতেন নিশ্চয়ই। তার পুত্র প্রপৌত্ররাও অনেকটা এরকমই উদার ছিলেন। বাবর কিছু করলেন নাকি?

না। ইতিহাস তার ব্যাপারেও নীরব।

তাহলে হনুমানজীর বংশধরদের হলো কি? টিকটিকি টিকে থাকলো আর দেবতার বংশধর ধ্বংস হয়ে গেলো! নাকি এসবের অস্তিত্ব শুধুমাত্র পৌরাণিক কাহিনীতেই সীমাবদ্ধ। শুধু বাল্মিকীর মস্তিস্কেই ছিলো?

তাহলে বেচারা বাবরের উপর এই অপবাদ কেন?

ধর্মকে নিয়ে এই মিথ্যাচার কেন?

হনুমানজী বাস্তবে ছিলেন না। রাবন ছিলেন না। অথচ লঙ্কাবাসীকে রাবনের

বংশধর মনে করে কতবার বলির পাঠা করা হলো!

রামও অযোধ্যায় ছিলেন না। অথচ রামজন্মভূমির কথা বলে বাবরী মসজিদ গুড়িয়ে দিলো ওরা। যার জন্মই হয়নি তার জন্মভূমি দখল নিয়ে কী তাণ্ডব! তবুও হনুমানের উৎসের সন্ধান পাওয়া গেলো না। উল্টো রামায়নের হনুমানজীর বংশধররাই লাপাত্তা হলো।

বাঙালির উৎস কি?

পিছন দিকে আবার যেতে হবে। সেই মনসার পূজার যুগে ফিরে যেতে হবে। যুগ যুগ ধরে সাপের ভয়ে বাঙালির রক্ত শীতল হতো। সেই ভয় থেকে সাপের বেদিতে পূজা দিতে দিতে এক নির্বীর্জ জাতিতে পরিণত হয়েছিলো বাঙালি। ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খিলজির বারোজন ঘোড়সাওয়ারের দাপট দেখে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে পালিয়েছিলো বাঙালি। তবে খিলজি বা অন্যান্য সুলতানরা বাঙালিকে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে মারেননি। বাঙালির মাথায় দ্বীনের তাজ পরিয়ে দিয়ে এ মাটিতে তারা পরস্পর মিলেমিশে জীবনযাপন করেছেন। জমিনকে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য আবাদ করেছেন।

বাংলাদেশের মুসলমানরা কি উৎসের সন্ধান করেন?

লখিন্দরের সন্ধান করেন নাকি বখতিয়ার খিলজির সন্ধান করেন?

মুসলমানের কাছে রক্তের প্রবাহের চেয়ে বেশি মূল্যবান ঈমানের প্রবাহ। সকালে যে মুশরিক ছিলো, ছিলো অপবিত্র, সন্ধ্যায় তার ঈমানের দৌলত নসিব হতে পারে, পবিত্রতা অর্জিত হতে পারে। অথচ একই রক্ত তখনো ধমনীতে প্রবাহিত। গতকাল যে ঈমানদার ছিলো আজ সে বেঈমানিতে ডুবন্ত, তখনও একই রক্ত শরীরে প্রবাহিত। যাদের ঈমানের আলো নিভে গেছে তারাই হয়েছে দিশাহারা। সম্মানের আসন হারিয়ে জিল্লতির উৎসে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায় তারা।

দাউদ হায়দার তার উৎসের কাছে পালিয়ে গেছে।

তসলিমা তার উৎসের সরোবরে অবগাহন করতে যেতো সপ্তাহান্তে, মাসান্তে। কাদামাটি মেখে ফিরে এসে মাতৃভূমির পানি ঘোলা করতো, অপবিত্র করতো। এদের ছায়া দেখেও মানুষ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কেউ পথহারা হলে এর মানে এই নয়, সে নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে। বিভ্রান্তির নাম সোজা পথে চলা নয়।

কবি সুফিয়া কামাল তার কবিজীবনকে ধন্য করেছেন কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে আটটি কবিতা উৎসর্গ করে। সেদিনের সেই পাকিস্তানে ধর্মীয় পরিবেশে জীবন কাটাতে তিনি গর্বিতা ছিলেন। আর আজ? পূজার প্রদীপ যার কম্পিত হাতকে কলঙ্কিত করেছে, রবীন্দ্রসংগীত যার

ইবাদতের স্থান দখল করে নিয়েছে, যার কন্যা হিন্দুর ঘরের ঘরনী হয়েছে, নিজের জীবদ্দশায় যার বংশে মুশরিকের লালন পালন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবার থেকে এক প্রজন্মেই ইসলাম বিলুপ্ত হতে চলেছে। পণ্ডিত কবীর চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার সময় আল্লাহকে ঈশ্বর বলতেন। মুখ ফসকেও *আল্লাহ* নাম উচ্চারণ করেছেন এমন শোনা যায়নি। চৌধুরীদের নাটকীয় প্রতিভা ফেরদৌসী কোনো সন্ধান ছাড়াই রামেন্দুকে পেয়েছেন পরম পতিরূপে।

আহমদ শরীফ: আহা কী নাম! তার পিতামাতা কি জানতেন তিনি আহমদও হবেন না, শরীফও হবেন না। যদি জানতেন তাহলে এমন সন্তানকে সকলের অজ্ঞাতে গোয়ালন্দ ঘাটে রেখে আসতেন।

অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদ বলেন, তিনি পরকালে বিশ্বাস করেন না। এসব কথা তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছাত্রদের বলেন। বলিহারি যাই এমন শিক্ষক ও তার মহান ছাত্রদের অনুপম আদর্শ দেখে।

এরকম বহু আছে, কেউ খোলসের ভিতরে, কেউ বাইরে। এদের উৎস যাই থাকুক, এরা তাদের জীবদ্দশাতেই নাস্তিক হয়েছে।

মানুষের পরিচিতি তার নিজের কাছেই। তার দেহে রাজরক্ত প্রবাহিত হচ্ছে কিনা, তার জন্ম কুতুব-আউলিয়ার ঔরসে কিনা, তার বংশ সৈয়দ কিংবা আরবি ছিলো কিনা, তার রক্তে ব্রাহ্মণ না শূদ্রের ধারা প্রবাহিত, তার পূর্বপুরুষ প্রভূ ছিলো না ভৃত্য ছিলো, আর্য ছিলো নাকি অনার্য, ভারতীয় ছিলো নাকি বহিরাগত– এসব বিষয় এতোই গৌণ অনাকাঙ্ক্ষিত, এসব মানুষের সত্যিকার পরিচয়কে বিভ্রান্ত ও আড়াল করে রাখে।

নূহের ঘরে আল্লাহর দুশমন জন্মেছিলো। আবার মূর্তিপূজক আজরের ঘরে ইব্রাহিম জন্মেছেন। তবে আলোরধারা প্রবাহিত হয়ে একজন থেকে আরেকজনের কপালে সৌভাগ্যের রাজটীকা পরিয়ে দেয়। পিতা ইব্রাহিম থেকে নবুওয়তের নূর প্রবাহিত হতে হতে মুহাম্মাদ সা. ইবনে আব্দুল্লাহ পর্যন্ত পৌছেছে। আজ আমরা দ্বীন পেয়েছি, বন্দেগী আমাদের নসিব হয়েছে, এসবের উৎস দ্বীনের কালেমা। ইসলামের আলোর বন্যায় ভাসতে ভাসতে আজ আমরা এখানে পৌছেছি। উৎসের সন্ধানে আমাদের যেতে হয় না। আমরা যেখানে আছি সেখানেই আমাদের দ্বীন মওজুদ আছে। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত দ্বীনের বিধান জারি করা আছে। প্রতিটি নিশ্বাস ও প্রশ্বাসে ইসলামি বিধান কার্যকর আছে। আমরা আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে আছি। আল্লাহর রঙের চেয়ে সুন্দর রঙ আর কি হতে পারে? মুশরিক তার মূর্তিকে রঙতুলি দিয়ে আঁকছে, মুরতাদরা মুশরিকের অঙ্কন, সাজ, সুর ও লয় মন্থন করে। আর আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার

রঙতুলিতে আঁকা সুন্দর চরিত্র ও বন্দেগী নসিব হওয়া মানুষ।

আপনি যদি অন্ধকার কূপের মধ্যে পড়ে যান এবং এই চরম বিপদে যদি দেখতে পান, একটি রশি উপর থেকে নেমে এসেছে, তখন কি আপনি চিন্তা করবেন, এটা ধরবো কিনা, ধরলে ছিড়ে যাবে কিনা, যদি না ছিড়ে তাহলে উপরে টেনে তুলতে পারবে কিনা ইত্যাদি? অথচ তখন শক্ত করে ধরে থাকাটা জরুরি; জানা থাকা উচিত, যিনি রশি ফেলেছেন তিনিই টেনে তুলবার ব্যবস্থা করবেন, তেমন ব্যবস্থা তার আয়ত্ত্বে আছে বলেই তিনি রশি ফেলেছেন।

আমরা আল্লাহর রজ্জু ধরে আছি। দয়াময় বলেছেন, *তোমরা আল্লাহর রশি শক্ত করে ধরে থেকো, কখনো পৃথক হয়ো না।*

মুসলমান মায়ের সন্তান, মুসলমান পিতার সন্তান, সে এইসব উৎসের সন্ধান করে প্রমাণ করতে চায় সে ম্লেচ্ছ ছিলো, তার পিতৃপুরুষ অচ্ছুৎ ছিলো, অস্পৃর্শ্য ছিলো। সে পিতৃপুরুষের ঋণ শোধ করছে তাদেরকে অপমানিত করে।

সে ভাবে না, কত মৃত্যুর মুখোমুশি হয়ে তারা কালেমাকে বুকে ধারণ করে তার কাছে পৌছিয়েছেন। কত কাপালিকের কৃপাণের আঘাত, কত রক্তের নদী পার হয়ে, কতবার কতভাবে নিঃস্ব হয়ে, বহু রজনী পার হয়ে আলোর উৎস থেকে ঈমানের নূরকে বহন করে এই হতভাগ্য বংশধরদের কাছে পৌছে দিয়ে তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

এরা সেই ঋণ শোধ করছে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে। রবীন্দ্রসংগীত যাদের ইবাদত এবং আপন সন্তানকে ও নিজের বোনকে পূজারবেদিতে যারা বলি দিয়েছে, তারা তাদের পিতৃপুরুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ইতিহাস সাক্ষী থাকুক। এদের সন্তান-সন্ততি ও উত্তর পুরুষ নিশ্চয় একদিন অনুশোচনায় জ্বলবে, যারা তাদের আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে গেসো তাদের জন্য অন্তরে প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করবে; যদি কোনোদিন কেউ আবার আল্লাহকে চিনতে পারে, হেদায়েত নসিব হয় তখন তাদের উৎসের এইসব কলঙ্ককে বারবার অভিশাপ দেবে।

হে মানুষ! তুমি নদী নও যে তোমার উৎস হিমালয় কিংবা কাঞ্চন জঙ্ঘা হবে।

কবিরা নারীকে নদীর সাথে তুলনা করে। প্রচলিত আছে, বাস্তব বিবর্জিত মানুষই কবি হয় আর পাগল হয়।

মানুষ তুমি বৃক্ষ নও যে তোমার শিকড় থাকবে। তুমি বানর নও যে শওকত ওসমানের বিবর্তনবাদের বক্তৃতা তোমাকে বিভ্রান্ত করবে। আর তুমি সত্যি সত্যি কবে তোমার লেজ খসেছে তার সন্ধানে গবেষণা করবে।

মানুষের তুলনা শুধু মানুষই। মানুষকে আল্লাহ পাক জ্ঞান দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন আরো দিয়েছেন দ্বীন। এই দ্বীনকে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির নাগালের মধ্যে রেখেছেন। যে এই দ্বীনের বিরোধিতা করে সে জেনে শুনেই করে। যখন সে

বেপরোয়া হয় তখনই সে আল্লাহর হুদুদের বাইরে পা রাখে। আপন মতবাদে সন্তুষ্টি তাকে সীমালঙ্ঘনে উৎসাহ যোগায়। তখন সে অনেক দূরের বস্তু দেখতে পাচ্ছে বলে মনে করে। অনেক দুর্বোধ্য কিছু বুঝতে পারছে বলে মনে করে। অথচ তারা খুব কাছের জিনিসও দেখতে পায় না; সহজ সত্যকে উপলব্ধি করতেও ব্যর্থ হয়। তারা শুধু অহংকারকে বৃদ্ধি করে। অন্যের অস্তিত্বকে কলুষিত করার ফন্দি-ফিকির করে।

সে কি জানে না, প্রত্যেক মানুষকে দুইবার করে প্রস্রাবের রাস্তা অতিক্রম করে দুনিয়াতে আসতে হয়েছে? তার সৃষ্টির দুই নিকটতম উৎসের সন্ধান করলেই মাথা নীচু হয়ে যাবে, অহঙ্কার তার নিজের পায়ের তলায় আশ্রয় নেবে।

দয়াময় তাকে সুন্দর অবয়ব দিয়েছেন, দুনিয়াতে আসার পর ইজ্জত দিয়েছেন, সম্মানিত করেছেন, দ্বীনের দৌলত নসিব করেছেন, তার পবিত্র সত্ত্বাকে সিজদাহ করার অনুমতি দিয়েছেন।

মানুষ তার জন্মের উৎস থেকে শুরু করে জীবনের বিচিত্র গতি আর পরিণতির কথা স্মরণ করবে, চিন্তা করবে, অজান্তে তার জবান বলে উঠবে আল্লাহু আকবার– *দয়াময় তুমিই শ্রেষ্ঠ।*

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে কালের কাপালিকরা আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চায়? আমাদের জ্ঞানচক্ষু প্রখর শক্তিসম্পন্ন ও সদাজাগ্রত। রাতের অন্ধকারেও আমরা শত্রুকে চিনতে পারি। অন্ধের নিজের চোখে আলো নেই বলে তাকে প্রদীপ হাতে চলতে হয়, প্রদীপের আলো দেখে অন্যরা তাকে সনাক্ত করে। সে অসহায়, জ্ঞানচক্ষু তার দৃষ্টিহীন। সে চক্ষুষ্মানের করুণার পাত্র।

মিশরের হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন ফেরাউন সভ্যতার নিদর্শন এখনো বিদ্যমান আছে। বিশালাকার পিরামিডে এখনো রামেসিস ও মারনেপতাহ প্রমুখ ফেরাউনের লাশ মমি করে রাখা আছে।

তাদের সমকালীন নবী ছিলেন মুসা আ.। ছিলেন হারুন আ.। তাদের লাশ এভাবে সংরক্ষিত হয়নি। কিন্তু তাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাব সংরক্ষিত ছিলো। ফেরাউনের সংস্কৃতি কেউ ধরে রাখেনি কিন্তু নবীর আমল-আখলাক, তালিম-তরবিয়ত বনি ইসরাইলের জীবনে প্রতিফলিত ছিলো। আজকের মিশরবাসীও ফেরাউনের লাশ কাঁধে নিয়ে মিছিল করে না পিরামিডসভ্যতা কিংবা ফেরাউনসংস্কৃতি পুনঃপ্রবর্তনের জন্য। আল্লাহর দ্বীন তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে এনেছে। ইসলামের আলোময় জগৎ তাদের বাসস্থান। দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ কখনো কোনো কিছু হাতড়িয়ে খুঁজে না। অন্ধের হাতের কাছের জিনিসও বহুদূরের জিনিস।

উৎসের সন্ধান করতে হলে উৎস পর্যন্ত পৌঁছার উপযুক্ত হওয়া চাই। যারা পৃথিবীতে পুনর্জন্মে বা জন্মান্তরে বিশ্বাস করে তারা তাদের উৎসে যাবে কেমন করে? এই জন্মে মানুষ হয়ে জন্মেছে, গত জন্মে কি ছিলো তা কি সে জানে?

জন্ম থেকে জন্মান্তরে আকাশ-পাতাল, নদ-নদী, বন-জঙ্গল অতিক্রম করে সে মানব-জন্ম লাভ করেছে। উৎসের সন্ধানে সে যেখানে যায় যাক কিন্তু মুসলিম নামধারী কালেমাওয়ালা মায়ের বুকের দুধ পানকারী সন্তান, কুরআনের অমিয়বাণী উচ্চারণকারী অসংখ্য আত্মীয়-অনাত্মীয়, সন্তান-সন্ততি ও আপনজনদের আত্মার আশ্রয়ে প্রাণের স্পর্শে লালিত দুর্ভাগা মানুষ কি করে ঐ উৎসের সন্ধান করে যেখানে তাকে দেখতে পেলে সকলে তার স্পর্শ থেকেও বহুদূরে পালিয়ে যাবে!

ইসলাম মানুষকে মানুষের মর্যাদা, মনুষ্যত্বের মর্যাদা, অন্তরের অফুরন্ত সুখ-শান্তি ও প্রেমের সন্ধান দিয়েছে। এরপরও মানুষ কিসের সন্ধান করে?

আল্লাহ্ দয়াময় মানুষকে মঙ্গলের সন্ধান দেন আর মানুষ শয়তানের পথ আবিষ্কার করে মহানন্দে সেদিকেই দলবেধে ছুটে যায় আর জিল্লতীর নসিব হাসিল করে। নিজে ও আপন পর সকলের দুনিয়া-আখিরাতকে লানতের উপযুক্ত করে তুলে। একের পাপে হাজার জীবন মুসিবতের সম্মুখীন হয়।

উৎস দিয়ে মানুষের জীবনকে মূল্যায়ন করা হয় না। পরিণতি দিয়ে জীবনের মূল্যায়ন করাই মানবজীবনের দাবি। তার সব ভালো যার শেষ ভালো। এইমাত্র যে পশুর পূজারী ছিলো, এখনি সে তৌহিদের সুধা পান করে জান্নাতের পথিক হতে পারে।

উসাইরাম রা. জীবনে এক রাকাত নামাজ পড়ার সুযোগ পাননি, কিন্তু জিহাদের ময়দানে তার রক্তাক্ত লাশকে সনাক্ত করে আখেরী নবী মুহাম্মাদ আরাবি সা. তার জান্নাতবাসী হবার সংবাদ জগৎবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন।

মুসলমানের সৌভাগ্য তার মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করা। আর তা যদি না হয় তবে অন্তত কোনো এক পরম মুহূর্তে শিরকের শৃঙ্খল-বন্ধন ছিড়ে ফেলে ইসলামের মুক্ত-পবিত্র জীবনে স্বশরীরে হাজির হওয়া। আর দ্বিতীয় ভাগ্য হলো, বন্দেগী নসিব হওয়া।

যে হতভাগারা নিজের হাতে আপন ভাগ্যলিপিতে আগুন দিয়েছে, কপাল পুড়িয়েছে, তারা তাদের পোড়া কপালের ছাই দিয়ে আপনজনদের কপালে কালি মেখেছে, কলঙ্কিত করেছে। নিজেদের প্রজ্জ্বলিত আগুনে ঘর-সংসার ছারখার করেছে। সেইসব কাপালিকরা করবে উৎসের সন্ধান। আমরা করি আলোর সন্ধান, যে আলো আমাদেরকে নিয়ে যাবে পরমপ্রিয় মাবুদের সান্নিধ্যে।

ن والقلم وما يسطرون
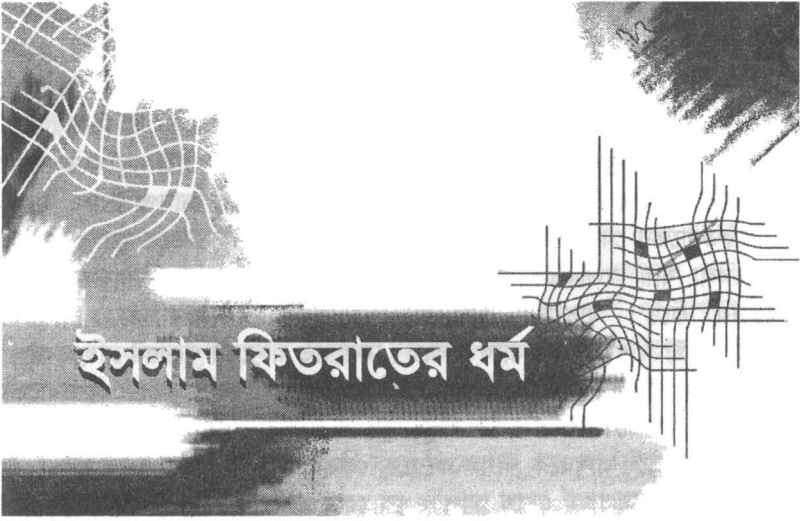
আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পানি নদী বেয়ে সমুদ্রে যায়। এটা খুব সহজ কথা। কিন্তু আকাশে মেঘ আসে কোথা থেকে? মেঘ আসে সমুদ্র থেকে। সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়ে আকাশে উঠে। তা আকাশে শীতল হয়ে মেঘ হয়। সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। দু'টোই সহজ কথা। গতি নিম্নমুখী হতে পারে, উর্ধ্বমুখীও হতে পারে। দু'টোই প্রকৃতির নিয়ম।

ইসলাম অর্থ শান্তি। যার শান্তির প্রয়োজন তার ইসলামের প্রয়োজন। যে সমাজ শান্তি কামনা করে সেই সমাজে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো দরকার। যার অন্তর বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ, সমুদ্রের মতো উদার, তার কাছে ইসলামের দাওয়াত মৃতের পুনর্জীবন লাভের সমতুল্য। কিন্তু সব পানিই পানীয় নয়। বৃষ্টির পানি পান করা যায়। কিন্তু সমুদ্রের পানি পান করার উপযুক্ত নয়। প্রকৃতির নিয়মে যদিও একই পানি আকাশ থেকে সমুদ্রে আবার সমুদ্র থেকে আকাশে উঠছে অনন্তকাল ধরে।

সব মেঘে বর্ষণ হয় না। কখনো প্রচণ্ড গর্জনে বিদ্যুৎপাত হয়, ঝড় তুফান হয়, তারপর বৃষ্টিপাত হয়। শান্তির জন্য শক্তির প্রয়োজন কখনো হয়ে উঠে অবশ্যম্ভাবী। তবে তা পশুশক্তি নয়। মানবতার শক্তি। প্রয়োজন কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। ইসলামে শান্তির সহায়ক এই শক্তির নাম জিহাদ। ইসলাম প্রকাশ্যে তা ব্যবহার করে, অন্যরাও তা ব্যবহার করে, কিন্তু স্বীকার করে না, মিথ্যাচার করে, ধোঁকাবাজী করে; শান্তির নামে শক্তিকে অপব্যবহার করে, শান্তিকে কৌশলে আপন স্বার্থ হাসিলে কাজে লাগায়।

কোনো হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জিহাদ হয় না। ইসলামে শান্তির লক্ষ সর্বোচ্চ। আবার এই লক্ষ অর্জনে জিহাদের মর্যাদাও সর্বোচ্চ। শান্তি যেমন জীবনের নিরাপত্তার মধ্যে নিহিত, তেমনি নিরাপত্তা জিহাদের মধ্যে নিহিত। এই দু'য়ে মিলে ফিতরাত। ফিতরাতের উপরই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। এই ফিতরাতকে যারা বুঝে না বা বুঝতে চায় না তারা সত্যকে লুকানোর চেষ্টাই শুধু করে, তারা মিথ্যাচারী বৈ আর কিছু নয়, এরাই আজকের দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপাপী।

ফিতরাতের কোনো হুবহু বাংলা প্রতিশব্দ সম্ভবত নেই। তবে খুব কাছাকাছি অর্থে বলা যায় স্বভাবধর্ম। মানুষের স্বভাবধর্ম তা যা মানুষ অনায়াসে করে, স্বেচ্ছায় করে। মানুষের স্বভাবধর্ম মানুষেরই স্বকীয়বৈশিষ্ট্য। মানুষের স্বকীয়বৈশিষ্ট্য মানুষকে মহিমান্বিত করে। ফিতরাত মানুষের গুণেরই বহিঃপ্রকাশ। ফিতরাতের বাইরে মানুষ যা করে, তা মানুষকে শুধু খাটো করে। ফিতরাতের মধ্যে এক মানুষকে দেখে অন্য মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায়। এই কারণেই ইসলামের সৌন্দর্য যুগে যুগে মানুষকে পাগল করেছে, কেননা ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম।

একজনের অপকর্ম দেখে আপনি খুব রেগে গেলেন, এক থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেবো ইত্যাদি বলতে বলতে সত্যি সত্যি কষে এক চড় বসিয়ে দিলেন। সোজা হিসাব-আপনার ডান হাত আর দুস্কৃতিকারীর বাম গাল-ফলাফল প্রচণ্ড চপেটাঘাত। অথবা একজন আপনার সাথে শক্তিপরীক্ষার জন্য পাঞ্জা লড়তে চাইলো। আপনি প্রস্তুত, দু'জনের ডান হাত পাঞ্জা ধরলো। আপনার ডান হাত প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে বামে ঝুঁকতে চাইবে। প্রতিপক্ষও তাই করবে। অর্থাৎ ডান হাতের কাজ ডান থেকে বামে যা স্বাভাবিক, সহজ ও সাবলীল।

আমাদের লেখার কাজটি করে ডান হাত। আরবি লেখার নিয়ম ডান থেকে বামে। কুরআনুল কারীমের লেখাও ডান থেকে বামে। এটাই ফিতরাত। একটি শিশুকে প্রথম লেখা শিখানোর সময় লক্ষ করুন, যত সহজে ডান থেকে বায়ে আঁকবে তত মুশকিলে বাম থেকে ডানে যাবে। ইংরেজ দেশে তাই আজকাল অনেকে বাম হাতে লেখে এবং আমাদের মতোই দ্রুতগতিতে লেখে।

মুসলমানের সৌন্দর্য তার মুখমণ্ডলের দাড়ি। একজন দাড়িবিহীন লোক দাড়ি রাখলে তার সৌন্দর্য বাড়ে কিনা এই নিয়ে তর্ক করতে পারেন, তবে কোনো লোক দাড়ি রেখে অনেকদিন পর যদি হঠাৎ তা কামিয়ে ফেলে, তখন তাকে বিশ্রী দেখায়- এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া দাড়ি মানুষের পৌরুষকে উজ্জ্বল করে তুলে। কেননা এটা ফিতরাতের দাবি। ইদানিং আমরা দাড়ি কামিয়ে মেয়েলি হচ্ছি আর পাশ্চাত্যে দাড়ি রাখার প্রচলন এখন সর্বাধিক।

ইসলামে পোষাক সব সময়ই ঢিলেঢালা, লম্বাচওড়া। আজকাল আমরা যতই সাহেবী পোষাক পরি, ঘরে ফিরে কোনো রকমে এসব ছেড়েছুড়ে লুঙ্গি-পাজামা ও পাঞ্জাবী পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি। কেননা, এটাই ফিতরাতের দাবি।

দূরপ্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যেও এর ব্যতিক্রম নয়। ঘরে ফিরে ওরা লম্বা স্লিপিংড্রেস গায়ে দিয়ে স্বাচ্ছন্দ অনুভব করে। আল্লাহ্ পাক সমস্ত মাখলুককে ফিতরাতের উপর সৃষ্টি করেছেন। মানুষকেও ফিতরাতের উপর সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষই কেবল তার ফিতরাত বিরোধী কাজ করে।

পাখিরা সারাদিন কিচিরমিচির ডাকাডাকি করবে, দৌড়ঝাপ দেবে কিংবা এখান থেকে ওখানে উড়ে বেড়াবে। কিন্তু সন্ধ্যার পর সব নীরব, নিঃস্তব্ধ। একি শুধু অন্ধকারের কারণে? শহরে বহু জায়গাকে আলো ঝলমল করে তোলা হয়; তাই বলে পাখিরা আলো দেখে ডাকাডাকি করে বাইরে বেরিয়ে পড়ে না। জগতের কোনো পশু-পাখি আল্লাহর ফিতরাতের বাইরে একটি পা রাখতে রাজি হবে না। কেবল সৃষ্টিরসেরা মানুষই আল্লাহর ফিতরাতের বাইরে পা রাখতে চায়। আর তখনই আসে মুসিবত। নিজের তৈরি বিপদে আটকা পড়ে যাতে মানুষ কষ্ট না পায়, ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য দয়াময় আল্লাহ্ ফিতরাতের উপযোগী নিয়মনীতি ও আইন তৈরি করে দিয়েছেন, যার নাম ইসলাম। ইসলাম আল্লাহ্ পাকের মনোনীত দ্বীন। ইসলামে যা কিছু সহজ, তা যেমন ফিতরাত, যা কিছু কঠিন তা-ও ফিতরাত। যেমন ধরুন কিসাস।

আল্লাহ্ পাক কিসাসকে বলেছেন জীবন। কুরআনুল কারীমে পানিকে বলা হয়েছে জীবন আর হত্যাকেও বলা হয়েছে জীবন। পানি যে জীবন এটাতো সবাই বুঝি। কিন্তু হত্যা? কিসাস? এটা বুঝতে হলে কিছুদিন আরবদেশে বসবাস করতে হবে। মক্কা মুকাররামা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত সাড়ে চারশত কিলোমিটার কিংবা জেদ্দা থেকে রিয়াদ পর্যন্ত দুই হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে আপনার পড়বে ছোট ছোট অসংখ্য বস্তি। কোনোটি পথের পাশে, কোনোটি গহীন পাহাড়ের অভ্যন্তরে। চারিদিকে জনমানবহীন এসব বস্তিতে শুধু গরিবরা নয়, ধনীরাও বসবাস করে। এসব সুদূর জনপদে মানুষ খুন হলেও শহরে খবর আসতে কয়েকদিন লাগবে। কিন্তু এখানেও জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা শহরের মতোই।

জেদ্দা শহর লোহিতসাগরের তীরে অবস্থিত। কয়েক মাইল জুড়ে সমুদ্রতীরকে প্রমোদভ্রমণ ও অবকাশযাপনের জন্য নানাভাবে সাজানো হয়েছে। সপ্তাহান্তে আরবরা সপরিবারে হাজির হয় এখানে। কখনো মধ্যরাত, কখনো সারারাত এখানেই কাটায়। কোনো কোনো পরিবার রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে দু' একদিন থেকেও যায় এ উন্মুক্ত সমুদ্রসৈকতে। গভীররাতে দেখবেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছে কিংবা আশেপাশে বহুদূর পর্যন্ত কেউ নেই, কিন্তু নিশ্চিন্তে বসে আছে কোনো যুবক-যুবতী– নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে কোনো স্বামী। সামনে অথৈ সমুদ্র, পশ্চাতে বহুদূরে শহর। এখানে এই বালুকাবেলায় গভীর নিশীথে পড়ে আছে সম্পদ, সৌন্দর্য, রূপ-লাবণ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও রয়েছে নিশ্চিত

নিরাপত্তা। এসব কেমন করে সম্ভব হলো? সম্ভব হয়েছে একমাত্র কিসাসের কারণে। একটি দু'টি হত্যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে নিরাপত্তা দিয়েছে।

আল্লাহ পাক যথার্থই বলেছেন, *এসব হত্যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের জীবন।* এই সহজ কথাটি যারা বুঝে না তারা ফিতরাত বুঝে না। যারা ফিতরাত বুঝে না, তারা ইসলাম বুঝে না।

রাজনীতি মানুষের স্বভাবধর্ম। যে রাজনীতি সচেতন নয়, তার মধ্যে মানবতার পূর্ণতা নেই। মুসলমানের জীবনব্যবস্থায় রাজনীতি অপরিহার্য। রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামের জীবনব্যবস্থার সাথে প্রশ্নাতীতভাবে জড়িত। মুসলমান যে কাজ করতে পারে, তারই নাম ইসলাম। ইসলামকে যে লালন করে সেই মুসলমান। যে কাজে ইসলাম নেই, সে কাজ মুসলমানের নয়। যেখানে ইসলামের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সেখানে মুসলমানের প্রবেশও নিষিদ্ধ। তাহলে ইসলামকে বাদ দিয়ে যারা রাজনীতি করেন তারা কি হারাম কাজ করেন? ইসলামকে রাজনীতির বাইরে বিদায় করে দিয়ে রাজনীতিকে মুসলমানের জন্য কি হারাম করে দিতে চায় ওরা? কিন্তু বাস্তবে এটাই সত্য, যারা রাজনীতি করেন, তারা ইসলামের জীবনব্যবস্থার কথাও বলেন। তাদের একথাও জানা উচিত, রাজনীতিতে যদি ইসলাম নিষিদ্ধ হয়, তাহলে রাজনীতিও মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু বাস্তব তার বিপরীত। রাজনীতিও ফিতরাতের তাগিদ, স্বভাবধর্মের তাগিদ। ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম, তাই রাজনীতিও ইসলামের জীবনব্যবস্থার অংশ।

আরবিতে 'প' অক্ষর নেই। আগেও ছিলো না, এখনও নেই। যদি ফিতরাতের দাবি হতো, তাহলে 'প' অক্ষরটি এতোদিনে আরবিতে স্থান করে নিতো। কোনো শিশুই হাজার কান্নাকাটি করেও পানি চাইতে পারে না। 'মাম' অথবা 'মান' বললে মাকে বুঝে নিতে হয়, সন্তান পানি চাচ্ছে।

নয় বছরের শিশু ছয়শত পৃষ্ঠার কুরআন মুখস্থ করেছে শুনলে কেউ অবিশ্বাস করে না। ওজর ব্যতীত একটি রোজা ভঙ্গ করলে একাধারে ষাটটি রোজা রেখে কাযা আদায় করতে হয়, কিন্তু সফরে ইচ্ছা করলে রোজা ভাঙা যায় এবং একটির বদলে একটি রোজাই পরে আদায় করে নিতে হয়।

ইসলামে যা কিছু সহজ এবং যা কিছু কঠিন, সবই ফিতরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম মানুষের স্বভাবধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা নয়। দয়াময়ের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মাখলুক মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ ফিতরাতের উপর সৃষ্টি করেছেন এবং সেই ফিতরাতের উপযোগী দ্বীনকে তাদের জীবনব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করেছেন।

ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম এবং একমাত্র ইসলামই ফিতরাতের ধর্ম।

বর্তমান বিশ্বে যতো নিলাম ডাক হয়, তার মধ্যে 'ক্রিষ্টির' সবচেয়ে দামি ও বিখ্যাত। সংবাদপত্র ক্রিষ্টির নিলাম কোনো কোনো জিনিসের অবিশ্বাস্য রকমের ডাক উঠে। সামান্য একটি হাতের লেখা হয়তো লক্ষ কোটি টাকায় কেউ কিনে নিলো। ভ্যান গগ্ এমন এক চিত্রশিল্পী ছিলেন, যিনি প্রায় না খেয়েই মারা গেছেন। কয়লাখনির শ্রমিক ছিলেন, কয়লা দিয়েও ছবি আঁকতেন। সম্প্রতি ক্রিষ্টির নিলামের সংবাদ শুনে অনেকে হতভম্ব হয়ে যান, কিন্তু আসলে বিস্ময়ের কিছু নেই। যে যা চিনে, সে-ই তা কিনে এবং যথার্থ মূল্য দিয়েই কিনে।

সৌদিআরবের এক অভিজাত বিপনীতে একদিন দেখলাম এক বৃটিশ দম্পতি ১৮" × ৩০" এক টুকরা কার্পেট কিনলেন ৩৭০০ ডলার দিয়ে। অবাক হয়ে দোকানীকে জিজ্ঞাস করলাম, ব্যাপার কি? তিনি জানালেন, বিশেষ সংগ্রহ হিসেবে ধনী অভিজাত পরিবার এসব হাতে কাজ করা তুর্কী ওয়ালমেট এর চেয়ে বহু উচ্চমূল্যে খরিদ করে থাকে।

আমি লণ্ডনে এক মুসলিম বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাড়ির সাজসজ্জা দেখে নির্বাক হয়ে গেলাম। বড়বড় ক'টি ফুলদানির মতো মাটির পাত্র দেখলাম। যার উচ্চতা প্রায় পাঁচ-ছয় ফুট হবে, এগুলো তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে বিমানে এনেছেন। মৃৎশিল্প ছাড়া আরো বহু শিল্পকর্ম দিয়ে তিনি বাড়ি সাজিয়েছেন। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়ী এই শৌখিন ব্যক্তির বাড়িতেই একটি ব্যক্তিগত অফিস আছে। তাঁর অফিস কক্ষটিও দেখার মতো। এতো সুন্দর

আসবাবপত্রের মধ্যে তাঁর ছোট্ট টেবিলটির উপর পৃথিবীর একটি গ্লোব (মানচিত্র) রাখা ছিলো। একেবারেই বেমানান এবং প্রায় অসুন্দর পিতল জাতীয় কোনো পদার্থের তৈরি ঐ বস্তুটি দেখে আমি ঠাট্টা করে বলেই ফেললাম, এটা কি কোনো আশ্চর্য জিনিস, যা খুব গভীরভাবে দেখার দাবি রাখে? তিনি মৃদু হেসে বললেন, অনেকটা তাই, কাছে গিয়ে দেখুন। দেখলাম, প্রাচীন আরবি হরফে এমন সব নামধাম খোদাই করে লেখা, যাতে অনুমান করা যায়, এটি একটি সাধারণ গোলক নয়। তিনি জানালেন, এই ভূগোলকটি যখন তৈরি করা হয়, তখন বর্তমান পৃথিবীর অনেক অংশ আবিস্কৃত হয়নি। সাত হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লাখ সত্তর হাজার টাকা দিয়ে তিনি এই দুস্প্রাপ্য গ্লোবটি এক আরব আমেরিকান পরিবারের কাছ থেকে কিনেছেন। কিন্তু ইদানিং ঐ পরিবারের মাধ্যমেই এক ধনী আরব দ্বিগুণ মূল্যে তাঁর কাছ থেকে এটা কিনতে চাইছেন। অবশ্য বন্ধুটি বললেন, তিনি বিক্রি করার কথা চিন্তাই করছেন না বলে তাঁকে পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন। আসল কথা হলো, যে যা চিনে সে-ই তা কিনে।

আবিসিনীয় ক্রীতদাস বিলাল রা. আল্লাহর নাম শুনে এমন পাগল হলেন, তাঁর মালিক দিনের পর দিন তপ্ত বালুর উপর তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখার পর যখন পিঠের চর্বি গলতে লাগলো, তখনো তিনি প্রিয়তম দয়াময়ের নাম জপতে লাগলেন। এমন আল্লাহ্ প্রেমিকের এই অবস্থার কথা শুনে আবু বকর সিদ্দীক রা. ছুটে গিয়ে কোরাইশ নেতাকে জানালেন, এই কাফ্রী দাসটিকে তিনি কিনে নিতে চান যেকোনো মূল্যে। কোরাইশ কাফের অবাক হয়ে ভাবলো, আবু বকর কত আদনা জিনিস কত উচ্চমূল্যে কিনছেন? সে কি জানতো, একদিন এই কালো ক্রীতদাসকেই সমস্ত আরব অভিজাত মানুষ *'স.ইয়্যেদেনা বিলাল রা.'* বলে সম্বোধন করবে? যিনি ঐ কালো মানিককে চিনেছিলেন, তিনি যথার্থ মূল্য দিয়েই তাকে কিনেছিলেন।

অনেক মূল্য দিয়ে মুক্ত করেছিলেন সালমান ফারসী রা. কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীরা রা.। তিনশত খেজুরের চারা সংগ্রহ করতে নেমেছিলেন সবাই। স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারা রোপন করেছিলেন এবং আরো চল্লিশ আউন্স স্বর্ণ ছিলো দাসত্ব মুক্তির মূল্য। এই সওদা বৃথা যায়নি। খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের কৌশল ছিলো এই পারসিক জ্ঞানতাপসেরই দান। খন্দকে কাফেরের পরাজয়ই ছিলো মুসলমানদের বিশ্ব বিজয়যাত্রার সূচনা। যে যাত্রা আর কখনো থামেনি। সুদূর ইরানের ইস্পাহান থেকে আসা রিক্ত-শ্রান্ত-ক্লান্ত ধূলোয় ধূসর সালমান নামের পরশমণিকে চিনতে তাঁরা ভুল করেননি, তাই মুহাজিররা বলতেন, সালমান ফারসী রা. আমাদের। কেননা, তিনি তোমাদের আগে এখানে আমাদের সাথে ছিলেন।

কেনআনের কূপে যে কিশোরকে তাঁর আপন ভাইয়েরা নিক্ষেপ করেছিলো এবং তিনদিন পর তাকে যখন এক কাফেলার লোক দৈবক্রমে উদ্ধার করে, তখন আবার তাঁকে মাত্র কুড়ি দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়া হয়। দশ ভাইয়ের ভাগে পড়ে মাত্র দুই দিরহাম করে। ঐ কিশোরকেই মিসরের বাজার থেকে আজীজে মিসর তাঁরই সমান ওজনের স্বর্ণ, মৃগনাভি ও রেশমী বস্ত্রের বিনিময়ে খরিদ করে। নবীর সন্তানকে মাত্র দুই দিরহামের বিনিময়ে কেউ বিক্রি করে দেয় আবার বাজার থেকে গোলাম হিসেবে তাঁকেই উচ্চমূল্যে কেউ কিনে আনেন- যিনি পরে মিসরের শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন এবং আল্লাহপাক তাঁকে নবীর মর্যাদা দান করেন। আজীজে মিসর কিশোর ইউসূফ আ. কে চিনতে ভুল করেননি, তাই অতি উচ্চমূল্য দিতেও কসুর করেননি এবং তাঁর এই সওদাও বৃথা যায়নি।

বানরের গলায় যদি কেউ মুক্তার মালা পরিয়ে দেয়, তাহলে সে কী করবে? প্রশস্তি গেয়ে যে কবি বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁর একমাত্র সন্তান ইসলামের সীমান্ত অতিক্রম করে অবিশ্বাসীর সাথে সংসার পেতেছে। কবির জন্য নাজাত চাইতে কোনো মুসলিম বংশধর তিনি রেখে যেতে পারলেন না। যে যা চিনে না, তা হারানোর দুঃখও তার নেই। ধর্মনিরপেক্ষতা এতোটুকু কাতর নয়। কারণ, যা হারিয়েছে তা চিনে না, অচেনা বস্তুর জন্য মায়াও নেই, হারানোর ব্যথাও নেই।

আল্লাহ পাকের দ্বীনকে চিনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা কত মূল্য দিয়ে এই দ্বীনকে কিনেছেন, সেই ইতিহাসই ওদের কাছে নিরর্থক। পিতার ঔরসে আর মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়ে মানুষ কত ভাগ্যবান হয় আবার একইভাবে জন্ম নিয়ে কত দুর্ভাগা হয়। দ্বীনকে চিনার কারণে জলিলুল কদর সাহাবী আজমাইন দ্বীনের জন্য যে সওদা করেছেন, সেই ইতিহাসকে পিছনে ফেলে দিয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁদেরকে কেউ পিছনে ফেলতে পারবে না। আজো কোনো মরণজয়ী মুজাহিদ যখন দ্বীনকে গলায় পরে, তখন নির্বোধ মূর্খরা ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়েই থাকে।

শিশুকালে মায়ের কোল থেকে হারিয়ে যাওয়া যায়েদ পথে পথে ঘুরে অবশেষে আরবের বাজারে নিলামে উঠলেন এবং ভাগ্য তাঁকে নবীগৃহের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলো। সন্তানহারা পিতা দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সন্ধান করতে করতে একদিন খুঁজে পেলেন পুত্রকে। যায়েদকে কেন্দ্র করে যা কিছু ঘটেছে, সবই বিস্ময়কর। কিন্তু তাঁর বিস্ময়কর নবীপ্রেমের কোনো তুলনা হয় না। অশ্রুতে ভাসিয়ে পিতা ও পিতৃব্যকে ফিরিয়ে দিলেন এই বলে, তিনি যার আশ্রয়ে আছেন, সেখানেই বাকি জীবনটাকে ধন্য করতে চান।

কুরআনুল কারীমে আবু লাহাবের নাম আছে আর সোয়া লক্ষ সাহাবীর মধ্যে

মাত্র একজনের নাম আছে- যায়েদ রা.। যে চিনেছে আর যে চিনেনি তাদের তফাৎ এভাবেই জানা যায়। সেদিনের মতো আজকের আবু জাহেলরাও ইসলামের ছায়াতলে জন্ম নিয়ে ইসলামের রূপকে দেখে না। মঙ্গলপ্রদীপ নিয়ে অন্ধকারের দিকে ছুটে যায় আর ফিরে আসে না।

ইসলামের মতো সম্পদকে না চাইতেই যারা পেয়েছেন, তারা কী করে এ সৌভাগ্যকে সামান্য পয়সায় বিক্রি করে দিয়ে ভিখারী হয়ে কবরে যায়? এ কাঙালরা নেহায়েত পোড়া কপাল না হলে দ্বীনের পথে এমন দস্যুবৃত্তি করতো না। জিহাদের আজীমুশশান পথের উপর কাঁটা বিছিয়ে রাখতো না। যে আল্লাহকে চিনে না, সে আল্লাহর উপর বিশ্বাসস্থাপন করে না। অতএব, সে অবিশ্বাসী। যে চিনে, সে-ই বিশ্বাসী হয়, আর বিশ্বাসীরা সর্বপ্রথম যা দান করে, তা হলো তার জীবন। জিহাদ ফী সাবিলিল্লায় জীবন দেয়া-নেয়ার হিকমত ও রহস্য অনেকের মস্তিষ্কে আসে না। এজন্য তাদের আফসোস করা উচিত। মন্দের সবই যারা বুঝে, ভালোর সামান্য হিকমতটাও বুঝে না, এটা হটকারিতা বৈ আর কিছু নয়। দ্বীনের ভ্রান্ত আকিদা, ভুল ধারণা বুঝে নিয়ে যারা জেদ ধরে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে, তাদের ফিরায় কার সাধ্য? তালেবান যদি গালি হয়, জিহাদ যদি সন্ত্রাস হয়, মুজাহিদ যদি দুশমন হয়, ইকামতে দ্বীন যদি মৌলবাদ হয়, তাহলে এসব নিফাকের লালনকারীদের পরিচয় জানা খুবই জরুরি। কেননা, দ্বীন আমাদের কাছে খুবই দামি জিনিস আর দ্বীনহারা জাহান্নামের পথিক। অতএব, ঈমানের পরীক্ষায় ইসলামের রায়ই চূড়ান্ত।

যে যা চিনে, সে তা কিনে, বহুমূল্য দিয়ে হলেও কিনে, জীবন দিয়ে কিনে। একইভাবে যে উৎকৃষ্ট চিনে, সে নিকৃষ্টও চিনে। জান্নাতের যতো উপকরণ সে সামনে পায়, তা-ই সে খরিদ ক'রে আর জাহান্নামের সব ইন্ধন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। মানুষও জাহান্নামের এক ইন্ধন; তাই মানুষ হলেই তার সাথে রাখিবন্ধন মুমিনের জন্য জরুরি নয়। মানুষের সৃষ্টিকর্তা মানুষের পরিচয় যথার্থই কুরআনুল কারীমে দিয়েছেন। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও মুনাফিক সবাই মানুষ; অথচ একে অন্যে তফাৎ আকাশ-পাতাল। মুমিনের জন্য অবিশ্বাসী ও মুনাফিকের সাথে সহাবস্থান দুনিয়াতেও কাম্য নয়, আখিরাতেও নয়।

অবিশ্বাসীরা এক

সকল মুসলিম ভাই ভাই–একথা কতটুকু সত্যি? শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে যারা কাশ্মীরে, কসোভোয় পাখির মতো গুলি খেয়ে মরছে, তারা কি পৃথিবীর শত কোটি মুসলমানের ভাই? রাশিয়ান দানবরা আফগানিস্তান, চেচনিয়ায় যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে ও ঘটাচ্ছে, তাতে কি মুসলমান তার কোনো

ভাইকে হারিয়েছে? আমাদের কি ভ্রাতৃহারা মুসলমান বলে মনে হয় কখনো?

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো প্রতিদিনের এই পৃথিবী। আমার ভাই নিহত হয়েছে কসোভো ও মিন্দানাওয়ে, কান্দাহার ও সুদানে।

মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ ও পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার জন্ম হয় ইসলামের প্রতি ভালোবাসার কারণে। যারা অন্যকিছুকে ভালোবাসে, তারাই হয় ভ্রাতৃঘাতী। তারা মুজাহিদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারে, সাহাবা-সিপাহীদের কাঠগড়ায় আসামী বানাতে পারে। মুসলমানের বিশ্বাসে যদি সততা থাকে, যে বিশ্বাসের জন্য সে মুসলমান, তাতে যদি কোনো কপটতা না থাকে, তাহলে অন্য মুসলমানের মুসিবতে সে পেরেশান হয়ে যাবে। মদীনায় মুনাফিকরা মুসলমানের ক্ষতিসাধনের জন্য যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতো। আজ লতায়-পাতায় তাদের সংখ্যা কত হয়েছে, তা নিরূপণ করা গেলে মুসলমানদের সংখ্যা হাতে গুণে বলে দেয়া যেতো। মুসলিম একে অন্যের ভাই না হওয়ার কারণ তাদের বিশ্বাসের নিষ্ঠাহীন অসৎ আচরণ। অপরদিকে অবিশ্বাসীরাই বরং এখন একে অন্যের ভাই।*আল-কুফরু। মিল্লাতুন ওয়াহিদা*– অবিশ্বাসীরা একজাত।

ইসরাইল মুসলিম বিশ্বসহ আরবজাতির জাতশত্রু। ইসরাইলের বন্ধু ভারত, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আরবরা ভারতের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে খুব উৎসাহী, এটা কি স্বাভাবিক? তুরস্ক তাদের জাতির পিতার নির্দেশে ইসলামকে কবর দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হয়েছে, ইউরোপিয়ান হয়েছে। ইসরাইলের সাথে সামরিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মুসলিম শিবির পরিত্যাগ করার ফায়সালা করে ফেলেছে। তুরস্কের সাথে অন্য ধর্মনিরপেক্ষরা রাখীবন্ধনে উৎসাহী হবে এটা স্বাভাবিক। আমরা তুরস্কের প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এটা কি স্বাভাবিক?

একজন আমিরুল মুমিনীনের নাম শুনলাম আর মানলাম না এটা কি খুব স্বাভাবিক? বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের সাথে রাখীবন্ধন করে উলুধ্বনি দিলে হাবিলের কাক বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যায়।

মূর্খ অভিশম্পাতের যোগ্য। ইসরাইল আমাদের কাছের পড়শির সাথে বন্ধুত্বের সেতু নির্মাণ অযথাই করেনি। যাদের চোখে ছানি পড়েনি, তারা দেখছে এবং কতখানি আতঙ্কিত হয়েছে, তা এখন তাদের চেহারায়ও ফুটে উঠেছে। ইসরাইলীরা সম্প্রতি আরবদের জিন দিয়ে জীবাণুঅস্ত্র আবিষ্কার করেছে। কী সাংঘাতিক কথা! ভাবতেও অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। অথচ একথা শুনেও যে ক্ষমা করে দেবে সে মানুষ নয়।

মানবতাবিধ্বংসী ইহুদিজাতি গ্যাস চেম্বারে ধ্বংস হবার উপযুক্ত কিনা বর্তমান সভ্যতাই তার বিচার করুক। কিন্তু হতভাগ্য মুসলমান জাতির কি একথা শোনার জন্য খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে, পৃথিবীর সকল জায়গার

মুসলমানের জিন সংগ্রহ করে জীবাণুঅস্ত্র আবিষ্কার করছে ইহুদিরা? আল্লাহ পাকের *লানতপ্রাপ্ত* এই জাতি বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের বিপক্ষে সকল অবিশ্বাসীকে একত্রিত করার নীলনক্সা তৈরি করেই চলেছে, আর তালেবানের খোঁজে শহর-বন্দর চষে ফেলছে। হায়রে দুর্ভাগা জাতি! কার অভিশাপ তোমরা বয়ে বেড়াচ্ছো, তাও বুঝো না!

যেসব মুসলমানদের সাথে ইহুদিরা সরাসরি যোগাযোগ রাখতে অসুবিধা মনে করে, তাদের জন্য আমেরিকার নিরাপদ আশ্রয় খোলা রেখেছে ওরা। আমেরিকাকে বন্ধু বানাতে পারলে অনেকে দুনিয়াকেই জান্নাত মনে করে। মহান বন্ধুরাষ্ট্র, মহান দাতারাষ্ট্র ইত্যাদি কে কত বলতে পারে, তার প্রতিযোগিতা চলছে। অবিশ্বাসীরা একজাত। তারা একত্রিত হবে এটা স্বাভাবিক। *নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার* নামে ইহুদি-খৃষ্টান লবিতে আমরা আত্মাহুতি দিতে যাবো কেন? মুসলিম মিল্লাতকে আত্মঘাতি মুসলমানরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তা সত্ত্বেও আমাদের শক্তিই বিজয়ী হবে। কেননা, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে তফাৎ বজায় রাখার জন্য মুসলমানকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং সেজন্যই ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য।

মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ হতে পারে, কিন্তু ইসলামের মূলনীতির কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। আজ বিজেপি কাল কংগ্রেস করে বিশেষ ফায়দা হবে না। যা করতে হবে, তা কুরআনুল কারীমের পাতায় লেখা আছে। আমরা গরিষ্ঠ হয়ে নাকাম হয়ে আছি, ওরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে নাকাম হয়ে আছে। আমাদের সবাইকে জান্নাত অথবা জাহান্নামের যে কোনো একটিতে যেতে হবে। জান্নাতে যাবার পথ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সাহাবা রা. আজমাইনকে সাথে নিয়ে তেইশ বছরের জীবনে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। কঠিন হলেও, বিপজ্জনক হলেও সেই পথই একমাত্র পথ।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রতি চারজনের একজন মুসলমান। প্রতি বিশজনের একজন মুসলমান হলেও ইসলামকেই বিজয়ী করতে হবে। আশেকে রাসুল হওয়া সহজ। কিন্তু সাহিবুস সাইফের অনুসারী হওয়া সহজ নয়। সহজ যদি হতো, তাহলে এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে মুজাহিদ বলে বেঁধে আনতো না। তালেবান বলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতো না। আল্লাহর নির্দেশেই ইসলামের বিজয় কামনা করা হয়। তাহলে বাধা দেয় কারা? যারা বাধা দেয়, তারা বুঝুক আর না বুঝুক তারা যুদ্ধ করছে আল্লাহর বিরুদ্ধে। অতএব এই যুদ্ধের পরিণতি তাদের জানিয়ে দেয়া মুমিনদেরই দায়িত্ব।

মুসলমানরা এখন দুঃখ করেন এ জন্য, তাদের নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্যই মুসলিমজাতির পতনের কারণ। তারা ব্যাপারটা এভাবে দেখেন না, একদল

আপোষকামী মুসলমানের সাথে সত্যনিষ্ঠ মুসলমানরা মতৈক্যে পৌঁছতে পারছে না বলেই দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পশুপাখি সবই এক বনে বাস করতে পারে। মানুষ একা হলেও পৃথক আবাস চাই। মানুষের মর্যাদার উপযোগী বাসস্থান চাই। অবিশ্বাসী সবাই মিলে একজাত আর মুসলমান একাই একজাত।

নাগকির অধিকার

সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ মনীষী সমাজে বা রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকারের কথা একভাবে বলেছেন; রুশো, ভলতেয়ার আরেকভাবে বলেছেন। কনফুসিয়াসের ছিলো আরেক দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কস এঙ্গেলসের নাগরিক অধিকার ছিলো বুর্জভেন্টের কাছে নাগরিক নির্যাতন। লেনিন-স্ট্যালিনও নাগরিক অধিকারের কথাই বলতেন। চীন রাশিয়াকে দোষারোপ করছে, রাশিয়া চীনকে, পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম ইউরোপ একে অন্যকে ঘৃণা করেছে। কিউবা আমেরিকাকে আর আমেরিকা কিউবাকে দুশমন জেনেছে। সবাই নাগরিক অধিকারের কথা বলছে আবার একে অন্যকে মানবতার দুশমন বলছে।

ছয়শত দশ খৃস্টাব্দের দিকে কুরআনুল কারীম নাযিল হতে শুরু করলে নাগরিক অধিকারের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন হতে লাগলো। একটি নাবালক এতিম শিশু থেকে শুরু করে বিধবা স্ত্রী, নারী-পুরুষ, পুত্র-কন্যা, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, মনিব-ভৃত্য, প্রতিবেশী, স্বজাতি-বিজাতি, ধনী-গরিব, আহত-নিহত এককথায় সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি মানবের অধিকার ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করলো মহান কিতাব কুরআনুল কারীম। দেড় হাজার বছর পূর্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক পৃথিবীতে যেসব মানব অধিকার মুসলিম জনপদগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জগতকে আলোকিত করেছিলো, সেই সব অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে বর্তমান পাশ্চাত্য ও অন্যান্য সভ্যতার সময় লেগেছে শত শত বছর থেকে হাজার হাজার বছরেরও অধিক। ইসলাম প্রাথমিকযুগে সফলতার সাথে যেসব অধিকার মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা করেছে, আজকের সভ্য সমাজ তার কোনো কোনোটি অতিকষ্টে প্রতিষ্ঠা করেছে বিগত শতাব্দী বা তার কিছু আগে। এ যুগের নাগরিক অধিকারও বিশেষ করে নারী অধিকারের প্রবক্তারা আজন্ম-কৃতঘ্ন না হলে ইসলামকে কটাক্ষ করার ধৃষ্টতা কখনো প্রদর্শন করতো না। আমাদের স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে সক্রেটিস থেকে শুরু করে মহামতি লেনিন বা বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সূত্রসমূহ বিস্তারিত লেখা আছে। ছেলেমেয়েরা গভীর আগ্রহে পড়াশুনা করে ভালো ভালো ডিভিশন পাচ্ছে, নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে। ইসলামের প্রতিপক্ষকে তারা তাদের দেবতার আসনে আসীন করেছে, ওদেরকে দেবতার আসনে আসীন করে নিজেরাও দেবতুল্য চরিত্রের অধিকারী

হবার প্রয়াস পাচ্ছে। এই নাগরিক অধিকার অর্জন করার উন্মুক্ত পথেই ধর্মনিরপেক্ষতার সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই পথেই অবিশ্বাসী অধিকারের বাকি যেটুকু আছে, তা অর্জন করতে পারলে বিসর্জনের পালা পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন হয়তো মুসলিম নামটাই সবচেয়ে বেশি বেমানান বলে প্রতীয়মান হবে।

দয়াময় অনেক দয়া করে পশুপাখি না বানিয়ে দুনিয়াতে মানুষ বানিয়ে পাঠিয়েছেন। কোনো অধিকারের বলে কেউ মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। মানুষ হলেই নাগরিক হওয়া যায় না, আইয়্যামে জাহিলিয়াত তার প্রমাণ। দয়াময় একটি দ্বীনের মাধ্যমে নাগরিক অধিকারও দিয়েছেন। মানুষ যদি নিজ অধিকারের বলে মানুষ হয়ে জন্মাতো, তাহলে তার নাগরিক অধিকারের দাবি হয়তো যুক্তিসংগত হতো। পাকিস্তানের *নজিরবিহীন* নেত্রী নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার দোহাই দিয়ে শরিয়াহ আইনের বিরোধিতা করেছেন। আমাদের নাগরিক অধিকারের দাবিদাররা তো আল্লাহর কিতাবের সংশোধনও দাবি করে বসেছে। আল্লাহর আইনকে যারা প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাদেরকে ওরা ঝাড়ে-বংশে নির্বংশ করার কথা প্রকাশ্যেই বলে। মরে গেলে যারা ওদের জানাযা পড়ান, তাদের সাথে জীবনভর দুশমনী করার শপথ নেয়, অথচ এই নবীর ওয়ারিশরাই ওদেরকে জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে রাখতে প্রাণপাত করেন।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশ্ববাসী কম করেনি, আমরাও কম করিনি। কত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, নোবেল বিজয়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করা হলো, কত তন্ত্রকে লাইন ধরে মিছিল করে বিজয়ী করলাম, সবই তো হরিষে বিষাদ। কত দেরি করে আমরা বুঝবো আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিঃস্ব হবার, বঞ্চিত হবার, মজলুম হবার কোনো বিধানই দেননি; বরং আমাদের নাগরিক অধিকারসহ সকল অধিকারের নিশ্চয়তা দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। শুধু অধিকার নয়, আমাদের জন্য ইনসাফ, বিচার, শান্তি ও বিজয়কে পর্যন্ত নিশ্চিত করেছেন তাঁর দ্বীনের ব্যবস্থাপনায়। আল্লাহকে বিশ্বাস করি, এই কথায় যদি আমরা সত্যবাদী হয়ে থাকি, তাহলে আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের জীবনের ব্রত হওয়া উচিত ছিলো। দয়াময়ই দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবাধিকার। এখন যারা মানবাধিকারের নব্য প্রবক্তা হয়েছে, এরা শয়তানের *নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার*কে টিকিয়ে রাখার চুক্তিভিত্তিক গোলাম মাত্র, এটুকু বুঝে নেয়া দুঃসাধ্য কোনো ব্যাপার নয়।

মুসলমান কুরআনকে সংরক্ষণ করার কথা না বলে সংবিধান সংরক্ষণের কথা যখন বলে, ইসলামের পক্ষে থাকার চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ থাকা যখন ন্যায়সঙ্গত মনে করে, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের চেয়ে জনগণের সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে যখন প্রকাশ্য অঙ্গীকার করে, উম্মাহর আদর্শের চেয়ে দলীয়

আদর্শে অধিক ভক্ত হয়ে পড়ে, বিশ্বাসীর চেয়ে অবিশ্বাসীর প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে, নবী জীবন ও সাহাবা সিপাহীদের পুণ্যময় অনুসারী না হয়ে ঈমান বিক্রি করে নিফাকের সওদা করে, তখন তার তসবিহ-নেকাব, দাড়ি-টুপি কোনো কিছুই তাকে আড়াল করতে পারে না। একসময় সে মুসলিম নামেরও কাবিল (যোগ্য) থাকে না। তখন নাগরিক অধিকারের হাজার দোহাই দিয়েও কুরআনের নির্দেশ প্রয়োগ করার কথা বলা হবেই, এজন্য সত্যনিষ্ঠ মুসলমানকে দোষারোপ করলে কোনো লাভ হবে না।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার সংরক্ষণে ইসলাম যে ভারসাম্য বজায় রেখেছে, তার মূল্যায়ন করতে গবেট মুসলমানরাই ব্যর্থ হয়। অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞ বিচারপতিরা যখন জ্ঞানসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদদের সুপরামর্শে তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ সংক্রান্ত মামলার সঠিক রায় প্রদান করেন, তখন নির্বোধদের মাথা দুলানো ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

কাবিলের কিয়াস ও অবিশ্বাস্য উক্তি

কাবিলের জন্য যা হারাম করা হয়েছিলো, সে তা নিজের জন্য হালাল করেছিলো। সে তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে উদ্যত হলে আপন ভাই হাবিলকে সে প্রতিপক্ষ দেখতে পেলো। তাই হাবিলকে হত্যার ঘোষণা দিলো এবং সুযোগমতো তাকে হত্যা করে ফেললো। আপন সিদ্ধান্তই তাকে পাপীর খাতায় প্রথম নামটি লিখতে বাধ্য করলো।

আল্লাহ জাল্লা জালালুহু তেইশ বছর ধরে তার পবিত্র প্রত্যাদেশ প্রিয়নবী মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিল করেছেন। নবীজি হিজরতের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদের উপর দৃঢ়পদ ছিলেন। এমন কোনো সাহাবী ছিলেন না, যিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি। আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো অসিয়ত করে গেছেন, একদল মুজাহিদ কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের পথে অবিচল থাকবে। কিন্তু এখন মুজাহিদকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হচ্ছে, জিহাদকে অপরাধ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং সেই ঘোষণাপত্রে ছাপ ও সই দিয়ে প্রত্যয়ন ও সত্যায়িত করা হয়েছে। আর যারা নবীর ওয়ারিশ ও কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যাতা উলামা ও মাশায়েখ, তারা ঐ সিদ্ধান্তের কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন? কলমের কালি কিয়ামত পর্যন্ত শুকাবে না। আল্লাহ, নবী ও কুরআনের পক্ষে এখন কলম উঠাতে না পারলে কাল মহাবিচারক আল্লাহ তা'আলার সামনে কি কৈফিয়ত দেবে! কেননা, মুজাহিদরা তখন দয়াময়ের কাছে অবশ্যই ফরিয়াদ করবে।

كل من عليها فان
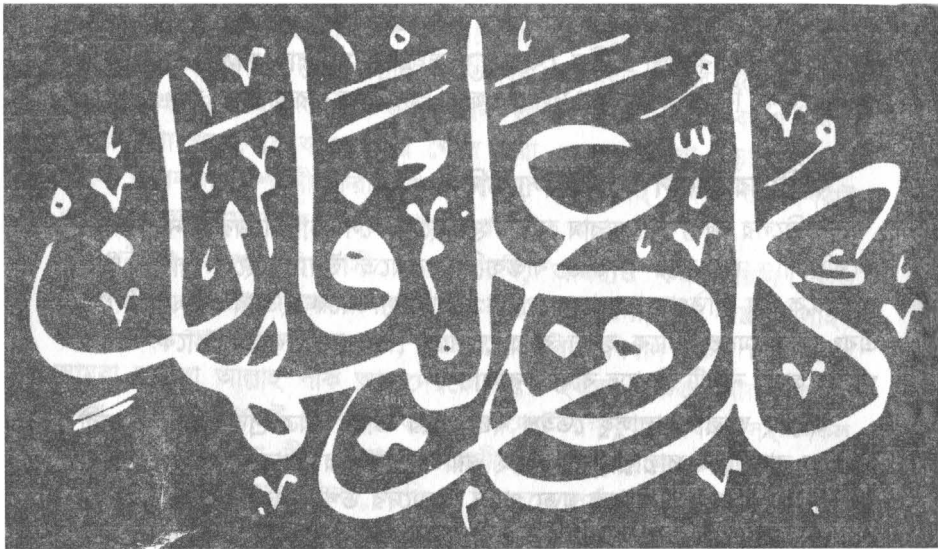
সুযোগ্য পূর্বপুরুষের অকৃতজ্ঞ উত্তরসূরি

আমাদের যারা পূর্বপুরুষ ছিলেন আমরা কি তাদের ধ্যান-ধারণার ফসল? আমাদের পূর্বপুরুষ বলতে আমি আমাদের মুসলমান পূর্বপুরুষের কথাই বলছি। আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের চিন্তা-চেতনাই বা কি ছিলো? কী ছিলো তাদের দুঃখ-বেদনা। কী আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা মনের ভেতর পোষণ করতেন। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কী ছিলো তাদের দাবি? কেমন ছিলো তাদের জীবনযাপন? এসব ভাবনা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা আর জড় পদার্থে পরিণত হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মানুষ তার উৎসকে জানতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। আমাদের উৎস, আমাদের অতীত গৌরবময় ছিলো, সেই গৌরবকে ধরে রাখার দায়িত্ব আমরা জন্মগতভাবেই পেয়েছি। বর্তমানকে নিয়ে সেই হতভাগা সুখি হতে চায়, যার অতীত কলঙ্কিত অথবা যে আত্মবিস্মৃত, কিংবা যে দুর্ভাগা তার বর্তমানকে বিক্রি করে বিক্রিনিষিদ্ধ কোনো হাট-বাজারে।

আমাদের ইতিহাসের পাতায় অতীতের জন্য কোনো সংরক্ষিত জায়গা নেই। পূর্বপুরুষের সংগ্রামমুখর জীবনের কথা ভুলে গিয়ে এখন আমরা এক স্থবির জাতিতে পরিণত হয়েছি। জীবনচলার পথে কোনো প্রেরণা নেই। কারা আমাদের এ পর্যন্ত নিয়ে এলো, কাদের দেখানো পথ ধরে আমরা আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেসব কথা আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে।

তবু একবার চেষ্টা করে দেখি আমাদের হারানো করুণ স্মৃতিকে মনে করতে পারি কিনা। আমরা যাদের উত্তরসূরি তাদের পুন্যস্মৃতি মৃত অন্তরে জাগাতে পারি কিনা? আমাদের নিমকহারাম হৃদয় তাদের স্মৃতিচারণে সামান্য কৃতজ্ঞভাজন হয় কিনা? আত্মভোলা মন পূর্বপুরুষের রক্তের বন্ধনকে ছিন্ন করে বিস্মৃতির অতলে চিরতরে হারিয়ে গেলো কিনা?

গজনবীর পথ ধরে সোমনাথের পথিক কিংবা গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দী কোনো মর্দে মুমিনের কথা, সতেরজন জানবাজ তরুণকে নিয়ে ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খিলজির দেশজয়ের কথা, এমনকি তিনশত ষাটজন দরবেশের তরবারিসহ সুরমা উপত্যকায় অভিযানের কাহিনীসহ ইতিহাসের শত সহস্র ঘটনাবলির কথাও না হয় আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু মাত্র গত শতাব্দীর সামান্য পূর্বে ১৮৫৭ সালের নির্মম ইতিহাসকে আমরা কেমন করে ভুলে যেতে পারি? এমন নিকট অতীতের স্মৃতিকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি যদি বলি, তাহলে নিশ্চিত, আমরা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছি। এটা কিছুতেই সুস্থ মানুষের পরিচয় বহন করে না।

শুধু দিল্লী, লাক্ষ্মৌ বা সীমান্ত প্রদেশ নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রায় প্রতিটি শহরের পথে-ঘাটে হাজার হাজার মর্দে মুজাহিদকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া হলো এ ইতিহাসের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই? ঢাকা শহরের বাহাদুরশাহ পার্কের আমবাগানে কসাইখানার ভেড়া-বকরীর মতো মুসলিম সন্তানদের ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো, তাদের আত্মার সাথে আমাদের কি কোনোই আত্মীয়তা ছিলো না? সে দিনের সে আযাদী আন্দোলনের অনেক ব্যাখ্যাই ইতিহাস দিয়ে থাকে। আমরা তার কোন অর্থকে সংগত মনে করি?

মুসলমানদের আযাদী আর অমুসলিমদের আযাদীর অর্থ এক নয়। ভাত, কাপড় আর স্থানের স্বাধীনতাই মুসলিম জাতির স্বাধীনতা নয়। মুসলমানদের স্বাধীনতা হলো তার দ্বীনের স্বাধীনতা। একমাত্র দ্বীনকে গালিব করার জন্যই মুসলমান জীবন দিয়ে থাকে। দ্বীনকে পদানত রেখে সে হাজার অর্থ-বিত্ত-বাক স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। কোনো ভৌগলিক রাজনৈতিক স্বাধীনতাই তার স্বাধীনতা নয় যদি না আল্লাহর আইন মানুষের আইনকে অতিক্রম করার স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আর তাই আল্লাহর আইনকে জমিনে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মুমিনের আত্মত্যাগকে ইসলাম ভিন্ন দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে।

১৮৫৭ সালের ব্যর্থ আযাদী আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে ঝিলাম থেকে আসাম পর্যন্ত মুসলমানের উপর যে নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা আমাদের কোনো পূর্বপুরুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি; আমাদের দ্বারা সম্ভব হলেও আমাদের উত্তরাধিকারীরা আবার যথারীতি ইতিহাসের এসব ঘটনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসকে

সময়ের বন্ধনীতে আবদ্ধ করে কপটবুদ্ধির পরিচয় না দিয়ে গণচক্ষুকে প্রসারিত করলে নিজেরাই উপকৃত হবো।

শুকরের হারাম চর্বি দিয়ে তৈরি বন্দুকের টোটা মুখ দিয়ে ছিঁড়তে যারা অস্বীকার করেছিলেন, তারা সামান্য বেতনভুক্ত সৈনিকই ছিলেন না। নবীজির পাগড়ী শাসকের দরবারে কুর্ণিশকারী চাপরাশি আর্দালীর মাথায় পড়ানো যারা সহ্য করতে পারেননি, তারা সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তারা কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য শত্রুর মোকাবেলা করেছিলেন এমন ধারণা করা স্বচ্ছ-চিন্তার দৈন্য ছাড়া আর কিছু নয়।

এরা আমাদের পূর্বসূরি ছিলেন ও আমাদের পথপর্দশক ছিলেন আর আমরা কেবলমাত্র একটি পতাকা ও একটি ভূখণ্ডের জন্য যুদ্ধ করেছি একথা যারা বুঝতে চান, তারা মূর্খের চেয়েও অধিক মূর্খ এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কেননা আমাদের জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে যা কিছু আছে, তা শুধু আমাদের দ্বীন। এর আগে যা ছিলো তা-ও আমাদের দ্বীন, এরপর যা কিছু রেখে যাবো তা-ও আমাদের দ্বীন।

ভৌগলিক স্বাধীনতাই যদি একমাত্র কাম্য হতো, তাহলে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবন থেকে আমাদের কিছুই শেখার থাকতো না। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রপথিক ছিলেন। শাসক ইংরেজের সাথে বোঝাপড়া করার জন্য ইংল্যাণ্ড গিয়ে এক ভাই প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, পরাধীন দেশে আর ফিরে আসবেন না। আজন্মলালিত প্রিয় জন্মভূমিতে আর কোনোদিন পা রাখেননি; ইংল্যাণ্ডের মাটিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাওলানা জানতেন অন্যের তাঁবেদারীতে মুসলমানের সত্ত্বার পরাজয় শুধু ঘটে না, তার দ্বীনের পরাজয়ও ঘটে। দ্বীন পরাজিত হলে মুসলমান আর মুসলমান থাকে না। পরাধীন দেশের মুসলমানদের সিপাহসালার শাসক ইংরেজের দেশে জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করতেন না যদি ইংরেজ তাঁর শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হতো ভারতে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের পরাধীনতা মাওলানা ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বীনকে পরাজিত করেছিলো। আর এটা সহ্য করা কষ্টকর হয়ে উঠেছিলো তাঁদের কাছে। আমাদের ইতিহাসের বন্ধনীকে তুলে না দিলে এসব মহৎপ্রাণ মানুষের জীবনের হিসাব-নিকাশ সামান্যই আমরা জানতে পারবো, চোখ বন্ধ রাখতে রাখতে একসময় আলো আমাদের অসহ্য হয়ে উঠবে।

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব আমাদের পিতৃপুরুষদের জীবনের প্রবাহকে এক নতুন খাতে প্রবাহিত করেছিলো। বিশাল ভারতবর্ষের অসংখ্য স্রোতধারা একই প্রবাহে মিলেমিশে সেদিন একাকার হয়ে গিয়েছিলো। অযুত কোটি মুসলমান

যেন এক নবজন্ম লাভ করেছিলো সেদিন। উপমহাদেশের প্রতিটি মুসলিম অঞ্চলের প্রতিনিধিরা সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সম্মেলনের সবচেয়ে গৌরবময় অংশীদারিত্বে ছিলেন এই বাংলাদেশের কৃতি মনীষীরা। শেরেবাংলা এ, কে ফজলুল হক ছিলেন লাহোর প্রস্তাবের প্রাণপুরুষ। সেদিন ভারতের মুসলমানের গৌরব শেরেবাংলা ছিলেন এক অবিসংবাদিত মেধা। লাহোর প্রস্তাবে আমাদের সাহসী ভূমিকা সারা ভারতে আমাদেরকে দিয়েছিলো মর্যাদা, যেভাবে মর্যাদাবান করেছিলেন আমাদেরকে ১৯০৬ সালে নবান স্যার সলিমুল্লাহ। আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত মুসলিম জনতা। সে দিনের সে লাহোর প্রস্তাবের উপর কোনো কলঙ্কের ছাপ ছিলো না। কিন্তু আজ যদি আমরা আমাদের পিতৃপুরুষের মুক্তির সনদকে কটাক্ষ করি, তাহলে দুর্ভাগ্যক্রমে আপন পিতৃপুরুষের রক্তের বন্ধনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, আর কিছু নয়। গৌরবময় অতীতকে ধারণ করার মধ্যে মঙ্গল নিহিত থাকে, অন্যথায় ভবিষ্যতের কাছে আমরা উচ্ছিষ্ট হয়ে যাবো। ইতিহাস সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, মিথ্যা সামান্য কিছু সময়ের জঞ্জাল মাত্র।

লাহোর প্রস্তাবের দিকপালরা ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইতিহাস তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছে, তাঁরাও ইতিহাসকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের চিন্তা-চেতনাকে যদি মূল্যায়ন না করতে পারি; তবে ইতিহাস নিজেই কোনো কোনো সময় খুব নির্মম হয়ে উঠে। আমাদের হটকারিতার কারণে হতে পারে ইতিহাসই আমাদেরকে অবমূল্যায়ন করে বসবে। ইতিহাস তার সম্পদকে ধারণ করেই গৌরবান্বিত হয়। আমরা চোখ বন্ধ করে রাখলেই সবকিছু অন্ধকার হয়ে যাবে না। গঙ্গা-যমুনা-ভাগীরথী-ইরাবতী, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়ে বহু রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। কাবুল থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বহু লাশ গলে-পঁচে মানবতার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিয়েছে।

তারপর জমিনে একটি বৃক্ষরোপন করা সম্ভব হয়েছে, যার নাম লাহোর প্রস্তাব। এটা কোনো বালখিল্যের খামখেয়ালি নয় যে, *আমার ইচ্ছা গালি দেবো, যাকে খুশি তাকে দেবো।* লাহোর প্রস্তাবের পথ ধরেই মুসলমানরা এক দীর্ঘ সঙ্কটময় পথ অতিক্রম করেছে। এ পথে শুধু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান সংগ্রাম করেছে তা নয়। যারা ভারতের এ বিশাল ভূখণ্ডে নিরুপায় হয়ে রয়ে গেছেন তাদের আত্মত্যাগও হৃদয়বিদারক। এ যেন একদল সৈনিক যুদ্ধ করে করে তাদের আত্মজদের সীমান্তের ওপারে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আটকা পড়ে গেলেন। যারা মুক্তি পেলেন তারা পিছনে যারা রয়ে গেলেন তাদের জন্য চোখের জল ফেললেন আর নিজেরা মুক্ত হয়ে হাজার শোকর আদায় করলেন। আমরা তো তাদেরই উত্তরসূরি, কী করে তাদের চিন্তা-

চেতনাকে কলঙ্কিত করতে পারি? তাদের বুকের রক্ত দিয়ে লেখা ইতিহাসের উপর কি করে পানি ঢেলে দিতে পারি?

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি যেমন ছিলেন পুরো আন্দোলনের নেতা, তেমনি ছিলেন সকল নেতার নেতা। স্বতন্ত্র আবাসের জন্য সংগ্রাম করেছেন সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানরা। এ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রতিটি অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ। আমাদের অঞ্চলে ছিলেন হোসেন সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম, মাওলানা ভাসানী, আকরাম খাঁ প্রমুখ ত্যাগীপুরুষ। তাঁরা সবাই ছিলেন জিন্নাহর সহচর। প্রথমজীবনে জিন্নাহ ভারত বিভাগের চিন্তাও করতেন না। কিন্তু নেতা তো জনতারই কাণ্ডারি। জনতার প্রাণেরস্পন্দন যিনি অনুভব করতে পারেন, সে আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তাবায়িত করতে যিনি বিশ্বস্ত হতে পারেন তিনি নেতা হবেন, এ ঐতিহাসিক ভূমিকাই শুধু জিন্নাহ পালন করে গেছেন। ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী নায়ক তাঁকে হতে হয়েছে। ভারতের মুসলমানদের যুগ যুগ ধরে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটাতে, বহু প্রজন্মের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে, গোলামির জিঞ্জির থেকে অপরাজেয় মুসলিমজাতিকে মুক্ত করতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো চরিত্র সেদিনের রাজনীতির শেষ অংকে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে এটাই ছিলো স্বাভাবিক। কেননা সেদিনের ভারতবাসী মুসলমানগণ যারা ছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষ তারা তঁদের মহান পিতৃপুরুষদের পথ ধরে রাজনীতির যে অঙ্গনে অবস্থান করছিলেন সেখানে তাদের মতো মহান জাতির জন্য এক মহান নেতারই প্রয়োজন ছিলো। তারা যেমন জিন্নাহর মতো নেতার যোগ্য সহযাত্রী ছিলেন, জিন্নাহও তেমনি তাদের মতো দূরদর্শী জাতির বিশ্বস্ত নেতা ছিলেন। আজ আমরা জিন্নাহকে নিয়ে কটূক্তি করি, জিন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী আমাদের পিতৃপুরুষদেরকেও আক্রান্ত করি। আমাদের পিতা-মাতার দুর্ভাগ্য, তারা আমাদের মতো হতভাগাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

জিন্নাহ নিজেই বলেছেন, পোকায় খাওয়া একটি পাকিস্তান আমি পেয়েছি। জিন্নাহর জন্য হয়তো এটা আফসোসের ব্যাপারই ছিলো। কিন্তু যারা পাকিস্তান অর্জন করেছিলেন তাদের কাছে সেটাই ছিলো পরম পাওয়া। আর সেজন্যই বন্যার স্রোতের মতো মানুষ আপন ঘরবাড়ি ত্যাগ করে পাকিস্তান সীমান্তে প্রবেশ করতে শুরু করেছিলো। আমাদের এ পূর্বপ্রান্তে যা ঘটেছিলো, তা যারা দেখেছেন তারা হয়তো এখন আর বেঁচে নেই। তবে তাদের বংশধররা যদি একান্তই আত্মভোলা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্বপুরুষের সামান্য স্মৃতিচারণই তাদেরকে মনে করিয়ে দেবে সেদিনের পটপরিবর্তনের কার্যকারণ কি ছিলো। কত ভাগ্যবান ঘরে বসে পাকিস্তান পেয়ে গেলেন। ঘরে বসেই তারা দেখতে পেলেন বৃটিশ ও

ভারতের সূর্য অস্তমিত হচ্ছে। পরদিন ঘরের দাওয়ায় বসে দেখতে পেলেন, একটি মুসলিমদেশের সূর্য তাদের পূর্বদিগন্তে উদিত হয়েছে। এ ভাগ্যবানরা হয়তো সুখের সাগরে হাবুডুবু খেতে পারেননি, তাদের আশার আলো হয়তো বারবার নিভে গেছে। হয়তো মেঘে মেঘে দিনান্তে পৌঁছে গেছেন সবাই। তা সত্ত্বেও কোনো গ্লানি, কোনো বিষাদ নিয়ে তাঁরা দুনিয়া থেকে চলে যাননি। দুঃখ-কষ্টে যতোদিন বেঁচে ছিলেন ততোদিন মসজিদের মিনারের দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়েছেন। আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে আযানের ধ্বনি যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তখন গভীর আবেগে তা শ্রবণ করেছেন। মসজিদ-মাদরাসায় কুরআনের সুললিত পাঠকে কান পেতে শুনেছেন। দূর থেকে একজন আরেকজনকে সালাম করেছেন, ঈদের আনন্দে কোলাকুলি করেছেন, কুরবানীর দিনে শোকরগুজারির দোয়া করেছেন, ইজ্জত-আব্রু, তাহজীব-তমদ্দুন ও ঈমান-আকিদার হেফাজত করেছেন, সুন্নতের পাবন্দী করেছেন, হীনমন্যতার মুখে লাথি মেরে মুজাহিদের জিন্দেগী যাপন করেছেন, জিহাদের তামান্না নিয়ে জীবন শুরু করেছেন আর তাই মুমিনের আবাদী জমিনে সমাহিত হতে পেরেছিলেন।

আমাদের তেইশ বৎসরের পাকিস্তানী জীবন। শুধুই কি হা-হুতাসের জীবন? শুধুই কি বঞ্চনার জীবন? আমাদের পিতামাতার বসতবাটি আবাদের জীবন, দ্বীনের পথে অবাধ বিচরণ, সংসারের প্রতিটি মুখে অন্ন দিতে পারার সফল জীবন, একে আমরা কেমন করে মিথ্যা বলতে পারি? কেমন করে নিরর্থক বলতে পারি? হতে পারে তার অনেক মন্দ দিক ছিলো? তবু তো এটাই ছিলো আমাদের পিতৃপুরুষের আজন্মলালিত স্বপ্ন। তাঁদের কাঙ্খিত জীবন। সেই সোনালী দিনগুলোকে তারা ছিনিয়ে এনেছিলেন পাশবিক অন্ধকার থেকে, দানবের করালগ্রাস থেকে। তাদের জন্ম জন্মান্তরের শত্রুকে পরাজিত করে তারা আপন বসতি নির্মাণ করেছিলেন, আমরা তাদের ঘরে আগুন দেবার কে? আমরা কি তাঁদের উত্তরাধিকারী নই?

পাকিস্তানের তেইশ বছরকে যারা অভিশপ্ত সময় বলে ইঙ্গিত করেন, তারা নিজের সাথে প্রবঞ্চনা করেন। আজ যাদের নিয়ে আমরা অহঙ্কার করার চেষ্টা করছি তারা বরং পাকিস্তান আমলেই কীর্তিমান ছিলেন। ইতিহাস যদি তাদেরকে সম্মান করে তাহলে সে কালের জন্যই করবে, পরবর্তীকালের জন্য তাদেরকে ধরে রাখতে ইতিহাস হয়তো দ্বিধা করবে। আজকের প্রজন্ম পাকিস্তান দেখেনি, যেটুকু শুনেছে তাও সব চেপে যাওয়া কাহিনী। পাকিস্তানের একেবারে শেষদিকের কথা।

কক্সবাজারের এক কীর্তিমান পুরুষ পাকিস্তান কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য মাওলানা ফরিদ আহমদ। ক্ষণজন্মা প্রতিভা, অনলবর্ষী বক্তা, বাঙালি জাতির স্বাধিকার অর্জনে আপোষহীন নেতা। সুদূর ইসলামাবাদ থেকে রওয়ানা হয়েছেন

নিজ শহর কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে। তখনকার দিনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে অনেক নামী-দামী জননেতা ও বহু বিদেশি মেহমানকে কক্সবাজার আসতে যেতে দেখেছি। কিন্তু মাওলানা ফরিদ আহমদের আগমনকে কেন্দ্র করে মানুষের এমন চাঞ্চল্য দেখে আমি অবাক হয়েছি। অথচ ঘরের সন্তান ঘরে আসছেন এবং আসতে এখনো অনেক বাকি। সময় যতো ঘনিয়ে আসে মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা ততোই বাড়ছে। একটি লম্বা পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি পরে যখন বিমান থেকে অবতরণ করলেন তখন যেন মানুষের ঢল নেমেছে সমস্ত বিমানবন্দর জুড়ে। মাটি ও মানুষের কত কাছাকাছি থাকলে এমনটি সম্ভব হতে পারে!

যারা পাকিস্তান পেয়েছিলেন তারা মাওলানা ফরিদ আহমদকে পেয়ে পিতৃগৌরব অনুভব করতেন। তাদের সন্তানরা ফরিদ আহমদকে হারিয়ে যদি অশ্রুসজল হয় তাহলে সেটা তাদের পিতৃভক্তির পরিচয় দেবে। মাওলানা ফরিদ আহমদ ছিলেন জ্ঞানের এক সমুদ্র। তাকে মূল্যায়ন করার জন্য জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন হবে। যার চিন্তার গভীরতা নেই, দ্বীনের জন্য দরদ নেই, মাওলানা ফরিদ আহমদের জন্য তার কোনো আফসোসও নেই।

শেখ মজিবুর রহমান তখন ময়মনসিংহ জেলে অন্তরীণ। আমরা তাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি। হঠাৎ শুনলাম তাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে আনা হয়েছে। আদালতে মোকাদ্দমা উঠবে, তাঁকে হাজির করা হবে। যথারীতি সদলবলে সবাই উপস্থিত হলাম। সিংহের মত সাহসী নেতাকে দেখার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে আছি। কোর্ট বসলো। তিনি এলেন, সাথে তার বিশ্বস্ত আইনজীবী শাহ আজিজুর রহমান। জামিনের জন্য আবেদন জানালেন। জামিনের এমন আবেদন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জীবনে যতোবার বঙ্গবন্ধুর চেহারা মনে ভেসে উঠেছে ততোবার তার পাশাপাশি শাহ আজিজের চেহারাটাও ভেসে উঠেছে। জামিন মঞ্জুর হয়নি, বঙ্গবন্ধু নিজের কথা ভুলে গিয়ে বারবার শাহ সাহেবকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এ দৃশ্য অভূতপূর্ব। দেশ নির্মাণ করার জন্য শাহ আজিজুর রহমান যদি কিছু করে থাকেন, তাহলে ইতিহাস তা লিখবে। তবে ইতিহাসের নায়ক বঙ্গবন্ধুকে নির্মাণ করার জন্য শাহ আজিজ যা কিছু করেছেন, তা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যারা ইতিহাস রচনা করবেন তাদের লিখায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

আমাদের এ জমিনে স্বাধীনতার পটপরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কখনো অনেক এগিয়ে গেছে, আবার একেবারে পিছিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা এর হেতু খুঁজে পাইনি? চিহ্নিত করতে পারিনি কে আমাদের শত্রু, কে আমাদের মিত্র? গলদটা আসলে কোথায়?

এ সমাধান দিয়েছেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে তিনি বলেছেন, *তোমাদের মধ্যে একদল লোক আছে তারা*

ফাসেক। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে আর আল্লাহ তাদেরকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করে দিয়েছেন, তারা আত্মবিস্মৃত হয়ে গেছে।

আল্লাহ তা'আলাকে তারাই ভুলে বসে আছে, যারা আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করছে, আল্লাহর আইনকে কিতাবে বন্দী করে রেখেছে। আল্লাহকে মানে তবে আল্লাহর আইন মানে না। আল্লাহকে মানে কিন্তু আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে রাজি হয় না। আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করার চিন্তা মনে স্থান দেয় না। এ ফাসেকরা স্বভাবতই নিজেদেরকে শাস্তির উপযুক্ত করে নিয়েছে। সে শাস্তি হলো নিজের সত্ত্বাকে ভুলে যাওয়া।

আল্লাহ পাক মুসলমান জাতিকে এক মহান দায়িত্ব দিয়েছেন। মুসলমান বিশ্বমানবকে তার সৃষ্টিকর্তার দিকে নিয়ে আসবে, শাশ্বত দ্বীনের উপর নিয়ে আসবে। নিজেও সে সত্য দ্বীনের উপর কায়েম থাকবে। আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজেই ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে পড়বে না, বিপথগামী স্রোতে বিলীন হয়ে যাবে না, সর্বনাশা পরিণতির দিকে ধাবিত হবে না।

গত প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে আমাদের জাতি এক অস্থিরতায় ভুগছে। অস্থিরতার চেয়ে বেশি বিভ্রান্তি। মনে হয় এটাও এক ধরনের শাস্তি। কেননা আল্লাহর দ্বীনকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি তামাশা এ জনপদেই সংঘটিত হচ্ছে। যা ইসলাম নয় তাকে বলছি ইসলাম। ভণ্ড আর মুনাফিকের দল এখানে সবার আগের কাতারে উপস্থিত। ঈমান আর শিরক এখানে রাখিবন্ধন করেছে। মানবধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলিম অমুসলিম বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হারাম সন্তান জন্ম দিচ্ছে। মুসলমানের লেবাস ও সুন্নতকে নিয়ে শয়তানি নাটক করে আর অমুসলিম বেশ ধরে মুসলমানের সন্তান আহ্লাদে আটখানা হয়। মুসলমানের পরাজয় হলে উল্লাসে ফেটে পড়ে। দ্বিজাতিতত্ত্বকে ভুল বলে নিজের পিতৃপুরুষকে গালি দেয় এবং মুসলমান হওয়ার জন্য আফসোস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এ উল্টোরথে যারা সওয়ার হয়েছে, তারা কোথায় যাবে সে তো জানা কথা, কিন্তু এ রথযাত্রাকে দেখার ভান করে যারা এর পিছনে পিছনে এক পা দু'পা করে এগিয়ে যাচ্ছেন তারা কি বেলা ডুবার আগে ঘরে ফিরতে পারবেন? নাকি পথেই অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন কোথাও?

সহনশীলতা, সহমর্মিতা এসব ভালো গুণ। কিন্তু সত্যের উপর মিথ্যার প্রশ্রয় দেয়া অথবা সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয়। মিথ্যার জাল ছিন্ন করেই আমাদের পূর্বপুরুষ সত্যকে আলিঙ্গন করেছিলেন। সেই সত্যকে লালন করতে গিয়ে বহু কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, আমাদের জন্য নিরাপদ বসতি কামনায় বারবার অপরিণামদর্শী আত্মবিকৃত প্রবণতার বিরোধিতা করেছেন। অথচ আমরা আজ এক নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠেছি। আমাদের দ্বীনের পবিত্র অঙ্গনে

দ্বীনহীনদেরকে গলায় মালা পরিয়ে আহ্বান করেছি। এখন ধর্মনিরপেক্ষতার মোহন বাঁশি স্বভাবতই আমাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে এরপর লখিন্দরের ঘুম ভাঙবে নাকি চিরনিদ্রাই বিধিলিপি হবে তা ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা আল্লাহ্ পাকই জানেন।

প্রত্যেকে তার কর্মফল নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হবে এবং এ কর্মফল নিয়ে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাজির হবে।

ধ্যানমগ্ন হয়ে, ঘর থেকে মসজিদ পর্যন্ত যাতায়াত করে নিজের মনকে বুঝ দেয়া যাবে, কিন্তু দ্বীনের উপর যে মুসিবত নেমে এসেছে তার মোকাবেলা না করলে নিজের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যাবে, তখন কোনো অজুহাত কাজে আসবে না। এখন আর আমর বিল মা'রুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের কাফেলাকে পায়ের পাতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চলার তালিম দেয়া ঠিক হবে না।

আমাদের পিতা-মাতারা কবরে শুয়ে আছেন। আমরা তাদের প্রার্থনার ফসল। তাদের অভিশাপ আমাদের কাম্য নয়। চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইলের এই ভূখণ্ডে মূলত মুসলমানেরই বসবাস। প্রতিদিন পাঁচবার আযানের ধ্বনি এখানকার বার কোটি মানুষের কানে পৌঁছে দেয়া হয়। আল্লাহর দ্বীনকে এ জমিনে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করার নিরলস প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত আছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসিয়ত অনুযায়ী একদল মুমিন-মুজাহিদ এখনো এ দ্বীনের অতন্দ্রপ্রহরী। ঝড়-ঝঞ্ঝা আসবে না এমন নয়।

ব্রহ্মদেশের মগরা প্রায়ই সীমান্তে উৎপাত করতো। একবার খুব বাড়াবাড়ি করলো। রাষ্ট্রপতি জিয়া পেছন ফিরে শুধু বললেন, তোরা কে রে? ব্যস, এতোটুকুই যথেষ্ট ছিলো। আরাকানের মগরা এখনো মুসলমানকে জ্বালাতন করে। মুজাহিদরা সঙ্গত কারণে ওদের পথে-ঘাটে চলাচল করে। জনশ্রুতি আছে, যে পথ মুজাহিদরা একবার অতিক্রম করে সে পথে ওদের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীও চলাফেরা করে না। এটা মুজাহিদের কোনো কারামতি নয়, এ শক্তি আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর দেয়া প্রতিশ্রুতি। শুধু সীমান্ত নয়, মুজাহিদের জন্য ঘরবাহির কোনোটাই অরক্ষিত নয়। মুসলমানদের নিরাপত্তা, বসতবাড়ি, জায়গা-জমি সীমান্তরেখার নিরাপত্তা, এসব মুজাহিদের পবিত্র আমানত। মুজাহিদরা তাদের পূর্বপুরুষের নিমকহালাল উত্তরাধিকারী।

মুজাহিদের তরবারি সর্বদা কোষমুক্ত থাকুক এই কামনা যেন আমরা করি। কেননা আমাদের পিতা-মাতাদের পবিত্র আত্মা শান্তিতে থাকুক এই প্রার্থনা তো আমরা সর্বান্তকরণেই করি।

وهو على كل شيء قدير
www.FreelanceWebDesigner.me
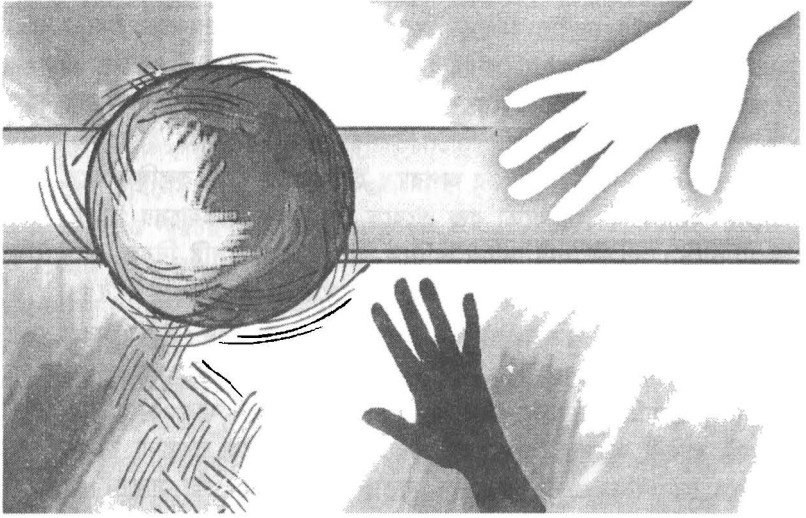
একই কাফেলার ভিন্ন যাত্রী

মানবজাতির মঙ্গলের জন্য মহান প্রতিপালক কুরআন নাযিল করেছেন। যারা কুরআনকে ধারণ করেছে, তারা মুসলমান হয়েছে। যারা কুরআনের বিরোধিতা করেছে, তারা কাফির হয়েছে। কুরআন সত্য ও মিথ্যাকে প্রকাশ করে দিয়েছে বলেই সত্যের সাথে মিথ্যার সংঘাত শুরু হয়েছে। মুসলমান ও কাফিরের সংঘাত হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার সংঘাতের কারণে। সত্য আর মিথ্যা সহাবস্থান করতে পারে না, বরং সত্যের পথ থেকে মিথ্যাকে সরে যেতে হয়। তবে সহজেই মিথ্যা পথ ছেড়ে দেয় না। তাই মুসলমান ও তার প্রতিপক্ষ কাফির পরস্পরকে মোকাবেলা করবে এটাই বিশ্ববিধাতার অলঙ্ঘনীয় ফয়সালা।

ইসলামের উষালগ্ন থেকে শুরু করে আজ অবধি কুফরকে মিটিয়ে দেবার প্রয়াস চলছে। কখনও অত্যন্ত কঠোর মোকাবেলায়; কখনও মুসলমান বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে; কখনও মুসলমান নিঃষেশ হবার আশঙ্কাজনক অবস্থায় পড়েছে। লড়াই কখনও থামেনি। মোকাবেলা ছিলো এবং আছে।

সপ্তম শতাব্দীর সঙ্ঘাতময় দিনগুলোতে মুসলমান যে প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করেছে, আজও প্রতিপক্ষ হয়ে তারাই আছে। সেদিন যার নাম ইসলাম ছিলো আজও তারই নাম ইসলাম। সেদিন যা কুফুর ছিলো আজও তা-ই কুফুর। তবে

সেদিন আরেকটি শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিলো অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে, যারা অত্যন্ত ভয়াবহ। এই উল্লেখযোগ্য শ্রেণীটির নাম ছিলো মুনাফিক। ইতিহাসের প্রবাহমান ধারায় ইসলাম ও কুফরের সংঘাতে বিশেষ এই ধারাটিও সমান্তরাল ধারায় বহমান ছিলো। প্রতিটি বাঁকে প্রতিটি কালে এদের অস্তিত্ব যথারীতি ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছে। এদের ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর অপরাধে ইতিহাসের পাতা কলঙ্কিত হয়ে আছে। এদের বিছানো কাঁটায় যতো রক্ত ঝরেছে, তার দাগ ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত হয়ে আছে। সন্ধানী দৃষ্টি তাকে এড়িয়ে যায় না, বরং দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেসব পাপের পরিণতি কিভাবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছে তারও সন্ধান করে।

মদীনার উত্তরে অতন্দ্রপ্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে ওহুদ। ইসলামের আলোকে চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দিতে দীর্ঘ প্রায় পাঁচশত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বিশাল শত্রুবাহিনী ওহুদের পাদদেশে উপস্থিত হয়েছে। মাত্র একহাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তাদের মোকাবেলা করতে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। সাথে তাদের সেনাপতি ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে ওহুদ। যাত্রার শুরুতে সংখ্যা ছিলো একহাজার। ওহুদে পৌছলেন সাতশ'। মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে তিনশ' বাদ, কি আজব কথা! ওহুদের কঠিন যুদ্ধের কাহিনী যেমন অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়বিদারক, তেমনি সামান্য কিছু পায়ে হাঁটা পথ অতিক্রমকালে কাফেলার এক তৃতীয়াংশ সহযাত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাও ইতিহাসের এক অতিউল্লেখযোগ্য ও নিষ্ঠুর শিক্ষা।

সে থেকে শুরু হলো মুসলমানের কাফেলার সাথে আর একদল পথিকের পথচলা। যারা সুযোগ পেলেই পথে হারিয়ে যায় অথবা পথেই মুসলমানের পিঠে অতর্কিতে ছুরি বসিয়ে দেয়। এদের প্রকাশ্য পরিচয় এরা মুসলমান। মুসলমানের প্রত্যক্ষ সব কাজেই তারা অংশীদার। এমনকি জিহাদেও। আব্দুল্লাহ বিন উবাই স্বয়ং নবীর সাথে জিহাদের কাফেলায় শরীক ছিলো। মসজিদে নববীতে এসে নামাজ পড়তে কষ্ট হয় এ অজুহাতে একটি নতুন মসজিদ পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছিলো দুরাচাররা। মদীনায় ফিরে এসে নবীজী মসজিদটিকে ভেঙে ফেললেন। এরা জিহাদে শরীক ছিলো, নামাযে শরীক ছিলো, অথচ এদেরই জানাযা পড়তে নিষেধ করেছেন আল্লাহ তা'আলা। কেননা এদের পরিচয় একেবারে অজানা ছিলো না। এদের দীর্ঘতালিকা যথার্থই মওজুদ ছিলো নবীজীর কাছে।

প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক রা. খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে যেসব কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার একটি ছিলো মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের মোকাবেলা। এ ভণ্ড একটি যুদ্ধে কুরআনের সাতশ' হাফেজকে শহীদ করেছিলো!

দ্বিতীয় খলিফা ওমর রা. কোনো সাহাবীর জানাযায় যেতে খোঁজ নিয়ে জানতেন হযরত হোজাইফা রা. সেই জানাযায় শরিক হয়েছেন কিনা? যদি

জানতেন তিনি আসেননি, তাহলে খলিফা নানা অজুহাতে সে জানাযায় অনুপস্থিত থাকতেন। কেননা তাঁর জানা ছিলো, হোজাইফা নবীজীর গোপন তথ্য জানতেন এবং সে সঙ্গে মুনাফিকদের তালিকায় কাদের নাম তা-ও তিনি অবগত ছিলেন।

তৃতীয় খলিফার ভাগ্যে যা ঘটেছিলো এবং তার পুত্র-পুত্রাদি, পরিবার-পরিজনের জীবনের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী সেই একই গোষ্ঠী, একই শ্রেণী। অথচ তাদেরও পরিচয় ছিলো তারা মুসলমান।

তখন ছিলো ইসলামের স্বর্ণযুগ। মুসলমানরা ছিলেন সোনার মানুষ। তখনও তাদের সাথে ছিলো মুনাফিক। এ অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি কোনোদিন। কালেরস্রোত বেয়ে এ একই ধারা প্রবাহিত হয়ে চলছে যুগ যুগ ধরে। যেখানে মুসলমান সেখানে তার প্রতিপক্ষ কাফের আর স্বপক্ষে একদল মুনাফিক। মুসলমানের এ দ্বিতীয় শ্রেণীটির নানা পরিচয় ইতিহাস দিয়েছে।

খৃষ্টানদের একত্ববাদকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদি সেন্ট পল সাধু বেশে যিশুর ধর্মে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর নীরবে কাজ সারলেন। একদিন যিশুকে ছাড়িয়ে নিজেই হয়ে উঠলেন খৃষ্টধর্মের নিয়ন্তা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বহু অসাধারণ ও কালজয়ী প্রতিভাধর হাদীসবেত্তার আবির্ভাব ঘটেছিলো। এদের নিরলস সাধনা ও পরিশ্রমের বিনিময়ে হাদীস ও জ্ঞানের ভাণ্ডার সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। সন্দেহ থেকে সঠিক তথ্য উদঘাটিত হয়ে সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু বিভ্রান্তির বেড়াজাল তৈরি করার প্রয়াস তখনও ছিলো। ইসলামের ইতিহাস রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন বহু অমুসলিম লেখক। তাদের লেখায় তত্ত্ব ও তথ্যের পাশে বিদ্বেষটুকুও যথারীতি বিদ্যমান ছিলো। এদের প্রশস্তি গেয়ে কলম ধরলেন মুসলিম নামের আরেকদল মনীষী। শত্রুর জন্য আশ্রয় আর প্রশ্রয় হলো যুদ্ধজয়ের হাতিয়ার। মুসলিম শিবির থেকে চিরকাল এসব হাতিয়ার নীরবে পাচার হয়েছে শত্রুশিবিরে।

ইরশাদ হয়েছে, *'বলুন, যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর ঢিল দেবেন যতোক্ষণ না তারা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করবে, তা শাস্তি হোক অথবা কেয়ামত হোক। অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল।'* (সূরা মরিয়ম-৭৫)

ক্রুসেডের যুদ্ধে মুসলমানদের নিয়তি শুধুমাত্র ক্রুসেডারদের বেঈমানিকে দায়ী করেনি, আরও কিছু প্রচ্ছন্ন কারণও বিদ্যমান ছিলো। উসমানি খিলাফতের পতন কামাল আতাতুর্ক একাই করেনি। আতাতুর্ক ইসলামের ইতিহাসে এতো বড় বেঈমানের আসন অলঙ্কৃত করতে পারতো না যদি একদল মুনাফিক খিলাফতের শিকড়কে মাটির গভীর থেকে কৌশলে কেটে না রাখতো। আতাতুর্ককে নিয়ে মাতামাতি এ দেশেও কম হয়নি। নজরুল তো একটি দীর্ঘ

কবিতাই লিখে ফেলেছিলেন। এখনও আতাতুর্কের মানসসন্তানরা এদেশে এসে খানিকটা খায়-খাতির নিয়ে যায়। কোনো কোনো বেতনভুক কলম এখনও আতাতুর্কের জন্য কালি ঝরায়। কিন্তু আল্লাহ পাকের সে ঘোষণা তো রইলো *অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল।* সময় ফুরিয়ে যায়নি। কোনটা শুরু আর কোনটা শেষ সেটা অনুভব করার জন্য সময়ের প্রয়োজন। তুরস্কের যে অধ্যায় আতাতুর্কের বিপ্লব দিয়ে শুরু হয়েছিলো তার শেষ কি দিয়ে হবে তা অনুমান করতে পারবে হাবিলের কাক।

ষড়যন্ত্রের জালে পা আটকে যাওয়া এ যেন মুসলমানের চিরকালের নিয়তি। অতীতের অনেক ইতিহাস তো আছেই, এমনকি সেদিনের কাশিমবাজার কুঠিতে যে ষড়যন্ত্রের জাল তৈরি করা হয়েছিলো, সে জালে একটি জাতি শেষ পর্যন্ত আটকা পড়ে গেলো। বাংলার মুসলমান নবাবকে সঙ্গত কারণেই জগৎশেঠ, উমিচাঁদ ও রায়দুর্লভরা মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু মীর জাফর আলী খান ও ঘষেটি বেগমরা যদি ওদের সাথে হাত না মিলাতো, তাহলে সিরাজের তরবারি এদেশ শাসন করার জন্য কখনও ব্যর্থ হতো না, তার দেশপ্রেমই সেকথা প্রমাণ করে। ভগবানগোলায় মীরন দাঁড়িয়েছিলো নবাবকে ধরার জন্য, এ দৃশ্য ইতিহাসের বহু পুরাতন একটি চিত্র। মীরনরা এভাবে বহু সিরাজকে ধরিয়ে দিয়েছে। মুসলমানের ইতিহাসে অগণিত মুজাহিদকে কোনো এক ভগবানগোলায় মীরনরা ধরিয়ে দিয়েছে, এসব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

১৮৫৭ সালের প্রতিরোধ ও আযাদী সংগ্রামকে ইতিহাসে নানা নামে অঙ্কিত করা হয়েছে। ভারতের জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদদের ঐতিহাসিক সংগ্রামকে মুসলমান ঐতিহাসিকরাও যথার্থ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অমুসলিমরা একে সিপাহী বিদ্রোহ, সিপাহী বিপ্লব ইত্যাদি নানা নামে আখ্যায়িত করেছে।

সিপাহীরা জনগণেরই অংশ। যখন জনগণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তখন সিপাহীরাও সঙ্গত কারণে তাতে অংশীদার হয়। কখনও সূচনায়, কখনও পরবর্তী সময়ে। তারা মূলত অস্ত্রধারী তাই প্রথম মোকাবেলায় তাদের হাতে শত্রুনিধন হয় উল্লেখযোগ্য হারে। তাই বলে ঘটনার নায়ক তারাই হবে সেটা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা চিন্তাও করেন না। ঘটনার সূত্রপাত ও পরিণতি সব মিলিয়েই ইতিহাস।

১৮৫৭ সালের সংগ্রামে পরাজিত হয়েছিলেন মুসলমানরা। ফাঁসিতে জীবন দিয়েছিলেন শত সহস্র বীর মুজাহিদ। দুশমন ইংরেজ ও তাদের সেবাদাসরা ইতিহাসের পাতা থেকে মুজাহিদের নাম মুছে দিতে কম মাথা খাটায়নি। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকরাও কি ১৮৫৭ সালের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করতে তাদের মন-মস্তিষ্ককে স্বচ্ছ রাখতে পেরেছিলেন? সবেমাত্র পাকিস্তানের জন্ম হবার পরই

কেবল সত্যকে সত্য বলে প্রকাশ করার তাগিদটুকু কেউ কেউ অনুভব করলেন। একবার আত্মঘাতী হলে পরে তার ঋণ শোধ করতে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়। কেননা একবার মিথ্যাকে শিকড় গাড়তে দিলে অচিরেই তা বংশবিস্তারে লিপ্ত হয়ে যায়।

দীর্ঘ এক রক্তাক্ত প্রান্তর পার হয়ে ভারতবর্ষের মুসলমানরা স্বাধীন আবাস নির্মাণ করলেন। কালেমার পরিবেশে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে মাটির বন্ধন ছিন্ন করে বহু পথ পাড়ি দিয়ে নতুন বসতিতে প্রবেশ করলেন। যারা অসহায় অক্ষম তারা রয়ে গেলেন আপন বসতভিটায়। সঙ্গত কারণেই বিপদ এবং আপদ তাদের মাথার উপর সঙ্গীন হয়ে থাকলো, এটা তাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাদেরকে মুসিবত থেকে উত্তরণের পথ না দেখিয়ে অনেকে আপোস রফার জিম্মাদার হয়ে গেলেন। আপোষের সে বিষফল খেয়ে আজ ভারতের মুসলমানরা ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের রাহবাররা খুব কামিয়াব হয়েছেন মনে করে ইদানিং আমাদের এ জনপদেও নসিহতের ডালি নিয়ে দীর্ঘ সফরে আসেন। এ প্রজন্মের অবুঝ সাগরেদরা তাদেরকে ইস্তেকবাল করে ধন্য হয়ে যান। ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ এমনকি আলিমরা পর্যন্ত যখন গলদঘর্ম হচ্ছেন এ সিদ্ধান্ত নিতে, হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপিকে তারা জয়ী করবেন, তখন তারা আমাদেরকে কি নসিহত করতে এখানে আসেন, সেটা শুধু হাবিলের কাকই বুঝতে পারবে। কেননা আমরাও আজকাল খুব বেশি অবুঝ হয়ে গেছি।

মাওলানা আযাদ পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করে কংগ্রেসের যে উপকার করেছিলেন, ভারত তার পুরস্কার তাঁকে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। ফলে তিনিই হলেন স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের শিক্ষামন্ত্রী। মাওলানা মুসলমানদের কাছে মশহুর হয়েছিলেন কুরআনের তরজমা-তফসির লেখার কারণে। একই কলম মহান আল্লাহর পবিত্র কালামের তফসির লিখলো, পবিত্র সে আয়াতের তরজমা লিখলো, যেখানে আল্লাহপাক বলেছেন, *নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম* আবার সেই কলমই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সনদে অনায়াসে স্বাক্ষর করলো। প্রতিভার কী নিদারুণ সংঘর্ষ! কী নিষ্ঠুর আত্মঘাতী পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত! দুর্ভাগ্যজনক আত্মপ্রবঞ্চনা!

জওহরলাল নেহেরু যে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখতেন, তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। পণ্ডিতজী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন তার প্রমাণ আমরা প্রতিদিনই পাই। মুসলমানের সমান্তরাল শক্তিটিকে নেহেরুজী অযথাই সম্মান করেননি। তার আশাবাদ ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়নি। তবে সমসাময়িক একজনের কাছেই কেবল অসাধারণ প্রতিভাধর পণ্ডিত নেহেরুর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য পরাজিত হয়েছিলো, তার নাম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। আমরা সে জিন্নাহকে প্রাণভরে গালি দেই!

আল্লাহ্ পাকের মনোনীত দ্বীন মাত্র একটি, তার নাম ইসলাম। এ দ্বীনের অনুসারীর নাম মুসলমান। যে মুসলমান মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ও তার প্রত্যাখ্যাত দ্বীনকে সমানভাবে, সমমর্যাদার ভাবে তারা ইসলাম ও মুসলমান কোনোটাতেই সম্পৃক্ত নয়। তাদের পরিচয় যাই হোক তাদের অবস্থান মুসলিম জনপদেই হোক কিংবা অমুসলিম পরিবারেই হোক, তারা ঘরে থেকেও বাইরের বাসিন্দা; অন্য ভুবনের বাসিন্দা। মুসলমান নামধারী বারো কোটি অধিবাসীর ভেতর কতজন সে আরেক ভুবনের বাসিন্দা? কম নাকি বেশি? অবিশ্বাস্য রকমের বেশি? একবার হাফেজ্জী হুজুর রহ. বলেছিলেন, দেশের এক নম্বর লোকই মুনাফিক! এমন সত্য ভাষণে ক'জনের সাহস হবে?

সামান্য সুযোগে দ্বীনের শিক্ষাব্যবস্থাকে যারা সংকুচিত করে গেলেন, তাদের প্রতি মানুষের অভিশাপই যথেষ্ট হতে পারে না। শুধু বর্তমান নয়, অনাগত ভবিষ্যতের বিচারও তাদেরকে ক্ষমা করে দেবে না। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির যে আঁধারের অমানিশা নেমে আসছে, দ্বীনের যে আলো এতোদিন মিটিমিটি জ্বলছিলো, তাকে আড়াল থেকে ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দেয়ার সে প্রয়াস এখন আর অদৃশ্য নয়। সেসব দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার লানতকে এখনই যদি অনিবার্য করে তোলে, তাহলে বিস্ময়ের কোনো কারণ থাকবে না। অক্ষম হিসেবে আমাদের কোনো ফরিয়াদে হয়তো কর্ণপাত করা হবে না। কুফুর ও পথভ্রষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণার মাধ্যমে ইসলামের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দ্বীনি শিক্ষার পথে পানি ঢালার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তৈরি করেছে, তাতে আশা করা যায় অচিরেই এ জমিনে তাদেরই মতো আত্মস্বীকৃত নাস্তিকের সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না। নবীকে যে গালি দেয় তার স্বপক্ষে শতকরা কতজন উম্মতে মুহাম্মদী এখনও বুকটান করে দাঁড়িয়ে আছে সে পারসংখ্যান নতুন করে যাচাই করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। অতএব বান যখন আসবেই, ভাসিয়ে যখন নেবেই; সেটা নবআবিস্কৃত কোনো শিক্ষানীতিই হোক অথবা মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো মানবধর্মই হোক আল্লাহ্ পাকের সর্বগ্রাসী অভিসম্পাতই যে এখন কেবল অপেক্ষমান, সে ভয়ে ভীত হওয়া উচিত।

আমাদের দেশের কয়েকটি বহুল প্রচলিত দৈনিক পত্রিকা আছে। কাক কাকের গোশত খায় না। একটি পত্রিকায় আরেকটি পত্রিকার সমালোচনা নীতিগতভাবে শোভনীয় নয়। কিন্তু মানুষের ধৃষ্টতার একটি সীমারেখা তো থাকা চাই, যে পর্যন্ত অন্যরা তা সহ্য করতে পারে। এ পত্রিকাগুলোর প্রায় প্রতিটি লেখকই এমন ইসলাম বিদ্বেষী- আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল কারীমে যেসব সীমালঙ্ঘনকারীর বর্ণনা করেছেন, তাদের প্রায় সবই যেন এ পত্রিকাগুলোর সাথে আশ্চর্যজনকভাবে একাত্ম হয়ে গেছে। আল্লাহর দ্বীনের একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে এরা কথায় কথায়, আকারে-

ইঙ্গিতে, ছলায়-কলায়, ব্যঙ্গচিত্রে, রঙ্গ-রসিকতায়, ঠাট্টা-বিদ্রুপে এককথায় কলমের এমন কোনো ভাষা নেই যা দিয়ে আঘাত না করে। ইসলাম ও মুসলমানকে গালি দেবার জন্য কে যেন এদেরকে ভাড়া করে একত্রিত করেছে। মুসলমানকে অপমানিত করতে পারে এমন যে যেখানে আছে তাদেরকে যেন এরা খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে আসছে, যাতে সবাই একই কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে পারে। কিন্তু এসব কলামের উচ্চারণে কি কোনো মুসলিম মানস খুঁজে পাওয়া যায়? এর পাঠকরা কি নতজানু হয়ে তার মালিককে সিজদাহ করে না? যদি তা না হয় তাহলে বুঝতে হবে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে এরা অন্য কোনো পথের সন্ধান করছে। বহু কষ্ট করে এরা মুসলমানকে বুঝাতে চায়, আল্লাহর আইন হলেও সব আইন মানবধর্মের অনুকূলে নয়; আল্লাহর দ্বীন হলেও ইসলাম একমাত্র জীবনবিধান নয়, পত্রিকাগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কটাক্ষকারীদের পক্ষে ওকালতি করে, ওদের ক্রিয়াকলাপে উৎসাহ প্রদান করে, ওদের দুঃসাহসকে সাবাস দেয়। কুরআনের অবমাননাকারীকে, অপব্যাখ্যাকারীকে অবাধ লিখনী চালনার সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করে। ইসলামের সৌন্দর্যকে কুৎসিতরূপে প্রকাশ করার প্রয়াস পায়। যেসব কাগজে উচ্চারিত হয় আল্লাহর আইন মানে ফতোয়াবাজি, ইসলামের মৌল আকিদায় বিশ্বাসীরা মৌলবাদী, কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক কর্মী ও তাদের নেতৃবৃন্দ ধর্মব্যবসায়ী, সে লোকগুলো কি মুসলমান? তাদের পত্রিকায় যা উচ্চারিত হয় তা মুসলিম কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারে না। মুসলমানের বিশ্বাস আল্লাহই সার্বভৌম আর আল্লাহর সার্বভৌমত্বে কোনো মুসলিম সীমালঙ্ঘন করলে তার বিধানও স্পষ্ট। ইসলামের খোলসে কোনো রকম বাগাওতি করার অবকাশ এখানে নেই। তারপরও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রিত হয়ে যুগে যুগে শিকড় কাটার প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত হয়নি এসকল মুসলিম নামধারী কপট। একই ছাদের নিচে একই ঘরের চার দেয়ালের ভেতরে অবস্থান করে মুসলমান গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে, তার অনিষ্ট কামনায় রাত জেগে আরেকজন গভীর চিন্তায় মগ্ন। এসব পত্রিকার প্রতিবেদকরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে দেশের লাখ লাখ তালেবান তথা ছাত্রের মাত্র এক অথবা দু'টি ছেলে কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত আছে কিনা? হাজার হাজার মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনের কোনো একজন নামাজের বাইরে কোনো কাজে তৎপর হয়ে গেলেন কিনা? অথচ চোখ খুলে নরককীটদের তাণ্ডব তারা দেখে না।

মূসা আ. তুর পাহাড়ে যখন তার প্রভূর নিকট থেকে কওমের হেদায়েতের জন্য নির্দেশ গ্রহণ করছিলেন, তখন বনি ইসরাইল কওম সামেরীর প্ররোচনায় নবীকে ত্যাগ করে বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। একালে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়ারিশরা তওহীদ ও হেদায়াতের সাথে জীবন উৎসর্গ করছেন আর উম্মতে মুহাম্মদীর অনিষ্ট কামনায় রাতজাগা বান্ধবরা মঙ্গলপ্রদীপ, অনির্বান শিখা ও

চিরন্তন শিখার বেদিমূল ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখছে। সামেরীর মন্ত্র এরা জানে না, তবে সঙ্গীতের মোহন সুরে এরা জাতিকে স্তব্ধ করে গভীর আবেগে।

পথ চলতে চলতে মুসলমান কখনও দুর্বার হয়েছে, আবার শ্লথ হয়েছে। তবে পথচলা একেবারে থেমে থাকেনি। কেয়ামত পর্যন্ত তা চলবে। মসজিদে নববী থেকে ওহুদ পর্যন্ত সামান্য পথ অতিক্রম করতে যে তিনশ' জন সতীর্থ ঝরে পড়েছিলো, তাদের পথ পরিক্রমাও থেমে থাকেনি। তারাও পথ চলছে। আবার ওহুদের রক্তস্নাত নবীজীর উত্তরাধিকার মরণজয়ী মুজাহিদের পথ চলাও কোনোদিন থেমে যায়নি। তারাও চলছে। একই ভুবনের দু' বাসিন্দা, অথচ আলাদা। কেউ যাবে কম দূরত্বের ঠিকানায় পুলসিরাতের নিচে আর কেউ যাবে বেশি দূরের ঠিকানায় পুলসিরাতের ওপারে।

মুসলমানের দ্বীন হারানোর হাজার কারণ মানুষ দেখায়। সব কারণ একত্রে যতোখানি দায়ী শুধুমাত্র কুরআন না বুঝার কারণ তার চেয়ে অধিকতর দায়ী। সব পতন ও বিচ্যুতির এটাই প্রধানতম কারণ।

এ সমাজে শত নয় সহস্র নয়, বরং সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পুরো মুসলিম জনগোষ্ঠীতে কুরআন এক অপরিচিত কিতাব। মানুষ এমন কোনো বই কখনও পড়ে না, যা সে বুঝে না, ব্যতিক্রম শুধু আল্লাহ্ পাকের কিতাব। একবার নয় বহুবার পড়েও সে জানে না কি সে পড়ছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটিমাত্র কিতাব সে নিজ গৃহে হেফাজত করে, তারপরও জানে না এ কিতাবের অর্থ কি, মর্মার্থ কি! অথচ এটি তার মালিকের কাছ থেকে আগত তার জন্য একমাত্র কিতাব। একটি সময় একটি জনগোষ্ঠীর উপর নাযিল হয়েছিলো, কিন্তু তার ব্যাপ্তি সর্বকালের সকল মানবগোষ্ঠী পর্যন্ত। আবু জেহেল, আবু লাহাব, ইবনে উবাই এর যে ভূমিকা সেদিন ছিলো, আজও মঞ্চে সেসব চরিত্র রূপায়নে কোনো ঘাটতি নেই। নেই কোনো চরিত্রের অনুপস্থিতি। সেদিন লাখ লাখ আবু লাহাব ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর প্রতি কুরআনের ফয়সালা একই আছে।

বাড়ির আশপাশে গর্ত দেখে বুদ্ধিমান মানুষ সাবধান হয়ে যায়। মুসলমান তার দুশমনদেরকে যেমন চিনে, তেমনি তাদের আশ্রয়স্থলও চিনে। আশ্রয়দাতারা বিনয়ের সাথে তা স্বীকারও করে। যেমন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বলেছিলো, ওদের ছাড়া তার চলবে না। আগুনের শিখাকে চিরন্তন করে, মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে, রাখিবন্ধন করে, মহাভারতের পুণ্যতীর্থে দু'বাহু বাড়িয়ে দিয়ে শিরকের ছায়ামূর্তিরা বুকের সাথে আলিঙ্গন করবে ঠিকই, তবে অজান্তে কপাল থেকে ইসলামের ভাগ্যলিখন মুছে যাবে। এসব সহজ-সরল কথাগুলো অনুধাবন করার জন্যই কুরআন পড়া ও বুঝা জরুরি।

পশুকে জবাই করার আগে যদি এক পেয়ালা পানি তাকে দেয়া হয়, তাহলে সে সোৎসাহে খাবে। ফাঁসির আসামীকে এক পেয়ালা পানি দিলেও সে তা পান

করতে পারে না। পশু তার বিপদ আন্দাজ করতে পারে না, মানুষ পারে। এখানেই মানুষ ও পশুতে তফাৎ। যে মানুষ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তার কথাকে বিশ্বাস করে; সে পশুসুলভ আচরণ করতে পারে না কিংবা যারা পশুর মতো নিরুদ্বেগ জীবনযাপন করে, তাদের সহকর্মী হতে পারে না। মুসলমানের পথ এক ও অভিন্ন। সেই পথের পথিক একটিমাত্র গন্তব্যে পৌঁছার অঙ্গীকারে আবদ্ধ। ছদ্মবেশে ভিন্ন যাত্রীরাও এ কাফেলায় ছিলো এবং এখনও আছে। মুজাহিদের শাণিত তরবারিই কেবল কাফেলাকে নিরাপদ রাখে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মদীনার উপকণ্ঠেই ফয়সালা করে দেখিয়ে দিয়েছিলো, কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট।

ভুল করা মানুষের প্রকৃতি। ভুল করে বলেই সে মানুষ। যে ভুল থেকে ফিরে আসে সে সৎ মানুষ আর যে ফিরে আসে না সে অসৎ। ইসলাম মানুষকে ফিরে আসার সহজ-সরল পথটি দেখিয়েছে। যে ফিরে না তার উপর শয়তানসহ অনেক কিছু ভর করে, যা সে দেখে কিংবা দেখে না। কিন্তু একটি জিনিস অবশ্যই সে দেখে এবং অন্যরাও দেখে সেটা হলো তার জেদ। জেদের বশবর্তী হয়েই মুসলিম নামের মানুষগুলো দ্বীনহারা হচ্ছে, নিজের দ্বীনের প্রতি বিষবাণ ছুড়ে তাকে জর্জরিত করছে এবং যথারীতি তার পরিণামকে মাথায় নিয়ে কবরবাসী হচ্ছে। কত অবলীলায় আজ একদল থেকে আরেক দলে যাওয়া যায়! প্রকাশ্যে শত্রু তাকে হাত বাড়িয়ে আহবান জানায়। সকালে যার ঘোরবিরোধী বিকালে তার দুয়ারে ফুলের ডালি নিয়ে হাজির হয়। এসব যদি সম্ভব হয় তবে মন থেকে জেদ নামক তুচ্ছ ও ঘৃণ্য একটি বস্তুকে থুথুর সাথে ফেলে দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নামটিকে সজোরে ও সগৌরবে উচ্চারণ করে দ্বীনের পতাকা উড্ডীনরত জন্ম-জন্মান্তরের নিবাস ইহ-পরকালের নিরাপদ শিবিরে প্রবেশ করা কেন সম্ভব নয়?

আল্লাহ পাক আমাদের সৃষ্টিকর্তা, কর্মফল দিবসের তিনিই বিচারকর্তা। মাঝখানে যে জীবনটা দিয়েছেন তার একমাত্র আইনদাতা তিনিই। এর ব্যতিক্রম যে করবে, ব্যতিক্রমে যে চলবে সে হবে পথচ্যুৎ- জালিম। মুমিনের জন্য আল্লাহ জান্নাত তৈরি করেছেন। কাফের ও মুনাফিকের জন্য তৈরি করেছেন জাহান্নাম। কাফেরের অবস্থান দুনিয়াতে প্রকাশ্য। মুনাফিক নিজে জানে সে মুসলিমশিবিরের বিশ্বস্ত সৈনিক নয়। কাফেরও তাকে চেনে তাই তাকে বারবার সাবধান করে ও সংশোধন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে।

পৃথিবীর পথে পথে একদল মুজাহিদ ইসলামের মশাল হাতে এগিয়ে যাচ্ছে। সে পথে ঈমানের সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছেন তাদের পিতৃপ্রতীম হাজারও নায়েবে রাসূল। এ পথকে যেন পিচ্ছিল করে দেয়া না হয়, পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে দেয়া না হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দ্বীনের পথ রুদ্ধ হবার নয়।

اقرأ باسم ربك

হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহি আলাইহির মাজার জিয়ারত করে দেশসেবার আন্দোলনের বৃহত্তম কোনো কর্মসূচীর ডাক দেয়া আরেকটি নতুন রেওয়াজ হয়েছে। দীর্ঘ বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদ সিলেটে ছুটে গিয়েছিলেন মাজার জিয়ারত করতে। জেলজীবনের বকেয়া বেতনের সাত লাখ টাকা মাজারে দান করে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও উত্তরবঙ্গে তখন প্রতিদিন মানুষ প্রচণ্ড শীতে শীতবস্ত্রের অভাবে মৃত্যুবরণ করছিলো। সাত লাখ টাকা পেয়ে মাজার কমিটি নিশ্চয় পরবর্তী ওরস মোবারক খুব ধুমধামের সাথে পালন করবেন।

দরগা শরীফের ওরস মোবারকের তুলনা হয় না। পশ্চিমে দেয়াল সংলগ্ন পুরো রাস্তাটি জুড়ে উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত কলকির ধোয়ায় এমন অন্ধকার হয়ে উঠে, দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। আহা, রাস্তার দু'পাশে সিলেটের কত শরীফ ও দ্বীনদার মানুষই না শুয়ে আছেন মাটির নিচে। মাজারের উত্তর পশ্চিম কোণে ওরসের রাতে কী তাণ্ডব হয়, শুধু বিদগ্ধ জনই উপভোগ করতে পারে। নেশায় বিভোর উদোম নৃত্য দুনিয়াকে ভুলিয়ে দেয়। মসজিদে কুরআন তেলাওয়াত, মাজারে জিয়ারত ও গোলাপ পানির ঢল আর এসবকে ঘিরে শিরক ও জাহেলিয়াতের তাণ্ডব, সবমিলে *দরবার শরীফের পবিত্র ওরস মোবারক।*

আউলিয়াকুল শিরোমণি হযরত শাহ জালাল ইয়ামানি রহতুল্লাহি আলাইহি কেয়ামতের কঠিন দিনে কী করে মুখ দেখাবেন তার মওলাকে জানি না। ঈসা

আলাইহিস সালামকে আল্লাহপাক সেদিন কৈফিয়ত চাইবেন-তার উম্মত কেন তাকে ঘিরে শিরকে লিপ্ত হয়েছে সেজন্য।

ইসলামের মরণজয়ী মুজাহিদ, কুফরী ও শিরকের বিনাশকারী, ইসলামের ঝাণ্ডাবরদার, দ্বীনের আলোকবর্তিকা বহনকারী, সুরমা অববাহিকার লক্ষ কোটি মুমিন মুসলমানের নয়নের মণি কী করে বুঝাবেন তাঁর মাবুদকে! এসব পাপাচার থেকে তার পবিত্র অঙ্গনটিকে মুক্ত করার জন্য তিনি তো কোনো বরপুত্র রেখে যাননি।

আমাদের দেশে মসজিদ যতো বিরান হচ্ছে মাজার ততো জমজমাট হচ্ছে। দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে আমাদের মুরব্বীরা হয়রান হচ্ছেন। অথচ কোনো আহবানকারী আহবান করেননি, তবু মোনাজাতের জন্য ঢল নামে। রাজপথে বিরাট আকৃতির তোরণে, পত্রিকার বিশাল প্রচার মাধ্যমে, দূরপাল্লার যানবাহনে পবিত্র দরবার শরীফের দিকে যতো আহবান ততো নয় মসজিদের দিকে। আল্লাহর হুকুম ও নবীর সুন্নতের দিকে আহবানকারীদের কাফেলা একাকীই পথ পাড়ি দিয়ে চলেছে।

কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার কথা যারা বলেন তারা যেন মানুষের শত্রু। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের সমর্থন চাইলে মুসলমান আদাজল খেয়ে নিরপেক্ষ কাউকে সমর্থন করে। আল্লাহর আইন আর মানুষের আইন একই পাল্লায় ওজন করে আল্লাহর আইনকে বাতিল করে দেয়।

কোনো পক্ষে যে নেই সেই নিরপেক্ষ। মুসলমান দ্বীনের পক্ষ ত্যাগ করলে সে কেমন মুসলমান? আবার উভয় পক্ষ যে সমর্থন করে সেও নিরপেক্ষ। আল্লাহর সিজদাহ করে সে কেমন করে অন্যপক্ষ অবলম্বন করে? ধর্মনিরপেক্ষতার ধোঁকায় পড়ে মুসলমান দ্বীনহারা হচ্ছে, বোধ করি শয়তান তার এতো বড় কামিয়াবীতে বিস্মিত হয়ে পড়েছে।

সোয়া লাখ সাহাবীর কবরে কোনোদিন ওরস হয়নি। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় শুয়ে আছেন। মদীনায় ওরস অনুষ্ঠানের কথা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করেনি। তাহলে আমরা এ ভূখণ্ডের মানুষ কোন ধোঁকায় পড়ে গেলাম? এসব ঈমান-আকিদা নিয়েই কি আমরা পরপারে পাড়ি দেবো? এসব থেকে আমাদের মুক্তি দেবে কে? যতোদূর দৃষ্টি যায়, এ জনপদে দ্বীনের কোনো সিংহপুরুষের উপস্থিতি আপাতত চোখে পড়ে না। তাহলে পথহারা মানুষকে পথ দেখাবে কে?

পত্র-পত্রিকায় আল্লাহর আইনের বিরোধিতাকারীদের বিবৃতি-বক্তৃতা প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাদের হুঁশিয়ার করার সাহস অনেকের হয় না। কুরআনের জীবনব্যবস্থাকে তিরস্কার করার ঔদ্ধত্য দেখায় যেসব দানবশক্তি তাদের

মোকাবেলা করা তো দূরের কথা তাদের রক্তচক্ষু দেখে পায়ের দিকে চোখ নামিয়ে পথ চলতে শুরু করেছে মুসলমান। ইসলামের প্রশস্ত রাজপথ ওদের কাছে বন্ধক দিয়ে নিজেরা কোনো মতে জীবন পাড়ি দিয়ে সময়টা পার করতে চাইছে। বেহেস্ত যাবার সহজ সরল পথের সন্ধান পেয়ে গেছে প্রায় সবাই। অপরদিকে জ্ঞানপাপীর দল এখন ইসলামকে হেফাজতের ঠিকাদারি নিয়েছে। শয়তান ও তাগুত এখন জাহেলিয়াতের সব দরজা খুলে দিয়েছে। দ্বীনের এমন দুর্দিন এই জনপদের অধিবাসী আর কোনোদিন প্রত্যক্ষ করেনি।

একদল লোক প্রায় তিন দশক আগে ধর্মনিরপেক্ষতার বড়ি খেয়েছিলো। আজও তারা নেশায় বুদ হয়ে আছে। এ বেহুঁশ অবস্থায় হয়তো দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাবে। নেতাকর্মীদের অধিকাংশই কপালে ঐ কলঙ্ক তিলক নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। তাদের বংশধর তাদের জন্য কী প্রার্থনা করে জানি না, তবে ইদানীং তারা কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছে এ জন্য, তাদের পিতৃপুরুষের রূহের মাগফিরাত কামনা করার জন্য নতুন একদল দাঁড়কাকের আবির্ভাব ঘটেছে।

আলিম শ্রেণীর *মতভেদ* সাম্প্রতিককালে অনেকটা কমে এসেছে। কিন্তু কিছুসংখ্যক পণ্ডিত আলিমের মতপার্থক্য যেন শত্রুতায় পর্যবসিত হয়েছে। এরা *শত্রুর-শত্রু মিত্র* হয় এই ফর্মুলায় বিশ্বাস করে অবস্থান পরিবর্তন করে ফেলেছেন। সময় পাল্টে যাবে আর সময়ের কাঠগড়ায় তখন অবিমিশ্রকারী হঠকারিদের উপস্থিত হতে হবে। এ ট্র্যাজেডি যখন সংঘটিত হবে, তখন মুসলমানের অন্তর আরেকবার বিদীর্ণ হবে।

আগরবাতি আর মোমবাতি জ্বালিয়ে যে নতুন পথের সন্ধান আমরা শুরু করেছিলাম, সে পথে আগুনের শিখা জ্বলছে। যে শিখার আলোতে আমাদের পূর্বপুরুষ অন্তরে ঈমানের আলো জ্বালিয়ে গেছেন। আজ যারা কুফরীর পথকে পরিহার করার জন্য আহবান জানান, তাদেরকে প্রকাশ্য রাজপথে মার খেতে হয়। যারা মারে তারা যখন মরবে তখন কোনো শ্মশান ঘাটে যাবে না, বরং যাবার আগে তাদের হাতে মার খাওয়া এসব আহ্বানকারীদের দরোজায় তাদের লাশকে আপনজনরা বয়ে নিয়ে যাবে। আজ যাকে গালি দিচ্ছে তার দোয়া নিয়ে কবরে যাওয়ার জন্য পথের উপর কাফন পরে শুয়ে থাকবে। আজ তাদেরকে ফতোয়াবাজ বলে গালি দিচ্ছে অথচ ফতোয়া তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও দিয়েছেন। যে ডাক্তারি পড়েছে সে যদি রোগী দেখে ওষুধ না দেয়, তাহলে তার বিদ্যা অর্জন ব্যর্থ। তার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। ফতোয়া দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করতে হয়। আলিমরা অধিক জ্ঞান অর্জন করেই মুফতী হন। আজ যারা এদেরকে ফতোয়াবাজ বলে, আশঙ্কা হয় কাল কিয়ামতের দিন এরা প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন, কেন তারা ঐসব

কূপমুণ্ডুকের প্রতি তাদের বেয়াদবির কারণে ফতোয়া জারি করেননি, কোন অধিকারে তারা ওদের প্রতি ইহসান করেছেন, মহানুভবতা দেখিয়েছেন?

কী কঠিন নিফাকের ভেতর দিয়ে বর্তমান সময়টা অতিবাহিত হচ্ছে। যিনি মসজিদে দাঁড়িয়ে সীরাতের আলোচনায় কিংবা মিলাদের মাহফিলে বসে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, নবীজীর মহান আদর্শে সকলকে অনুপ্রাণিত হতে হবে, কুরআনকে অনুসরণ করে জীবনযাপন করতে হবে। তিনিই আবার মন্দিরে পূজার অনুষ্ঠানে অধিকতর প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেন, আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার মূলমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি, আমাদের চেতনা ও বিশ্বাসে আমরা সবাই একইসূত্রে বাধা।

একজন অনার্সের ছাত্রকে যদি বলা হয়, গরুকে নিয়ে একটি রচনা লিখো, তাহলে নিশ্চয় খুব ভালো কিছু লিখবে। কিন্তু তাকে যদি কুরবানীর উপর একটি নিবন্ধ লিখতে বলা হয়, তাহলে সে বিপদে পড়বে। প্রথম রচনায় সে গরুর উপকারিতা, বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা হয়তো লিখবে। দ্বিতীয় রচনায় স্বভাবতই সে কুরবানী নিষিদ্ধ করার জন্য উপদেশ দেবে, কেননা গরুর বংশবৃদ্ধির চিন্তা করাই তার জ্ঞান-বুদ্ধির উপযোগী।

এ হলো আমাদের শিক্ষার অবস্থা। দ্বীনহীন ব্যক্তিরাই এখন দ্বীনের অধিক দাবিদার। তারা দ্বীনদারদেরকে কটাক্ষ করে বলে, দ্বীন কি তোমাদের একচেটিয়া সম্পত্তি?

একজন প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে উলঙ্গ হয়ে চলাফিরা করবে কিন্তু তাকে নেংটা বলা যাবে না, অসভ্য বলা যাবে না। এটা যদি সম্ভব হয় তাহলে বিশাল জনতাকে সাথে নিয়ে চিৎকার করে বলা যাবে, আমরা দ্বীনহীন, কিন্তু তাদেরকে কেউ একথা বলতে পারবে না।

ফিতনার ভয়ে নিরাপদ আশ্রয় যে কেউ কামনা করুন, নফসের লাগাম ধরে পায়ের দিকে দৃষ্টি রেখে যার খুশি সে পথ চলুন, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাফেলা রাজপথের বিজয়দৃপ্ত পথিক। মঞ্চে ও ময়দানে প্রতিরোধের সামনে মুসলমানের জন্য পিছুটান হারাম।

হীনমন্যতায় ইসলামের পরাজয়

এই বিশ্বজগত যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি এক ও অদ্বিতীয় পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা। তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। পৃথিবীতে তিনি যতো নবী পাঠিয়েছেন তাদের শ্রেষ্ঠনবীর নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সর্বশেষ নবীর কাছে যে কিতাব পাঠিয়েছেন সে কিতাব পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে। আল্লাহ পাকের একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম, যার মোকাবেলায় অন্য সমস্ত দ্বীন মিথ্যা ও বাতিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা

প্রতিপালক ও মালিক। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের নবী, কুরআনুল কারীম যাদের অনুসরণীয় কিতাব, ইসলাম যাদের জীবনবিধান, তারা ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী মানবজাতির মধ্যে সাধারণ কোনো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিরীহ জীবন কাটিয়ে দেবার জন্য তাদেরকে একটি মনোনীত দ্বীনের অনুসারী করা হয়নি। ব্যাঙের একঘেঁয়ে ডাকের মতো তাদের পথচারী কিংবা পশুর মতো ভোগবাদী জীবনও নয়, উদ্দেশহীন পথচারী কিংবা ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাস জীবন নয়, প্রাচীন পুঁথি-পাঁচালীর নাম কীর্তন কিংবা নিরুপদ্রব বিপদমুক্ত নিরাপদ জীবনও তাদের নয়।

ইসলাম জীবন্ত জীবনবিধানের নাম। এর প্রতি পরতে প্রাণের স্পন্দন উচ্চারিত হয়। এক বিশাল পরিকল্পনাকে বাস্তাবায়িত করার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করে ইসলামের পতাকাবাহী মুসলিম নাম ধারণ করেছে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নবীজির অক্লান্ত পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত যাকে অনিদ্রা-অনাহারের মুখোমুখি করে দেয়, পলাতক জীবনের গ্লানি নিয়ে পরাজিতধর্মকে ধারণ করার লজ্জা থেকে সে মুক্তি চায়। সত্যকে মেনে নেয়া ও মিথ্যাকে পরিহার করার মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ হয়। যে জমিনে শয়তান ও তাগুত বিজয়ী হয়, সেখানে মুসলমানের জীবন ও মৃত্যুতে তফাৎ নেই।

আগামী দিন ইসলামের

মাত্র পঞ্চাশ বছরের হায়াত নিয়ে কমিউনিজমের জন্ম হয়েছিলো দুনিয়াতে। মার্কস ও এঙ্গেলসের ব্যক্তিগত হায়াত এর চেয়ে বেশি ছিলো। লেলিন, স্টালিন, মাওসেতুং প্রমুখ জ্ঞাতি ভাইয়েরাও মোটামুটি পূর্ণ জীবনযাপন করে বিদায় হয়েছেন, কিন্তু অমৃতের সন্তান স্বয়ং মৃত্যুবরণ করেছে একেবারে অকালে। কিছুদিন আগেও নির্বোধরা কমিউনিজমকে ইসলামের বিরাট প্রতিপক্ষ বলে মনে করতো। আল্লাহর মনোনীত দ্বীনকে ধারণকারী অনেক হীনমন্য মুসলমানও ভয়ভীতিতে প্রমাদ গুণছিলো। কিন্তু কোনো মরণজয়ী মুজাহিদের অন্তরে না ছিলো কোনো শঙ্কা আর না ছিলো কোনো ভীতি। আফগানিস্তানে মুজাহিদের আঘাত তেমন কঠিন ছিলো না। এতোবড় পশুর জন্য এতোটুকু রক্তপাত তেমন কিছু নয়। তবে রক্তপাত যে শুরু হয়েছিলো তা আর বন্ধ হয়নি। কিছুদিন পর আপন গৃহেই অকালে অপঘাতে সোনার সন্তান মহান (!) কমিউনিজমের মৃত্যু হলো। ইসলামের এ দুশমনটিকে ময়দানে মারতে না পারার দুঃখ মুজাহিদের রয়েই গেলো। এতোবড় বীরের হায়াত এতো কম হবে কে-ই বা জানতো?

পশ্চিমাজগত কৌশলে ইসলামকে চিরতরে শেষ করে দেয়ার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করে না। ইউরোপ ইসলামের হাল হকিকত একসময় খুব

দেখেছে। সে জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে তার যেমন শয়তানি আছে তেমনি আছে ভয়। একেবারে প্রত্যক্ষ মোকাবেলা করার ধৃষ্টতা দেখাতে সে ভয় পায়। তবে আমেরিকা নামক গোলামটিকে পাওয়াতে আপাতত তাদের খুব সুবিধা হয়েছে। যদিও বৃটিশের পরগাছা হিসেবে আমেরিকার জন্ম তব শান-শওকতে আমেরিকা এখন ইউরোপের ঝাণ্ডাবরদার সেনাপতি।

আমেরিকার বয়স কম, ইসলামের শৌর্য-বীর্যের কথা সে লোকমুখে শুনেছে। কোনোদিন প্রত্যক্ষ করেনি। পেন্টাগনে প্রচুর পরমাণু অস্ত্র মওজুদ আছে। কাকে মারবে কিভাবে মারবে এ চিন্তায় অস্থির। শত্রু মাত্র একটাই। ইসলাম। তবে শত্রুটি খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু হীনমন্য মুসলমান ভাবে, আগে আমেরিকার শত্রু ছিলো দু'টি। কমিউনিজম ও ইসলাম। এখন মাত্র একটি। অতএব মুসলমানদের বিপদ বেড়ে গেছে। ব্যাপারটা এরকম ভাবতে শিখেনি, আগে মুসলমানের দুটি শত্রু ছিলো, একটির পতন হয়েছে আর রয়েছে মাত্র একটি। এতে অবস্থান হয়েছে আরো মজবুত, নিশানা হয়েছে নিশ্চিত। তবে রাশিয়ার মতো আমেরিকার তেলেসমাতিও ধরা পড়ার উপক্রম হয়েছে। দুর্ঘটনা কখন ঘটবে তা কেউ আগাম বলে দিতে পারে না, তবে আলামত দেখে বুঝা যায়, দুর্ঘটনা এড়ানোর ক্ষমতা আছে কি নেই।

ফ্রাংকেস্টাইনই তাকে ধ্বংস করে। এভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলে আবারও ময়দান থেকে মুজাহিদকে খালি হাতে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহপাক মুসলমানকে পরীক্ষা করতে চান। কে তার পথে জীবনকে উৎসর্গ করে দিতে পারে দেখতে চান। তবে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কখনো তাবুকের পুনরাবৃত্তিও ঘটান। বিজয় তখন অনিবার্য হয়ে উঠে।

আমেরিকা অস্ত্র আবিষ্কার করে। আবার অস্ত্র ধ্বংস করতে আইন পাশ করার জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আকুল আহবান জানায়। সেই আবেদনে সাড়া না দিলে চোখ রাঙায়। তবে ফ্রাংকেস্টাইনরা বসে নেই। ওরা ধীর পায়ে মোড়ল সাহেবের বাড়ির দিকে হাঁটা দিয়েছে। দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না; সাথে অনেককে নিয়ে আসে। ভোগবাদী জীবনব্যবস্থা আরেক মুসিবতের কারণ হতে চলেছে। বিয়ে নেই, শাদী নেই, পশুর মতো যৌনাচার এখন সমাজের গর্বিত জীবনব্যবস্থা! ফলাফল দুঃখজনক পরিণতি। প্রথমত সন্তান উৎপাদন হ্রাস অর্থাৎ উত্তরাধিকারের সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে। দ্বিতীয়ত এইডস ও অন্যান্য জীবনসংহারী ব্যাধির সীমাহীন প্রাদুর্ভাব। এইডস তো এমন অভিশাপ যা নারী-পুরুষকে একে অন্যের শত্রু বানিয়ে ছাড়ছে। এতো অবাধ মেলামেশা, অথচ কঠিন সন্দেহপ্রবণ একে অন্যের প্রতি, না জানি কে কাকে ঘাতকব্যাধিতে সংক্রমিত করে দেয়। ঘাতক এইডসকে ওরা ছড়িয়ে দিচ্ছে

তাদের ভাববাদী সাম্রাজ্যের শহরে-বন্দরে। এ নৈরাশ্যজনক পরিণতির দিকে ওরা দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। বিশ্বের মানুষ ওদের হাসপাতালগুলোয় চিকিৎসার জন্য যায়, সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসে। ওরা নিজেরা হাসপাতালে যায় মৃত্যুর প্রহর গুণতে, কেননা এসব রোগের চিকিৎসা ওদেরও জানা নেই।

খুব জোরে পতন হওয়ার জন্য খুব উপরে উঠতে হয়। এসব উত্থান-পতন ইতিহাসেরই রীতি। কিন্তু ইসলামের পথচলার কী হবে? কঠিন প্রত্যয় ও ঈমানের দীপ্তি নিয়ে যারা পথ চলছে তাদের জন্য পৃথিবী সংকুচিত হয়নি কখনও। শত্রু আসতেই থাকবে, ঈমানের পরীক্ষার জন্য শত্রুর আগমন অবশ্যম্ভাবী। ইসলামের আলো নিভবে না বরং দীপ্তিময় হবে। তবে তখনই তা সম্ভব হবে যখন একদল মশালধারী তা ধারণ করে সারিবদ্ধ হবে।

সোয়াতে কোটি চীনবাসী নিজেদেরকে কমিউনিষ্ট বলতে এখন খুব লজ্জা পায়। অনেকদিন পর আফিমের নেশা কাটতে শুরু করেছে। তবে সত্যকে জানতে ওদের অনেক সময়ের দরকার হবে। পূর্ব ইউরোপের কমিউনিজমের কাফনগুলো পুরাকীর্তির মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। মহামতি লেনিনকে ক্রেনে লটকিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ইউরোপ ও আমেরিকা দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে আছে। ভোগবাদী সমাজে রোগের আবাদ হবে এটা প্রকৃতিরই নিয়ম। ইসলামের এ দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষকে এখন ময়দানে না খুঁজে হাসপাতালে খুঁজতে হবে। অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত এসব অসুস্থজাতিকে যদি আল্লাহ পাক ধ্বংস করতে না চান তাহলে মুসলমানের ধ্বংস কামনার কাফফারা তাদের দিতেই হবে।

আগামীদিন ইসলামের। সেই শাশ্বত ইসলামের যে ইসলামের আগমনকে অমুসলিমরা স্বাগত জানাতো। যে ইসলামের স্বপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য অমুসলিমরা জিজিয়া প্রত্যাহারের জন্য আবেদন জানাতো। শত্রুকে বন্ধু করার এই অনন্য মুহূর্তটি সহসাই চলে আসে না। তার জন্য একদল সুসজ্জিত বাহিনীর দীর্ঘ পথ পরিক্রমার প্রয়োজন হয়।

ইসলামের রেজিমেন্টেশন

একজন আহবানকারী মুয়াজ্জিন উচ্চকণ্ঠে যখন সময় ঘোষণা ও আহবান করেন তখন চারদিক থেকে সবাই ছুটে এসে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যান। সামনে একজন ইমাম পেছনে অনেকগুলো কাতার। অত্যন্ত সোজা ও সুবিন্যস্ত কাতার। ইমাম কুরআনুল কারীম থেকে মহান প্রভুর পবিত্র কালাম পড়ছেন। পেছনে সারিবদ্ধ মুমিনরা নীরবে নিঃশব্দে শুনছেন। ইমাম রুকু করছেন, সাথে সবাই তাকে অনুসরণ করছেন। সিজদাহ, কিয়াম, তাশাহুদ সবকিছুতেই সামান্য

তারতম্য না করে ইমামের অনুসরণ করছেন। ইমাম দু'দিকে সালাম ফিরাচ্ছেন, একই সাথে সবাই ডানে ও পরে আবার একসাথে বামে সালাম করে তারপর শিথিল হয়ে বসছেন। এ দৃশ্য সালাতের। যে ইসলামকে বুঝে না, মুসলিম নামের অর্থ বুঝে না, সালাত কি জানে না, যে যদি এ দৃশ্য দেখে তাহলে তার কী মনে হবে? নিশ্চিতই সে ভাববে এটি হয়তো একটি রেজিমেন্ট, একটি বাহিনী। একজন কমাণ্ডারের অধীনে হয়তো এরা কোনো প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। কেননা এমন সুশৃঙ্খল ও অনুগত হয়ে এরকম কিছু করা কোনো সেনাবাহিনীর পক্ষেই সম্ভব।

আসলে ইসলামের এই স্বরূপ, এই প্রকাশ এক অপরূপ রেজিমেন্টেশন বৈ আর কি হতে পারে? যুদ্ধরত ইমাম তার সম্মুখে অস্ত্র রেখে নামাজ পড়াতেন বলে ঐ জায়গার নাম রাখা হয় *মিহরাব*। দয়াময় আল্লাহ পাককে সিজদাহ করা হোক, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার মিশনে হোক, দুস্থের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করা হোক, অথবা মজলুমকে জালিমের হাত থেকে উদ্ধার করা হোক- সর্বক্ষেত্রেই মুমিনের ভূমিকা একজন সৈনিকের মতোই। প্রতিটি কর্মে, ঘরে ও বাইরের কর্মে, তার সারাজীবনের কর্মে সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাপরায়নতা এসব তো কঠোর নিয়মের অধীন, এমনকি পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, পারস্পরিক আচার-আচরণ ও তার রীতি-নীতি সবই প্রশিক্ষণের অধীন ও সবকিছুই অত্যন্ত সুবিন্যস্ত। একটি সুশৃঙ্খল জীবনযাপনই তাকে তার লক্ষ অর্জনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। একজন সাধারণ সৈনিকের জীবনও গৌরবদীপ্ত হতে পারে, অসাধারণ সৈনিকের জীবনও গৌরবদীপ্ত হতে পারে, অসাধারণ হতে পারে যদি তার দিক-নির্দেশক একজন কর্নেল কমাণ্ডিং-এ থাকেন।
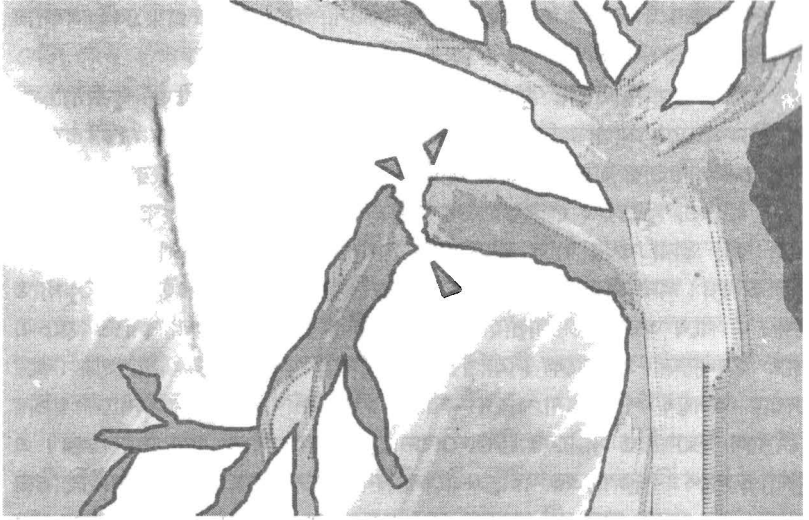
ইসলাম থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন

বিখ্যাত হওয়ার কুখ্যাত পথ

দাউদ হায়দার খুব অল্পবয়সে কবিতা লিখে সুনাম অর্জন করেছিলো। সেই সময় একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়াতে কিছু লোক তাকে একনজর দেখার জন্য ছুটোছুটি করতে লাগলো; আর এটাই হলো কাল। শুরু হলো সর্বনাশের সূচনা। দাউদ হায়দারের মাথা খারাপ হলো। সে বিখ্যাত হতে চাইলো। অতিসাধারণ দাউদ অসাধারণ হতে চাইলো। জগতের সকল সাধারণ ব্যক্তিই তাদের অসাধারণ প্রতিভা ও গুণাবলির দ্বারা বিখ্যাত হয়েছেন। কেউ কেউ অসাধারণ ত্যাগ-তিতীক্ষার দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেছেন। দাউদের ছিলো কবিতা লেখার সামান্য কিছু প্রতিভা। মুসলিম মনীষীরা জগতে বিখ্যাত হয়েছেন, মহান কীর্তিকলাপের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, আপন প্রতিভা দিয়ে জগতকে মহিমামণ্ডিত করে গেছেন। তবে কবি প্রতিভা দিয়ে পৃথিবীকে ঋণী করে গেছেন এমন ঘটনা একেবারেই বিরল। কারণ কাব্যচর্চাকে স্বয়ং কুরআনুল কারীমই অনুৎসাহিত করেছে। কবির অলীক কল্পনা, অসম্ভব ভাবনা মানবতার সামান্যই উপকার করে এবং অধিকাংশই মানুষকে কল্পনাবিলাসী ও কর্মবিমুখ করে তুলে বিধায় এ বিষয়টি মুসলিম জ্ঞানতাপসরা সামান্যই চর্চা করেছেন। অথচ মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে সাধনা ও অধ্যবসায় করেছেন তার ফল বিশ্বমানবতা

শত শত বছর উপভোগ করেছে এবং জগৎবাসী পরম কৃতজ্ঞতায় সেই অবদান স্বীকার করেছে।

দাউদ হায়দার তার মুসলিম পূর্বপুরুষদের কোনো প্রতিভা দুর্ভাগ্যক্রমে পায়নি। অতএব আপাতত কবি প্রতিভা সম্বল করে বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হলো। কিন্তু যে প্রতিভার দ্বারা অনেকে অতিসামান্য সময়ে বিখ্যাত হয়েছেন তেমনি দুর্লভ প্রতিভা খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটেছে। এমন অসাধারণ প্রতিভাধর যারা নন, তারা যখন অতি তাড়াতাড়ি বিখ্যাত হতে চান; তখন তাদের পথ খুঁজতে হয়। পথ তারা পেয়েও যায়। তবে বিখ্যাত হওয়ার সেই পথটি কুখ্যাত পথ। এ পথে অতর্কিতে আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের উপর হামলা করতে হয়; এ পথে ইসলামের প্রদীপকে নির্বাপিত করে দিয়ে মুসলমানকে দিশেহারা করে দেয়ার অসম্ভব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়, এ পথে অতিসাবধানে গভীর কৌশলে ঈমানদীপ্ত মুমিনের চিন্তা-চেতনায় সংশয়ের বীজ বুনে দিতে হয়। এ কুখ্যাত পথে বিশ্বজগতের নবী, নবীদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বেয়াদবী করতে হয়। দয়াময়ের পাক পবিত্র কথাগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করতে হয়। দাউদ হায়দার সে কুখ্যাত পথের ইস্তেমাল করতে গিয়ে নবীর চরিত্র হনন করতে কবিতা লিখে ফেললো। যেমন কর্ম তেমন ফল। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলো। কিন্তু সে সাথে কুকর্মের কুফলও ফলতে শুরু করলো। আল্লাহ পাকের লানত ও পর্যায়ক্রমিক শাস্তি তো জারি হয়ে রইলোই। সেই সাথে আল্লাহর বান্দাদের ঘৃণা ও বিতাড়নে দুনিয়াতেই তার জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হলো। অথচ দাউদ হায়দারকে আল্লাহ তা'আলা কম হায়াত দেননি। সে যদি ধৈর্য ধরে শুধু সুস্থ কবিতা চর্চা করতো, তাহলে আজ অবধি সে যেখানে পৌঁছতে পারতো তার জন্য সে ঈর্ষার পাত্র হতে পারতো।

ইজ্জতের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা। তিনি যদি কাউকে ইজ্জত-সম্মান ও খ্যাতি দিতে চান, তাহলে অকারণেই তা দিতে পারেন। নবুওয়াতের তাজ তিনি যাদের মাথায় পরিয়েছিলেন তারা প্রথমে এই সম্মানিত খেতাবের জন্য মনোনীত হয়েছেন। পরে বাকি জীবন ধরে সেই মেহেরবানির দানকে ধরে রাখার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করেছেন।

তসলিমা নাসরিন নামক নারীটি তার শিক্ষাজীবনের দীর্ঘসময়ে লেখিকা হবার পরিকল্পনা হয়তো করেনি। কারণ লেখাপড়া করে সে ডাক্তার হয়েছিলো। সামান্য কিছু সময় লেখাপড়া করে কেউ ডাক্তার হতে পারে না। তারপর সে লেখিকা হয়েছে। লেখার প্রতিভা কিছু ছিলো বলেই তা সম্ভব হয়েছে। কারণ ইচ্ছা করলেই কেউ লেখক- লেখিকা হতে পারে না। তবে তাড়াতাড়ি বাজার মাত করতে চাইলে কানাগলির পথটিই ধরতে হবে। লেখনী দিয়ে যারা

অতিঅল্পসময়ে জগদ্বাসীকে ঋণী করে গেছেন তাদের প্রতিভা ছিলো ক্ষণজন্মা। সেটা অতি ভাগ্যবানদের জন্যই নির্ধারিত। তবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার বলে অনেকেই কীর্তিমান হয়েছেন এবং তার জন্য তারা অসামান্য ধৈর্য ধরেছেন।

তসলিমার সে ধৈর্য ছিলো না। রাতারাতি বিখ্যাত হওয়ার স্বপ্নে সে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশালাকার পরিচিত পুস্তকগুলো আপাতত বন্ধ রেখে ধর্মগ্রন্থ চর্চা করতে শুরু করলো এবং কোনটা স্বরবর্ণ আর কোনটা ব্যঞ্জনবর্ণ এসব বুঝার আগে তত্ত্ব ও তথ্যের জ্ঞান সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আবার যেমন কর্ম তেমন ফল। সে অমৃতের বদলে বিষ নিয়ে ভেসে উঠলো। সেই বিষ নিজে পান করলো, অন্যকে নেশাগ্রস্ত করে পান করাতে লাগলো। যথারীতি সেও লানতের যোগ্য হলো এবং চিরাচরিত নিয়মে তাড়া খাওয়া শুরু হলো। রাতের অন্ধকারে পালালো এবং তার আজন্মশত্রু মুসলিম নারীর নেকাবটি পরেই পালাতে হলো।

জরায়ুর স্বাধীনতা চেয়েছিলো। সে স্বাধীনতা সে পেয়েছে। অগণিত সতীর্থের অবাধ বিচরণে তার সে স্বাধীনতা এখন কত বিপন্ন, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এই নসিব তার আপন কর্মফল বৈ আর কি হতে পারে?

কবি সুফিয়া কামাল তার প্রায় আশি-নব্বই বছর জীবনে মোট কতটি কবিতা রচনা করেছেন, তা কয়জন জানেন? তবে তার আটটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে উপলক্ষ করে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতার এমন প্রশস্তি খুব কমই কেউ করেছেন। এমন মুসলিম কবির ইবাদত হবে রবীন্দ্রসংগীত একথা তার পাঠকরা কোনোদিন কল্পনা করেনি। বিখ্যাত হওয়া মতো কবিতা না লিখেও তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। এ জন্য ভক্তদের প্রতি তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিলো। কিন্তু মন ভরেনি তাতে। আরও বিখ্যাত হওয়ার কুখ্যাত পথ হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো। পরিণতির সংবাদ সূচনাতেই যিনি জানেন সেই অনাদি অনন্ত আল্লাহর নিকট একথা অজ্ঞাত থাকে না, কার বংশের ধারা কখন কোনদিকে মোড় নেবে। এরপরও আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তিকে না বুঝার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

শামসুর রহমান যখন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, তখন হয়তো কেউ নিষ্পাপ শিশুর কানে আযানের ধ্বনি পৌঁছিয়েছিলেন। বিখ্যাত হওয়ার নানা পঙ্কিল পথে চলতে গিয়ে সেই শিশুটি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলো, তখন তার পঞ্চইন্দ্রীয় পাপের স্মরণ করিয়ে দেয়। মুসলিম নামের এমন নিকৃষ্ট উদাহরণ যে সমাজে বিদ্যমান থাকে, সেই সমাজের লজ্জাবোধ থাকা আর না থাকার কোনো পার্থক্য থাকে না।

আহমদ শরীফের প্রথম জীবনের লেখাগুলো যারা পড়েছেন, যারা তার ভক্ত ছিলেন তারা এখন নিজেকে অভিশম্পাত দেন এমন খোদাদ্রোহীকে ভক্তি করার

কারণে। তাকে আল্লাহ পাক যে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন, সেই জ্ঞান তিনি ব্যবহার করেছেন আল্লাহরই বিরুদ্ধে। তিনি তীর ছুড়লেন, সেই তীর আল্লাহ রক্ত মাখিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। তাই দেখে তিনি ভাবলেন লক্ষভেদ হয়ে গেছে।

বর্তমান সমাজে এই তীরন্দাজদের সংখ্যা আরও বেড়েছে। যারা আল্লাহ ও তার দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে আল্লাহ তাদের চক্রান্তের কুশলী জবাব দেন। সবাই ভাবছে তারা লক্ষভেদ করতে পেরেছে এবং আরো উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। আল্লাহ এদেরকে পাকড়াও করবেন একথা তারা বিশ্বাস করুক আর না করুক যথার্থই যখন আল্লাহর রীতি বাস্তবায়িত হবে তখন হতভাগারা উপদেশ বিতরণ করার সুযোগ পাবে না; তবে তাদের আপনজনরা ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথাই বলবে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও পরাক্রম সম্পর্কে যারা সংশয়হীন হতে পারেনি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী ও তার প্রচারিত দ্বীনই আল্লাহ পাকের একমাত্র মনোনীত দ্বীন এই সম্পর্কে যাদের চিত্ত দ্বিধান্বিত এবং পবিত্র কুরআনুল কারীম দয়াময়ের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কিতাব–এই সম্পর্কে যারা সংশয়হীন হতে পারেনি, তারা জাহেলিয়াতের পথে কামিয়াব হয়ে যাবে এবং আপন কীর্তির স্বাক্ষর দুনিয়াতে রেখে যাবে, যা দেখে মুমিন সত্য-মিথ্যার ব্যবধান নির্ধারণ করে পথ চলতে পারবে। আল্লাহর দ্বীনের সাথে সমান্তরাল হয়ে তাগুতের রচিত পথটিও চলমান থাকবে তবে মুমিন কোনোদিন এই পথে পা রাখবে না। কেননা দ্বীনের পথের ঠিকানা জান্নাত আর অন্যসবগুলোর ঠিকানা জাহান্নাম।

ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা তার জাতির কাছে যখন সম্মানিত হয়েছিলেন, তখন সেই সম্মান খুবই দুর্লভ ছিলো। মুসলিম বিজ্ঞানীরা একসময় পৃথিবীর মানুষের জ্ঞানচক্ষুকে উন্মোচন করেছেন। কিন্তু এ যুগে মুসলমানরা এই খ্যাতি থেকে একেবারেই বঞ্চিত। কুদরত-ই-খুদা আমাদের এই মুসলিম জনপদে বিরল সম্মান নিয়ে দীর্ঘদিন মানুষের স্মৃতিতে জাগরুক থাকতে পারতেন। কিন্তু তার নিজ নামের স্বাক্ষর বহনকারী শিক্ষাকমিশন রিপোর্টটি বারবার মুসলমানের অন্তরকে রক্তাক্ত করে তুলছে, কুখ্যাত পথ ধরে সেই কীর্তি হয়তো কেয়ামত পর্যন্ত পাপের অংশ বৃদ্ধি করে যাবে। সাপের মাথায় মনি থাকলেও তা ভয়ংকর।

মান ও সম্মানের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি যদি কাউকে সম্মনিত না করেন, তাহলে কোনো চেষ্টাই সফল হবার নয়। যাকে অসম্মান করতে চাইবেন সে বংশ পরম্পরায় ঘৃণিত হতে থাকবে, এইটুকু উপলব্ধিও যাদের নেই এমন নির্বোধদেরকে যদি একটি কাক নসিহত করে তখন বিস্ময়ের কিছু থাকে না।

এখন অনেকে খুব তাড়াতাড়ি কিছু করতে চাইছে। যা করার এখনি সময়, এই চিন্তায় অধীর হয়ে উঠেছে। নব্যরত্নদের পরামর্শসভায় ফন্দি-ফিকিরের তালাশ চলছে। মুখের ফুৎকারে দ্বীনের প্রদীপ কেউ কোনোদিন নেভাতে পেরেছে? দ্বীনের আলোর নিচে বসবাস করে যারা প্রদীপের সলতা ধরে টানাটানি করছে, তারা কি আগুনের ভয়ঙ্কর পরিণতিকে গ্রাহ্য করে না? বাবা-মায়ের দেয়া মুসলিম নামটা এখনও ধারণ করে আছে অথচ মুসলমানদের কলঙ্ক হয়ে দুনিয়ার জীবনটি কাটিয়ে দিচ্ছে। মুসলিম নামের দাবিদার অথচ দ্বীনের সীমারেখার ভেতর প্রকাশ্য বাগাওয়াতি; জন্মের পর আযানের ধ্বনি শুনেছে, মরণের পর জানাযার নামাজ পাবার আশা করছে। অথচ জীবনভর সীরাতুল মুস্তাকিমের উপর তস্করবাজি করছে, মুনাফিকের মতো হজ্ব, নামাজ, রোজা, যাকাতে অংশগ্রহণ করেছে আর আল্লাহর দুশমনদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভ্রাতৃঘাতী *কাবিল* হয়েছে। হয়ত সময় ফুরিয়ে যাবে না। যার যা নসিব তা পুরণ করার সময় অবশ্যই দেয়া হবে। আল্লাহ পাকের নিয়মনীতি আমাদের মতো নয়। তিনি দুশমনকেও দুশমনীর সুযোগ দিয়ে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দা মুমিন ও মুজাহিদ। শাহাদাতই যাদের আজীবনের কাম্য তাদেরকে সনাক্ত করতে যারা হায়েনার মতো ছোটাছুটি করছে, নেকড়ের ক্ষুধা নিয়ে পিছু নিয়েছে তারাও অনেক পথ এগিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার কৌশলের কাছে মানুষের কৌশল কিছুই নয়। তা সত্ত্বেও মানুষের কৌশলকে সুযোগ দেয়াই আল্লাহ পাকের রীতি।

একটি দু'টি ধোঁকা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। আমরা ধোঁকায় পড়েছি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত। শিক্ষা ও শিক্ষিত বলতে আমরা যা বুঝি সেটিও এক ধোঁকা। শিক্ষিত বলে আজ যাকে মাথায় নিয়ে নাচি কাল সে মাথার উপর প্রস্রাব করে দেয়। শিক্ষিত বলে যার গলায় মালা দিচ্ছি সেই মালার ফুল দিয়ে সে শিক্ষার *বেদীতে অর্ঘ্য* দিয়ে আসে। শিক্ষিত বলে আমরা যাকে সম্মান করি, তার কাছে আমাদের দ্বীনের মূল্য অতিসামান্য। কোনটা শিক্ষা আর কোনটা অশিক্ষা, এই কথাটি জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই বুঝবে। আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করে বহুবার বলেছেন, আমি এই মহান কিতাব নাযিল করেছি জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্য। আমরা কি জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ?

শিক্ষিতের মিথ্যাচার

আমার এক সহকর্মী প্রায় ত্রিশ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাশ করেছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি দক্ষতা ছাড়াও পণ্ডিত ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন। সবাই বলতো ডক্টর অমুক। অনেকে বলতো প্রফেসর সাহেব। যদিও

তার সুযোগের অভাবে ডক্টরেট ডিগ্রী নেয়া হয়নি। চাকুরি জীবনের শেষপ্রান্তে ভাগ্যচক্রে তিনি আমার দৈনন্দিন একান্ত সহকর্মী হয়েছিলেন। এই দায়িত্ব সমাপন করে অবসর জীবনে চলে গেলেন। চাকুরি জীবনের এই পর্যায়ে আমাদের যে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছিলো তার জন্য জ্ঞানবুদ্ধির খুব প্রয়োজন ছিলো। কেননা, এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিপক্ষ ছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কিছু শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। এদেরকে প্রতিপক্ষ না বলে সহকর্মীও বলা যায়। কারণ দীর্ঘদিন ধরে পত্র-পত্রাদির আদান-প্রদান, কথাবার্তা, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা পরস্পরকে খুবই চিনতাম। ফলে কোনো বিরোধ বা সঙ্কটকালে পরস্পরের সুসম্পর্ককে কাজে লাগাতে চেষ্টা করতাম। এসব ব্যক্তিদের সাথে আমাদের খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে আমরা সমীহ করতাম। কেননা তারা প্রকৃত ও বাস্তব অর্থেই শিক্ষিত ও জ্ঞানী ছিলেন। এমন ক্ষেত্রে আমরা প্রফেসর সাহেবকে সহকর্মী হিসেবে পেয়ে বেশ আশান্বিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আমার আশা ভঙ্গ হতে শুরু করলো খুব দ্রুত। কিছুদিন কাজ করার পর পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি শুরু হলো, *যতো গর্জে ততো বর্ষে না*।

শিক্ষিতদের দেখলে করুণা হয়। শিক্ষিতের লেবাস পরতে গিয়ে এরা জীবনের বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে। প্রাইমারী থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটির দীর্ঘপথ ও বিশাল এলাকা পাড়ি দিতে জীবনের সিকি শতাব্দী সময় ব্যয় করে দিয়ে যা শিখলো, তাকে যৎসামান্য বলতেও মন সায় দেয় না। এসব শিক্ষিতদের নিয়েই আমাদের সময় কাটে। সারাজীবন এরা যতো বইপুস্তক বহন করে শিক্ষাঙ্গনে গেছে তাকে ওজন করলে বিশ্বাস করা মুশকিল হবে, এদের মস্তিষ্ক কি করে এতো জ্ঞান ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলো! অথচ এই শিক্ষিতদের জ্ঞানবুদ্ধির সংস্পর্শে এলে বিস্মিত হতে হয়, এরা এই দীর্ঘ শিক্ষাজীবনে কী করেছে, যদি পাত্রের তলানিটাও দেখা না যায়! একেবারে খালি হাতেই কি ফিরে এলো এতো হাতি-ঘোড়া মারার পর?

এদেরই পাশাপাশি আরেকটি শিক্ষাঙ্গনে কালস্রোত বেয়ে নীরবে নিভৃতে অন্য একটি অনাড়ম্বর হতদরিদ্র জ্ঞান-তাপস শিক্ষার্থীর দল পথ চলছে, তাদের সান্নিধ্যে গেলে শ্রদ্ধা ভালোবাসায় মন সিক্ত হয়ে আসে। সময় যতোটুকু পাওয়া যাবে তা অতি মূল্যবান, তার প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত যেন বৃথা না যায়, প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু সঞ্চয় করা চাই। সাধনা কঠিন হলেও তা সাধ্যের অতীত নয়। যতোটুকু জ্ঞানকে মানুষের আয়ত্তের অধীন করে দেয়া হয়েছে তার জন্য কষ্ট, কৃচ্ছতা, পরিশ্রম ও সাধনার বিকল্প নেই; জীবনের সঞ্চয় শুধু ইহকালীন নয়- পরকালীনও। জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য বিপনন নয়, জ্ঞানকে পণ্য

করে অর্থ ও সম্পদকে স্তুপকৃত করার বাসনা নয়, বরং জ্ঞানের অমূল্য সম্পদ নিয়ে দুনিয়ার বাজারে চলাফেরা করে আখিরাতকে খরিদ করে নেয়া জরুরি। এমন দীক্ষার ব্রত নিয়ে যারা তাদের ভুবন রচনা করেন, সেখানে বিলম্ব হলেও ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় মিথ্যা ও প্রহসনের জগতকে পেছনে ফেলে রেখে।

তথাকথিত শিক্ষার বড়াই শুধু মিথ্যাচারেই শেষ নয়, এই বড়াই যতো করে মুখে ততো নামছে নিচে। আর্তের সেবা করার মহান বাসনা নিয়ে ডাক্তারি পড়ে ডাক্তার হওয়ার পরই শুরু হয় বিত্তের সেবা। প্রতিটি ঘণ্টার হিসাব চাই, বিনিময় পাওয়া চাই, লেনদেন পরিস্কার চাই, যা দেবো তার বহুগুণ ফেরত চাই, শিক্ষার পাল্লায় ওজন যাই থাকুক সনদের পাল্লায় ওজন তো বেশি আছে। অতএব অগ্নিমূল্য দিয়ে তাকে পেতে হয়।

দুনিয়ার বাতচিতই আলাদা। এখানে নসিহত করতে চাইলে নসিহত শুনে আসতে হয়। এখানে যে মারে তার নাম রোগ, যে বাঁচায় তার নাম ডাক্তার। সুতরাং হিসাব-নিকাশ নগদ দিয়ে যাও। উকিল-মোক্তার, মামলা-মোকদ্দমা বিচার-আচার সবখানে শিক্ষিতের শিক্ষারমূল্য আগে শোধ করে দিতে হবে। এসব শিক্ষা এমন মূলধন যা কখনও শেষ হয় না। হাজারবার কেনাবেচা হচ্ছে, ক্রেতারা ঠকছে, তবু বিক্রেতার ব্যবসা জমজমাট হচ্ছে। প্রকৌশলী, শিক্ষক সবাই চায় প্রতিষ্ঠা, মূলধন তাদের শিক্ষা। শিক্ষার বিনিময়ে অর্থ আর বিত্তের প্রতিষ্ঠা চাই। কমমূল্যে শিক্ষার বিনিময়ে বহুমূল্যের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য চাই। যে শিক্ষার পেছনে কোনো সাধনা নেই, যার কোনো গুণগত মান নেই, তার বিনিময়ে শিক্ষিতরা যা দেয়, তারও গুণগত কোনো মান নেই। তাদের এই দেয়া নেয়া দুই-ই ফাঁকি; ফাঁকির বদলে ফাঁকি।

শিক্ষিতদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াদারি। দুনিয়াদার শিক্ষিতরা তাই দ্বীনদার শিক্ষিতদের খোঁজখবর রাখে না। দুনিয়াদারির শিক্ষাকেই তারা একমাত্র শিক্ষা মনে করে। এই শিক্ষা ছাড়া মানবজনম বৃথা ও অচল মনে করে।

আমার এক বন্ধু ইউরোপ-আমেরিকার মুখাপেক্ষী না হওয়াকে আত্মহত্যার শামিল মনে করেন। কারণ ওরা পৃথিবীকে আলোকিত করেছে, গতিকে দ্রুত করেছে, জীবনকে সুখী ও স্বচ্ছন্দ করেছে। তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়, দেড় হাজার বছর আগে বিজলিবাতি ছিলো না, গতি এতো দ্রুত ছিলো না, জীবন এতো স্বচ্ছন্দ ছিলো না; তবু খেজুর পাতায় ঢাকা কুঁড়েঘরের বাসিন্দাদের নিভু নিভু প্রদীপ জ্বলা ঘরগুলো থেকে যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটেছিলো, তাতে সারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠেছিলো; তাঁদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনার জন্য পৃথিবীর অপরপ্রান্তের মজলুমরা অপেক্ষায় উদগ্রীব রাত কাটাতো; না জানি কখন রাঁতের আঁধার চিরে অশ্বারোহীর তরবারি চমকে উঠে।

জীবন সুখী ছিলো। কেননা ডাক্তার রোগীর সন্ধান করে হয়রান হয়ে যেতো, দানকারীরা গ্রহণকারী না পেয়ে যাকাত নিয়ে ফিরে আসতো। জীবন স্বচ্ছন্দ ছিলো, বিপন্ন ছিলো না। কারণ মানুষ সিরিয়া থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত একাকি পথ পাড়ি দিতো, পথে হিংস্রপ্রাণী ছাড়া অন্যকোনো ভয় ছিলো না।

আমার বন্ধুকে মনে করিয়ে দিতে হয়, সেদিনের শিক্ষাই সেসব জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো। তাকে ধারণ করে পশ্চিমের অসভ্য জাতিগুলো সভ্য জগতে ফিরে এসেছে, অন্যথায় তারা বহু আগেই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতো কিংবা বনমানুষ হয়ে জঙ্গলে বসবাস করতো। পাশ্চাত্যের একান্ত অনুরাগী বন্ধুকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়, তার নিকট পূর্বপুরুষরাও এতো হীনমন্যতায় ভোগেননি; তারা আত্মসচেতন ছিলেন, মূর্খ হয়ে শিক্ষিতের ভান করতেন না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দু'টিই ছিলো তাদের কাছে সম্মানিত। সে জন্য শিক্ষা তাদেরকে দিয়েছিলো মর্যাদা, জীবনযাপনে প্রকৃত সম্মান।

আজ সমাজে শিক্ষিত বলে যারা সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী, তারা আপন জগতেই পলাতকের জীবনযাপন করে। মসজিদে আযান হলে অন্যকোনো কাজের উসিলা খুঁজে। কুরআনুল কারীমের অক্ষরগুলোর সাথে কোনো পরিচয় নেই। নিজের নেই তাই পরিবারের অন্যদেরও নেই। জামাতে কোনো সময় দাঁড়িয়ে গেলেও নিজে জামাত পরিচালনা করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। অথচ যে নামাজ পড়বে সে নামাজ পড়াবেও। সবখানেই নির্ধারিত ইমাম নামাজ পড়াবেন, নিজের যাতে কদাচিৎ কোথাও এই দায়িত্বের আঞ্জাম দিতে না হয়, সেটাও নিশ্চিত করা আছে। দ্বীনের কোনো কাজেই শিক্ষিতরা সামনে নেই; যাদেরকে তারা শিক্ষিত মনে করে না তাদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। দ্বীনকে জীবন থেকে এখনও পুরোপুরি বিদায় করে দিতে পারেনি, তাই যতোটুকু মানছে তার সবটাই দ্বীনের শিক্ষায় শিক্ষিতদের সাহায্যেই পালন করে নিচ্ছে।

দ্বীনি ইলম হাসিল করার জন্য একজন মানবসন্তানকে জীবনের উষালগ্নে দরসের আঙ্গিনায় পা রাখতে হয়। বয়স তো মাত্র হাঁটি হাঁটি পা পা। তখনই শুরু হয় পূত-পবিত্র জীবন গঠনের নিরলস মেহনত। শুরু হয় যাত্রাপথ। যে পথের পাথেয় হয় কামনা-বাসনা, হিংসা-বিদ্বেষকে জয় করার কঠিন শপথ। যে পথে অর্জিত হয় এক ও অদ্বিতীয় প্রভুর একনিষ্ঠ ভৃত্য হবার গৌরব। কত ভাগ্যবান এই পথের পথিক! ভাগ্যবান তাদের পিতামাতারা; জগতের হাজারো ভ্রান্তি তাদেরকে বিভ্রান্ত করেনি। দয়াময়ের মনোনীত দ্বীনের পথটির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন আপন ঔরস ও গর্ভজাত সন্তানদের। তাদের চিন্তা কত মহৎ আর যাত্রা কত শুভ! সন্তানের হায়াতে তাইয়্যেবার জন্য তাদের প্রার্থনা যেন কবুল হয়েছে এই সান্ত্বনা নিয়ে তারা দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। সন্তানকে জাহান্নামের পথ ধরে

তীরবেগে ধাবমান দেখে আফসোস করতে করতে তাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে হয় না।

পিতা-মাতার বিনিদ্র রাতের প্রার্থনার ফসল দ্বীনের পথের পথিককে কারা গালি দেয়? কারা তাদের ভ্রুকুটি করে? কে তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে? তা নির্ধারিত হয়নি। এমন ধৃষ্টতা তার দ্বারাই সম্ভব, যার কাছ থেকে দ্বীনকে বরণ করার মালা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। যার মাথা থেকে মেহেরবানির তাজ খুলে নেয়া হয়েছে। তালেবে ইলম তো সেই হবে, যে তালেবে মাওলা হবে। মাওলার সন্ধানকারী মাওলার দ্বীনের মাঝে তাকে খুঁজে ফিরে। দ্বীনের ইলম তাকে তার মাওলার দিকে ধাবিত করে। এই ইলমই তাকে তার মাওলাকে পাবার জন্য ব্যাকুল করে তুলে। মাওলাকে সন্ধান করেনি যারা আর মাওলার সন্ধানে যারা তালেবান উভয়ের পথ দুনিয়াতেও এক নয়, আখিরাতেও এক নয়। তালেবান আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ায় গালিব করে। আর দ্বীনহারারা দ্বীনের দুর্দিন ডেকে আনে।
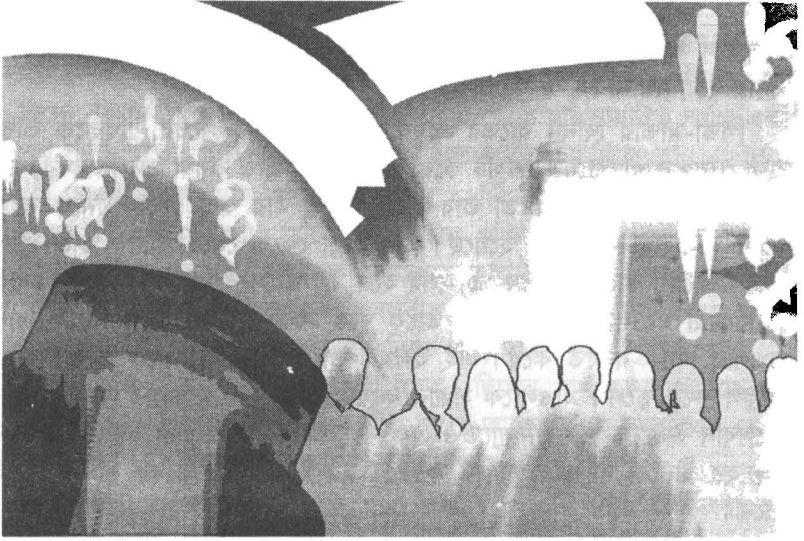
ইসলাম দর কেতাব মুসলমান দর গোর

ইসলামিক ফাউন্ডেশন সীরাতুন্নবী বই মেলায় হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। মাগরিবের আযান হলে আমরা মসজিদের দিকে চললাম। কিন্তু কিছু লোক তখনো আশেপাশের বাগানে বসে গল্প করছে। একজন সাথী তিনজন লোককে দেখিয়ে বললেন, এরা কাদিয়ানী। এরা সারাদিন এবং প্রতিদিন মসজিদের চত্বরে বসে থাকে, নানান জায়গা থেকে আসা আগন্তুকের সাথে কথা বলে। শুধু নামাজের সময় বাইরে ঘুরে বেড়ায়। তাই লজ্জাকর হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররম এখন বহু শ্বাপদের অভয়ারণ্য।

জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামের কিছু শত্রু ছিলো। মুসলমানদের দুর্ভাগ্য হলো, তাদের শত্রুর একদল মিত্র আছে, যারা ইসলামের ছায়াতলেই আশ্রিত। শত্রুর বিপদ তো জানাই আছে বরং অনেক শত্রু মিত্র হয়ে মুসলমানদের বিস্মিত করে দেয় এবং এভাবেই ইসলামের পবিত্র আঙ্গিনা দিনে দিনে প্রশস্ত হয়েছে। কিন্তু ঘরের ভেতর মাটির নিচে যদি সাপের বাসা থাকে, তাহলে বাঁচতে হলে দুই জনের একজনকে মরতে হবে। মানুষকে বাঁচতে হলে স পকে মরতে হবে। তাই ঘরে-বাইরে দুই শত্রুকে মোকাবেলা করা মুসলমানদের জন্য অবশ্যম্ভাবী জেনেই প্রথম থেকে সর্বশেষ সাহাবীর প্রত্যেকেই ছিলেন মুজাহিদ। ওইসব জলীলুলকদর সাহাবীর প্রতিবিন্দু রক্ত যাঁর জন্য কুরবান ছিলো, তিনিও ছিলেন সাহিবুস সাইফ-

তরবারিওয়ালা নবী। ওই সব মুবারক চেহারাকে দেখে অসংখ্য মুশরিক দ্বীন কবুল করেছে। সেই সুন্দরতমের মুবারক হস্ত তরবারি কোষে আবদ্ধ করা তো দূরের কথা বরং কেয়ামত পর্যন্ত তা কোষমুক্ত রাখারই অসিয়ত করে গেছেন।

আমরা যখন বলি *জাগো মুজাহিদ* যার অর্থ এই নয়, মুজাহিদ ঘুমিয়ে আছে। বরং এ শুধু এক প্রহরীর অন্য প্রহরীকে হুঁশিয়ার করা মাত্র। অন্যরা যখন ঘুমে অচেতন, তখন একে অন্যকে হুঁশিয়ার করতে মুজাহিদরা জাগো ধ্বনি দিয়ে নিজেদের উপস্থিতিকে জানান দিচ্ছে। পক্ষান্তরে তারা এ কথাই বলছে, আল্লাহর দুশমনরা হুঁশিয়ার! তাগুতের বন্ধুরা হুঁশিয়ার!

কিছু মুসলমান নিজেদের অজাতশত্রু মনে করে। আপন ঘর-দুয়ার উন্মুক্ত রেখে বান্ধবদের বসতভিটায় অবাধে ঘুরে আসে। এটা তাদের আত্মঘাতী সাফল্য। আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনকে পরিত্যাগ করার পুরস্কার। আল্লাহ পাকের আইন কানুনকে না মানার কৃতিত্বের প্রতি আল্লাহর শত্রুর স্বীকৃতি। আল্লাহর আইনকে মানতে প্রস্তুত নয় এমন যে কেউ আল্লাহর শত্রু। সে বিশ্বাসী হোক কিংবা অবিশ্বাসী। তারপরও আমরা অজাতশত্রু? বরং ঘরে বাইরে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত আমরা। ইসলাম মানেই ঈমানের পর আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালন। যেখানেই এই আদেশ নিষেধের বাস্তবায়ন সেখানেই এই বিরোধিতা ও অমান্যকারীর মোকাবেলা। ঈমান না আনার বিরোধিতা তো আছেই। তাদের সাথে ইসলামের শত্রুতা থাকবে এটাই বাস্তবতা। অতএব যার শত্রু থাকবে তার শক্তি থাকা অপরিহার্য। মুসলমানদের শক্তি যারা কামনা করে না তারা শত্রু পক্ষের কেউ হবে এতোটুকু বোধ ঈমান রক্ষাকারীদের থাকা উচিত।

জোর করে, যুদ্ধ করে বিশ্বাসকে চাপিয়ে দেওয়ার নাম ইসলাম নয়। আবার নিলামে বিক্রি করার মতো সম্পদও নয় ইসলাম। জীবন দিয়ে এর হেফাজত করতে হয়। আমানত যেখানে সেখানে গচ্ছিত রাখা যায় না। বিশ্বাসের মতো আমানত একমাত্র ইসলামের হেফাজতেই নিরাপদ। সেজন্য মানুষ চিরকাল আল্লাহকে সিজদাহ করতে পেরেশান হয়ে ছুটে এসেছে। তরবারির নিচে দ্বীনকে ছিনতাই করা যাবে না। পার্থিব লেনদেনের মূল্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। এইসব কঠিন শর্ত মুখের কথায় কেউ মানবে না। যে জিনিস যতো মূল্যবান তার হেফাজতের উপকরণও ততো শক্তিশালী। যদি মানুষের হুকুমত কায়েম করতে এতো পুলিশ-দারোগা সিপাহী-সান্ত্রীর প্রয়োজন হয়, তাহলে আল্লাহর হুকুমত কায়েম করতে একদল মর্দে মুজাহিদের কেন প্রয়োজন হবে না? শত্রু থাকলে প্রহরীও থাকবে।

ইসলাম নসিব হওয়া ভাগ্যের কথা, তবে ইসলামের মর্মার্থ বুঝে না আসা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। নবীজীবন আর কুরআন, এই তো ইসলাম। যার সবটাই

জুড়ে রয়েছে ইকামতে দ্বীনের জন্য কঠোর সংগ্রাম। সূরা কাফিরুন মসজিদের ইমাম সাহেব যখন নামাজের মধ্যে তেলাওয়াত করেন তখন যে প্রতিক্রিয়া হবে দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারীরা মুশরিকদের কাছে তা পেশ করলে আরেক প্রতিক্রিয়া হবে। যার অন্তর প্রশস্ত, তার এক প্রতিক্রিয়া আর যার অন্তরে বিদ্বেষ রয়েছে তার প্রতিক্রিয়া এমন হবে, সে জানের দুশমন হয়ে উঠবে তখন। অতএব যেখানে ইসলাম থাকবে, ইসলামের প্রতি আহব্বান থাকবে, সেখানে অবধারিতভাবে আত্মসমর্পন, একনিষ্ঠ আত্মনিবেদন থাকবে। অনিবার্যভাবে সেখানে শক্রর উপস্থিতিও থাকবে। তাই ইসলামের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন নবী, বাস্তব অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া নবী, সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানসম্পন্ন নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে যাবার সময় জিহাদের কার্যক্রমকে এতোটুকু শিথিল করে যাননি।

ইসলামকে দেখেছি অন্ধের হাতি দেখার মতো

এমন কোনো মসজিদ পাওয়া যাবে না, যেখানে ঈমান আমলের তালিম হয় না। যেখানে যখন সুযোগ হয় বসে পড়ি। একসময় তো এই জামাতে মজেই গিয়েছিলাম। নবীওয়ালা কাজের কথা শুনতে কার না ভাল লাগে। কিন্তু কেবলমাত্র দাওয়াতের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করার অধিকারে আমি নিজেকে শতভাগ সোপর্দ করতে পারলাম না। নবী জীবনের কোনো কাজই বাদ দিতে আমার মন চায় না। কেননা, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনের মুখোমুখি হওয়ার কামনা আমি অবশ্যই করতাম।

আফগানিস্তানে তখন বারুদের আগুন জ্বলছে। কান উদগ্রীব হয়ে থাকতো দাওয়াতের সাথে জিহাদের জন্য তালিম শুনতে। কিন্তু জামাতের কেউ আমাকে তা শুনালো না। কিন্তু তবুও আমি তাদেরই একজন।

এদেশের বহুলোক আজমির যান। দু'একজন অতিবড় দরবেশ পত্রিকায় বিশাল বিজ্ঞাপন দিয়ে আজমির রওনা হন। অপরদিকে প্রতিবছর আজমির থেকে মানিঅর্ডারের খালি ফর্মসহ বহু চিঠি আসে। আর আজমিরের তীর্থযাত্রীরা সকল ধর্ম নির্বিশেষে একত্রিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। ওখানে মুসলমান পুণ্যপ্রার্থীরা নিয়াজ-নজর ও তবারক দেওয়া ও নেয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আসলে তারা কি পেলো আর কারা কি হারালো, তা তাদের বুঝার ইচ্ছা নেই, বুঝার ক্ষমতাও নেই।

এছাড়াও যে যেখানে বয়াত হয়েছি ও অজিফা নিয়েছি সেখান থেকে নড়াচড়ার কোনো উপায় নেই। চরমোনাইয়ের পীর-মুরিদ ছাড়া আজ পর্যন্ত কাউকে আন্দোলনে নামতে দেখিনি। পীর-মুর্শিদের কাছ থেকে মুরিদরা চোখ

বন্ধ করার রীতিনীতি জানতে চায়, চোখ খুলে দেয়ার জন্য কারো কাছে ছুটে যায় না! অবশ্য চোখ খুলে দেয়ার জন্য কুরআনুল কারীমই যথেষ্ট।

সাতান্ন বছর বয়স পার হওয়ার পর একজন সহকর্মী অবসর নিলেন। এখনো বেশ কর্মক্ষম। বিদায়লগ্নে অনেকেই পরামর্শ দিলেন, অবসর জীবনকে অযথা নষ্ট না করে কোনো কাজে লেগে যেতে। আসলে চাকুরী করা তো চাকরের কাজ, হোক তা যতো বড় চেয়ার টেবিল অলঙ্কৃত। চাকুরী জীবনের চাকর স্বভাবটা অনেকেই ছাড়তে পারে না অবসরকালেও। চাকুরীকালীন দীর্ঘ সময়টা কেটে যায় ছকে বাধা নিয়মে, তখন দ্বীনদারিও সেই ছকে আবদ্ধ থাকে। হয়তো নামাজ পড়া, রমজানের রোজা রাখা, ঈদে আনন্দ, সুখে-দুঃখে মিলাদ এবং এ করেই দয়াময়ের দেওয়া শতসহস্র দিনের হালখাতা শেষ হয়, বাকি সব থাকে ফাইলপত্রে ঠাসা। কর্মজীবন বা অবসরজীবন কোনোটাই যদি ইকামতে দ্বীন বা ফি সাবিলিল্লাহর জন্য নিবেদন করা না যায়, তাহলে জীবনের মূল্য কী থাকে? চাকুরীজীবীদের জীবন-দর্শনই এমন, তাদের পক্ষে ইসলামের জীবন বিধান পর্যন্ত পৌঁছাটাই মুশকিল। কেননা, যার কাছে পথই অজানা, সে ঘরে থাকাই পছন্দ করবে।

একদল লোক ইসলামকে বুঝেছি একভাবে, আরেকদল বুঝেছি আরেকভাবে। এমন হওয়ার কারণ কি? ইসলামের রূপ তো একটাই এবং শাশ্বত ঐ রূপটা দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল ও উন্মুক্ত। তবে কি আমরা ইসলামকে অন্ধের হাতি দেখার মতো দেখছি? যে যতোটুকু ধারণ করলাম অতটুকুই ইসলাম–এর বাইরে আর কিছুই নেই, যদি থাকে তবে তা অন্যকিছু, এমন ধারণার শিকার নই কি সবাই? আমাদের আকাবিরে দ্বীন যুগ যুগ ধরে যে পথে চলেছেন, তার উপর কি এখন আমরা আছি? আমাদের অনুসরণীয় যুগ হলো নবী জীবনের যুগ। আমাদের অনুসরণীয় মানবমণ্ডলী সে যুগেরই জলীলুলকদর সাহাবী আজমাইন রাযিআল্লাহু আনহুম। মক্কী যুগ ঈমানের যুগ, মাদানী যুগ ঈমানসহ অবশিষ্ট সবকিছুর যুগ। মাদানী যুগ হুকুম আহকাম, আদেশ-নিষেধ, স্বদেশ-বিদেশ, ঘর-সংসার, ব্যবসা-বাণিজ্য, জিহাদ-কিতালের যুগ। মক্কার পরিসর ছিলো দাওয়াতের; মদীনার পরিসর ছিলো দাওয়াত, তাবলীগ ও ইকামতে দ্বীনের; তাই মক্কার যুগ থেকে দ্রুত আমাদের মদীনার যুগে যেতে হবে পূর্ণতার জন্যে। মাদানী জীবনে পৌঁছতে বিলম্ব হলে, ইকামতে দ্বীনের সংগ্রামে শামিল হতে বিলম্ব হবে, হতে পারে বেশি বিলম্ব হলে এসব থেকে মাহরূম থেকেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।

যারা শৈশবে দরসের পবিত্র আঙ্গিনায় জীবন কাটিয়েছেন, কুরআনুল কারীমের হরফের উপর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছেন, তারা তেইশ বছরের নবুওত জীবনকে হৃদয়ের ক্যানভাসে পরিপূর্ণ দেখতে পান, দয়াময়ের মনোনীত দ্বীনের

উদ্দেশ্য যথার্থই বুঝতে সক্ষম হন। জাবালে নূরের গুহায় যিনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তিনি অহী আসার পর যাত্রা শুরু করলেন– আর কোনোদিন থেমে থাকার সুযোগ পাননি; জাবাল সাওর অতিক্রম করে যাঁকে হিজরত করতে দেখা গেলো, তিনিই মদীনা হয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন দশ সহস্র সাহাবীকে সাথে নিয়ে। দক্ষিণে হুদাইবিয়ায় শত্রুর সাথে অসম সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেই উত্তরে চিরশত্রু ইহুদিদেরকে যিনি চরমপত্র পাঠিয়েছিলেন তাঁর দিকে ইতিহাস যুগে যুগে বিস্ময় নেত্রে তাকিয়ে থেকেছে। এই প্রজ্ঞা, এই কালজয়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর প্রতি ইতিহাসের বিস্ময় কোনোদিন কাটেনি।

তায়েফের পাহাড়ী পথে যাঁকে পাথর মারা হয়, তাঁকে মোকাবেলা করতে গিয়ে বদরের প্রান্তরে সত্তরজন দুর্ধর্ষ বীরকে জাহান্নামে নিক্ষেপিত হতে হয়। মক্কার অলিতে গলিতে যিনি তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, তিনিই কাইসার ও কিরসাকে ইসলাম কবুল করার জন্য পত্র পাঠিয়েছেন। একশত চৌদ্দটি সূরা ও এক মহান নবী জীবন জুড়ে যে ইসলামের ব্যাপ্তি, তাকে পূর্ণভাবে ধারণ করার অঙ্গীকার করতে হয় মুসলমানকে। ইসলাম যার নসিব হয়, তাকে ইসলামের নিঃসীম উদ্যানে নিঃশঙ্কোচে চলার তাওফিকও দেওয়া হয়। ঈমানের দাওয়াত থেকে শুরু করে জিহাদের ময়দান পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া তখনি সম্ভব হয়, যদি দ্বীনকে তার পূর্ণকলেবরে দেখার ও বোঝার সৌভাগ্য হয়। আর এমন সৌভাগ্যবান তারাই, যারা আল্লাহর কিতাবের উপর চোখ রেখে জীবন কাটান। এরাই পরম সৌভাগ্যবান।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিক্রিয়া এক, আমাদের আরেক

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, কোদালকে কোদালই বলবে, অর্থাৎ স্পষ্ট কথা বলবে। মুসলমানকে অন্য জাতির সাথে সহবস্থান করার নসিহত করতে গিয়ে অনেকে সূরা কাফিরুনের সর্বশেষ লাইন তরজমা করে শুনান : *তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার।* আবার তফসীর করে বলেনঃ *যার যার ধর্ম তার তার কাছে।*

যে দেশের অধিবাসীর শতকরা নব্বইজন মুসলমান, কিন্তু কুরআন পড়েন মাত্র কয়েকজন, সেই দেশে আয়াতে কারিমার এই দুর্দশা হবে এটাই স্বাভাবিক। সূরার শেষ আয়াতের উচ্চারণ প্রায়শ শোনা গেলেও প্রথম আয়াটির দিকে নজর দিতে কমই দেখা যায়। সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে *কাফিরুন*। শুরু হয়েছে কাফেরদের সম্বোধন করে *বলুন, হে কাফেররা! তোমরা যার ইবাদত করো আমি তার ইবাদত করি না*। অত্যন্ত স্পষ্ট সম্বোধন ও ঘোষণা। এই সম্বোধন ও ঘোষণাকে উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে এবং এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই।

আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত দ্বীনের ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে কোনো রাখঢাক নেই। আল্লাহ্ পাক যাকে যে ভাবে সম্বোধন করেছেন, সেইভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর অনুসারীদেরকে স্পষ্ট উচ্চরণ করতে বলেছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি? আমাদের জিহ্বায় জড়তা সৃষ্টি হয়েছে, এমন কোনো মহামারিও তো দেখা দেয়নি। হতে পারে মানসিক কোনো রোগের প্রভাবে আমাদের উচ্চারণ পাল্টে গেছে। স্পষ্ট উচ্চারণ আমরা এখন করতে পারি না, অস্পষ্ট উচ্চরণে অন্যকিছু বলি যে কথা আল্লাহ্ বলেননি, বলতে বলাও হয়নি। কোনো অজুহাতে আমরা কি পবিত্র কালামের যে কোনো রীতির বিকল্প চিন্তা করতে পারি? মুসলমানের এসব চিন্তার আগে মৃত্যু হওয়া উচিত।

যারা মুসলিম নয়, তারা সবাই অমুসলিম। কিন্তু কুরআনুল কারীম মুসলমানদের বার বার বিশ্বাসী বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং যারা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তারা সবাই অবিশ্বাসী। অমুসলিমের বেলায় অবিশ্বাসী পরিভাষা ব্যবহারে আমরা দ্বিধা করছি। আরবি আমাদের মাতৃভাষা নয়, যদি হতো তখন কি আমরা ঐ পরিভাষাকে নিয়ে খুব মুসিবতে পড়তাম? যদি এতে কোনো হেকমত থেকে থাকে, তাহলে এইসব কারণও তার মধ্যে নিহিত আছে!

অথচ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে : *আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারা যারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না।* - সূরা আনফাল : ৫৬

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমানরা আল্লাহ্‌র এমন উক্তিকে যদি পছন্দ করতো, তাহলে দ্বীনকে গালিব করার সৈনিকদের সাথে দুশমনি করার ধৃষ্টতা দেখাতো না। আমরা তো সেই হতভাগ্য মুসলমান, যারা আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীনকে জমিনে প্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থতা নিয়ে কবরে যাবো। আল্লাহ্‌র বিধানকে জমিন থেকে উচ্ছেদকারীদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে কেয়ামতের দিন নিজেদের নিরপরাধী বলে ফরিয়াদ করবো বলে চিন্তা-ফিকির করছি।

কিন্তু কিতাবের সান্নিধ্যে জীবনযাপনকারী সত্যাশ্রয়ী মুমিনরা নির্লিপ্ত হতে পারেন না; তাদের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণও হতে পারে না, অন্ধকারকে আলো বলতে পারেন না, কালোকে সাদাও বলতে পারেন না। শত মুসিবতেও তাদের সত্য উচ্চরণ নিস্তব্ধ হতে পারে না। আপন সন্তানের অপরাধও ক্ষমা করতে তারা অনড়, আপোষহীন। সাধারণ মুসলমান তাদের ভাই ও সন্তানতুল্যই বটে। অথচ চারিদিকে যেন কবরের নীরবতা বিরাজ করছে। অশরীরী শয়তানের কোলাহল সর্বত্র।

সুদের হাট বসিয়েছি আমরা, তবু আমাদের সুদখোর বলে কেউ একটু কটাক্ষও করে না। মদকে হারাম করেছেন আল্লাহ্ আর আমরা মদকে হালাল

করেছি আমাদের জাতীয় এয়ারলাইনের পৃথিবী জোড়া নেটওয়ার্কে। আমাদের সীমালঙ্ঘন এতোদূর বিস্তৃত, যাদের দিয়ে মদ পরিবেশন করাই, তাদের জন্য আরেকটি অপরাধও অত্যাবশ্যকীয় করেছি তারা নবীজির সুন্নত পালন করতে পারবে না- দাড়ি রাখা তাদের জন্য নিষিদ্ধ। এই জুলুমের জন্য কাউকে জালিম বলা যাবে না! কুরআনের পরিভাষাকে মুসলমান কেন ত্যাগ করলো? মুজাহিদের নাম শুনলে একদল মুসলমান তাকে খুঁজতে বের হয় কেন? সেজন্যই কি জিহাদ বলতে এখন আর ওহুদ বুঝায় না, বদর বুঝায় না, বুঝায় অন্যকিছু? অথচ জিহাদকে বাদ দিয়ে নবী জীবনের অনুসরণ সম্ভব নয়। কুরআনের বক্তব্যকে সামনে রেখেই মুসলমানকে পথ চলতে হয়, তাই যেকোনো অজুহাতে কোনোরকম কাটছাট অবশ্যই পথচ্যুতিরই কারণ।

আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তার কোনো ব্যত্যয় ঘটানো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যাকে যেভাবে সম্বোধন করেছেন তার জন্য তাই শোভনীয়, তা কারো ভাল লাগুক অথবা না লাগুক। মানবজাতির এমন কোনো শ্রেণী নেই, এমন কোনো কর্ম নেই যার আলোচনা কুরআনে করা হয়নি। এসব আলোচনায় সৃষ্টিকর্তা তাঁর যথার্থ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। দয়াময়ের বিশ্লেষণে সর্বোত্তম এবং উপযুক্ত পরিভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে যা প্রযোজ্য, যার প্রতি যা যথার্থ। আমাদের ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কোনো অবকাশই সেখানে নেই। আল্লাহ্ যাকে জালিম বলেছেন তাকে আলিম মনে করার সৌভাগ্য হয় আরেক জালিমের। আল্লাহ্ যাকে কাফের বলেছেন তাকে কোনো বান্দা মুসলিম বলতে পারে না। এ সহজ কথাগুলো আমরা কেন বুঝি না?

আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত দ্বীনকে যাঁরা আপোষহীনভাবে মেনে চলেন, তাদের এখন নামকরণ করা হয়েছে *মৌলবাদী*। দ্বীনের উপর যারা দৃঢ়পদ, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তার দুশমনরা তা অতিক্রম করতে পারে না। দ্বীন আমাদের কাছে না কোনো দুর্বোধ্য বস্তু, না কোনো তামাসার পাত্র। তাই কলাম লেখিকা আনোয়ারা সৈয়দ হকের ভক্ত পাঠক আমরা হতে পারি না। ইসলাম বিদ্বেষী এ লেখিকার কিছু উক্তির নমুনা দেখুন :

১. তালেবানরা এর আগে বহু ফরমান ওদের দেশে জারি করেছে, সবই তাদের দেশের নারীদের বিরুদ্ধে।

২. এবং তাদের নিজেদের যখন তখন খায়েশ মেটাবার ভাণ্ড হিসেবে নারীদের ব্যবহার।

৩. নারী হচ্ছে আফগান তালেবানদের কাছে বিষম রসালো এক খাদ্যবস্তু, এ সকল খাদ্য বস্তু তারা সর্বক্ষণই ইচ্ছা হলেই খাবে আবার রিপু চরিতার্থের পর স্বর্গেও যাবে।

৪. আসলে নারীদের খুবই ভালোবাসে তারা। তাই একথা ঠিক নয় যে, নারীরা তাদের দেশে অবাঞ্চিত বরং নারীশূন্য তালেবান মানে তালেবান শূন্য আফগান।

৫. তালেবানরা হচ্ছে নারী নিপীড়নের মডেল ইত্যাদি।

পাঠক জেনে রাখুন সৈয়দ শামসুল হক লিখেছিলেন *খেলা রাম খেলে যা*। সেই পর্ণলেখকের স্বনামধন্য স্ত্রী আনোয়ারা হকের লেখা কতো কুৎসিত! অথচ মৃত্যুর পর এরাও বাড়িতে মিলাদ কুলখানি ইত্যাদির আয়োজন করে। পত্রিকায় এদের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে লেখা হবে *ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন*– মানে, আল্লাহর নিকট থেকেই আগমন আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন।

মুসলমান পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়ে আগমন হয়তো মুসলমান হয়েই হয়েছে। তাহলে তাদের কলম কিভাবে *খেলারাম খেলে যা*, ধর্মবিদ্বেষ, মুসলিমবিদ্বেষ ইত্যাদিতে কলঙ্কিত হতে পারে? এইসব দলিলপত্র কি *বিচারের দিন* কেউ গুম করে ফেলবে? আমরা যতোই সাদা ধবধবে কাফন পরিয়ে, আতর লোবান মাখিয়ে কবরে রেখে আসি না কেন, প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কর্ম নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।

দয়াময়ের সিদ্ধান্ত এক আর আমাদের বিবেচনা আরেক, এমন বদনসিব হওয়ার জন্য আমরা ঈমানকে কবুল করিনি।
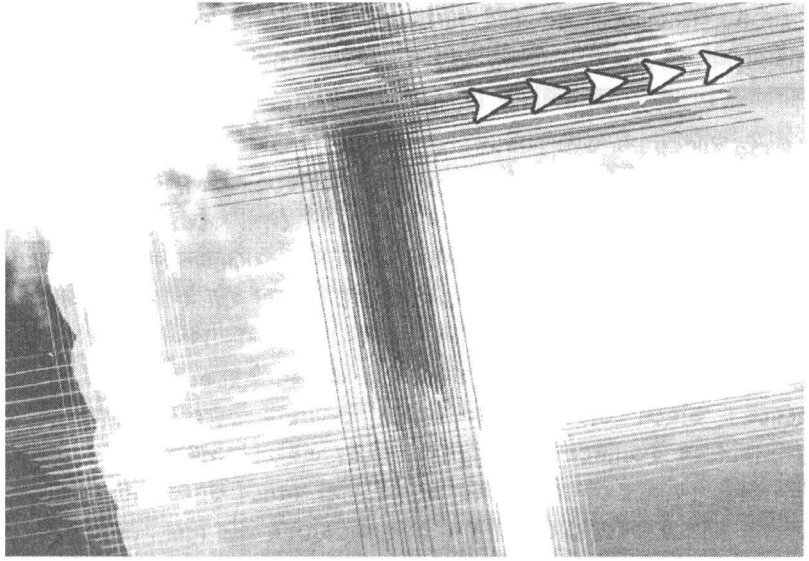
নিরপেক্ষদের স্বরূপ সন্ধান ও ঈমান-আমলের হেফাজত

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে অনেক ধর্মাবলম্বনকারীর ভূমিকা ধর্মহীন নাস্তিকদের চেয়েও জঘন্য। মুসলমান যখন ধর্মনিরপেক্ষ হয়, তখন তার ভূমিকাও হয় অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। অন্যের প্রতি দয়া দেখাতে গিয়ে সে তার মহান পিতৃপুরুষের আজন্মলালিত ধর্মের প্রতি নির্দয় হয়ে যায়! ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ এই মুসলিম জনপদে আমাদের কিছুটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তবে এখানে মুসলমানরা খোলসটা ছাড়ে না তাই চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যায় না। ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ কেমন এবং সেই স্বরূপে মুসলিম মানস কেমন দেখায় তা প্রত্যক্ষ করতে আমাদের প্রতিবেশী ধর্মনিরপেক্ষদেশ ভারতে যাওয়ায়ই সমীচীন মনে হয়। যদিও ভারত আপাতত ধর্মনিরপেক্ষতাকে কিছুদিন *অপেক্ষমান* রেখে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রবেশ করেছে। তবে ঘুরে ফিরে ধর্মনিরপেক্ষতার চাদর জাতীয়তাবাদীরাও গায়ে দেবে। কারণ এতে অনেক সুবিধা আছে। ধর্মনিরপেক্ষতা অনেক কিছুকেই আড়াল করে দিতে পারে।

ভারতে মুসলমান আমাদের দেশের চেয়েও বেশি। অমুসলিম তারও কয়েকগুণ বেশি। কোটি কোটি মুসলমানের বসবাস একটি দেশে এবং

পুরুষানুক্রমে তারা সে দেশেরই বাসিন্দা। একসময় মুসলমানের স্বাধীনতা ছিলো। এরপর মুসলমান-হিন্দু সবাই পরাধীন হয়ে গেলো। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করতে মুসলমানরা দুইবার সংগ্রাম করলো, হিন্দুরা করলো একবার। পরে দু'টি স্বাধীন দেশের জন্ম হলো, পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান। সংগ্রামের স্বাভাবিক ধারায় পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলো। ভারতের কোটি কোটি মুসলমান যে পরাধীন সেই পরাধীনই থাকলো। মুসলমান মুক্ত হতে চায় একমাত্র তার দ্বীনের জন্য। আর মুক্তির পথ প্রদর্শক হন দ্বীনের একদল অগ্রপথিক, উলামায়ে দ্বীন ও মর্দে মুজাহিদ। কিন্তু মুক্তির এই চিরন্তন পথ এখন সেখানে হারিয়ে গেছে। ভারতীয় মুসলমানের রাহবার, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও নেতৃবৃন্দ সবাই এখন বুঝে নিয়েছেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদেই তাদের মুক্তি। কর্তারা যা বুঝেন কর্ম সেই মাফিক হবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব নিরপেক্ষ মতবাদের জয়গান গাইছে সবাই *বন্দে মাতারাম*-এর পাশাপাশি।

মুসলমানের পতন শুরু হয় ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে। আমরা প্রথম ধাপে নেমেছি; ভারতের মুসলমানরা ইতিমধ্যে কয়েক ধাপ অতিক্রম করেছে। নিরপেক্ষতার শেষ সিঁড়িটি অতিক্রম করা পর্যন্ত মোটামুটি মুসলিম পরিচয়টি বজায় থাকে। এরপর অন্যান্য স্তর গভীর ও অন্ধকার। আমাদের প্রতিবেশী মুসলমানরা কতটা এগিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করে মুষড়ে পড়তে হয়। মাত্র একটি প্রজন্মের ব্যবধানেই সুর পাল্টে গেছে। ভারতের মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত ইনিয়ে-বিনিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তারা দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থক ছিলেন না। এখনো নন। সবাই মিলে একজাতি, একই মায়ের সন্তান। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার আফিম ব্যর্থ হয়নি, কাজ দিচ্ছে।

আল্লাহ পাকের পবিত্র কুরআনুল কারীম সর্বরোগের মহৌষধ। রোগ থেকে বাঁচার ও সুস্থ জীবনযাপন করার জন্যে কুরআন হচ্ছে নিত্যদিনের প্রেসক্রিপশন। এই জন্য আমল ও ঈমানের মেহনতে কুরআনকে বারবার পেশ করা চাই, তাহলেই চোখ খুলে যাবে, অন্তরের দুয়ারও খুলে যাবে। কুরআনুল কারীম শিরক ও ঈমানে, অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীর ব্যবধানে কোনো রাখঢাক করেনি। মুনাফিক বা মুশরিকের আলোচনায় কোনো অস্পষ্টতা রাখেনি। প্রত্যেকের স্ব স্ব অবস্থান চিহ্নিত করে দিয়েছে। পরস্পরের সম্পর্ক ঘোষণা করে দিয়েছে। পবিত্র কিতাব এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার অমোঘ সিদ্ধান্ত অনুসারে নিরপেক্ষ মুসলমানের স্বরূপ, অবস্থান এবং পরিণতি জানাতে কোনোরূপ অস্পষ্টতা রাখেনি। যারা না বুঝে এই বিষম জালে আটকা পড়েছে তাদের মুক্ত হতে বা মুক্ত করতে হবেই। অন্যথায় কোনো অজুহাতেই আল্লাহ পাকের পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলমানকে কত হীন করে, কত দুর্বল করে, কত আত্মঘাতী করে তার নজির ভারতের মুসলমান।

মুসলমানের ঈমান ও আকিদা পরস্পর ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। একটি অসুস্থ হলে অন্যটিও আক্রান্ত হয়। ওদের নিরপেক্ষতার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে যে সার্বিকরূপ চোখে পড়লো তাতে ভীত না হয়ে উপায় নেই। এতবড় একটি মুসলিম মানবগোষ্ঠীর ভিতর যে জীবনসংহারী বীজ বপন করা হয়েছে তার প্রতিকার তো সহজসাধ্য হবার কথা নয়। কুরআনুল কারীম তারপরও কাউকে নিরাশ করে না।

কুরআন পড়ে কোনো মুসলমানের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়, কারণ একসাথে কেউ জীবিত ও মৃত হতে পারে না। যে একসাথে নিজেকে মুসলমান ও ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করে সে অন্যের কাছে মিথ্যা বলছে ও নিজেকে প্রতারিত করছে। তবে তার অন্তরে যদি কোনো পাপ বা রোগ না থাকে তাহলে বুঝতে হবে, সে কুরআন থেকে মাহরুম রয়েছে।

আমাদের সমাজে অধিকাংশ সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষদের অবস্থা এরকমই। কুরআনের সাথে এদের সম্পর্ক অবিশ্বাস্য রকম হতাশাব্যঞ্জক। কুরআনকে না জানার অভিশাপই অধিকাংশকে ধর্মনিরপেক্ষ বানিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার যুক্তি যতো সহজে বুঝে ফেলে কুরআন ততো সহজে বুঝে না। অথচ কুরআন বুঝাই তাদের কাছে সহজতর ছিলো। এইসব নির্বোধ হতভাগা মুসলমানদের সহজেই বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যদিও সহজেই তাদেরকে সত্য ও শাশ্বত পথ দেখানো যেতে পারে। পৃথিবীতে বহু দেশ আছে, যেখানে ধর্মের নামগন্ধের সন্ধান পাওয়া যায় না, তবু তারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলতে ভয় পায়। বৃটিশরা পাশ্চাত্যের রক্ষণশীল জাতি বলে পরিচিত। সেখানে আবহাওয়া যেমন হিমাংকের নিচে তেমনি খৃষ্টধর্মকেও ওরা ফ্রিজ করে রবিবারের প্রাত অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। অন্য ধর্মের তো কথাই নেই। তারপরও বৃটেনে ব্লাসফেমী আইন আছে। ধর্মের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আছে। ধর্মনিরপেক্ষতার বিপদ ওরাও বুঝে।

অন্য ধর্মের নিরপেক্ষ ও মুসলমানের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ এক নয়। মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষরা আসলে নিরপেক্ষই নয়। তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের পক্ষ ত্যাগ করে বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের এই স্বরূপটা জানার মধ্যেই মূল সত্য নিহিত। না জানাতেই বিভ্রান্তি। এই স্বরূপ জানা গেলে ধর্মনিরপেক্ষবাদীর আকৃতি–প্রকৃতি চিন্তা–চেতনা ও অবস্থানসহ ইসলামের সাথে তার সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্যরা ধর্মনিরপেক্ষ হলেও স্বজাতির প্রতি স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখে। মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ হলে ডিগবাজি খেয়ে বসে। আমাদের ঘরে–বাইরে এই অভিজ্ঞতা থেকে কেউ বঞ্চিত নয়। হাবিলের কাক এদের দেখে হতভম্ব হয়ে যায়।
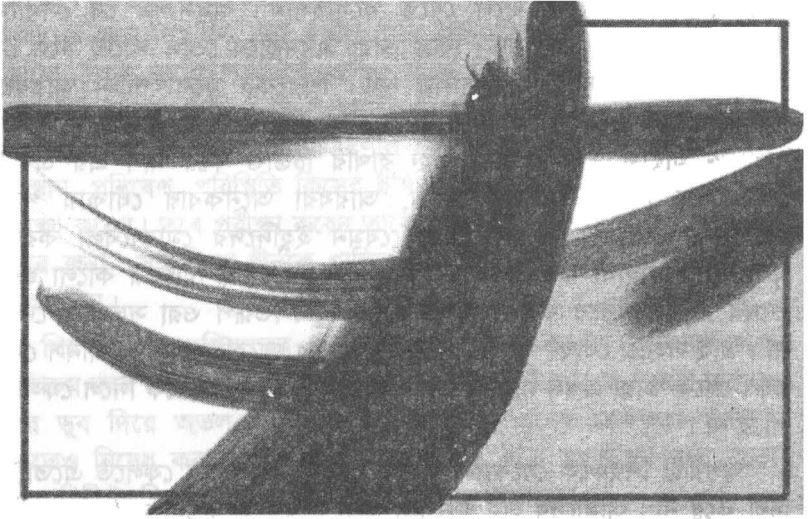
জাহেলিয়াত প্রত্যক্ষ করার সুফল

বেরলীর সাইয়্যেদ আহমদ শহীদকে কিছু লোক ওহাবী আখ্যা দিতে চেষ্টা করেছিলো। হাজী শরীয়তুল্লাহকে নিয়েও নানান মিথ্যাচার করা হয়েছিলো। শিরক ও মুশরিকদের মোকাবেলা করাতেই এইসব অপপ্রচার হয়েছে। পানিতে বসবাস করলে হাঙ্গর-কুমিরের পরিচয় না জানা কেমন করে সম্ভব? মিসরের সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ একবার আমেরিকায় গিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন সেখানে থেকে তিনি যা কিছু প্রত্যক্ষ করেন সেসব তার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। তার লেখা আরবদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। ফলে রাষ্ট্রশক্তিগুলো আমেরিকার তাঁবেদারি করলেও সাধারণ মানুষ ওদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে অনীহা প্রকাশ করে।

জাহেলিয়াত অন্ধকার। ইসলাম আলোকজ্জ্বল। যে অন্ধকার প্রত্যক্ষ করেনি সে বলতে পারবে না আলো বলতে কি বুঝায়? যে চির অন্ধকারে নিমজ্জিত অর্থাৎ অন্ধ, তার কাছে আলো যেমন অপরিচিত, তেমনি যে কেবল আলোর জগতই প্রত্যক্ষ করে, তার জানা সম্ভব হয় না অন্ধকারের রূপ কত কুৎসিত।

কিছুদিন আরবে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ হয়েছিলো। অবিশ্বাসী

আর মুশরিকদের প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। অমুসলিম যে সেখানে একেবারে নেই তা তো নয়। কিন্তু তারা এমনভাবে ভোল পাল্টে চলে যে বোঝার উপায় নেই সে মুসলিম নয়। শিরকের মূলোৎপাটন আরবরা নিজেদের মধ্য থেকে এমনভাবে করেছে, মুশরিকরা শিরকের লালন অন্তরে করলেও বাইরে তার কোনো চিহ্ন রাখার চিন্তাও করে না। এর একটা নেতিবাচক দিকও আছে। যেমন, আরবরা অনেকবার ধোঁকায় পড়ে নির্বোধের পরিচয় দিয়েছে। এখন যেমন ইহুদিদের মোকাবেলা করতে খৃস্টানদের সাহায্য কামনা করে। এই সুযোগে জাহেলিয়াতের কালো ছায়া ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারের কুৎসিতরূপ ওরা সচরাচর দেখে না। তাই সহজে ধোঁকা খাওয়া সম্ভব হয়। তবে জাহেলিয়াত কি জিনিস সেই জ্ঞান থেকে তারা এখন মাহরুম নয় বিধায় অন্ধকার তাদেরকে গিলে ফেলতে পারে না।

অশরীরি শিরককে যেকোনো আরব পায়ের নিচে পিষে ফেলতে এতোটুকু দ্বিধা করে না। আমাদের এই জনপদে যারা শিরক ও জাহেলিয়াতকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের চিন্তা-চেতনার গভীরতা অনেকের নাগালের বাইরে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়াতে নবী হয়ে আসেন তখন সমস্ত পৃথিবী জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো। তখন তিনশত ষাটটি দেবমূর্তির জন্য কাবাগৃহ শিরকের শীর্ষ তীর্থস্থান ছিলো। এদেরই মোকাবেলা করতে গিয়ে নবী তার কর্মসূচীর সূচনা করেছিলেন। এই কর্মসূচী আর এই সংঘাত চিরন্তন। নবীজির জীবনে যে কর্মক্ষেত্র ছিলো তাও চিরন্তন। আমাদের ডানে-বামে ও সামনে শিরকের সেই চিরন্তন লীলাভূমি বিদ্যমান। আমরা যদি অন্ধ ও বধির না হয়ে থাকি, যদি আমাদের পিতৃপুরুষের রক্তের ঋণ অস্বীকার না করি, তাহলে আপন সত্তার কসম করে বলতে পারি, আমাদের তিনদিকে শিরকের অবস্থান এবং এই বাস্তবতাই আমাদের অস্তিত্বের ভৌগলিক সীমানা। আমরা যারা শিরক প্রত্যক্ষ করেছি, নিঃসন্দেহে আমাদের বোধ, আমাদের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস পরিশীলিত ও স্বচ্ছ। অন্ধকার প্রত্যক্ষ করেছি বলেই আলোর আকাঙ্ক্ষী হয়েছি। অন্তরে ও বাইরের অন্ধকারের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছি বলেই অভিশপ্ত অন্ধকারকে অভিশম্পাত দেই দ্বিধাহীন চিত্তে।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে শিরক ও মুশরিকের কথা ও পরিচয় এবং তাদের আচার-আচরণের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করতে চাইলে বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে। শিরকের এতো বড় চারণভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। শিরকের এতবেশি তাণ্ডবও স্বভাবতই পৃথিবীর অন্য কোথাও পরিলক্ষিত

হয় না। বিশ্বনিয়ন্তা বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ *শিরকস্তানের* প্রতিবেশী কেন আমাদের করলেন? কী তার ইচ্ছা? তার এই অমোঘ সিদ্ধান্তের পিছনে কি কোনো নিগূঢ় রহস্য লুকায়িত আছে? তবে কি কোনো বৃহৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে চান তিনি আমাদের দিয়ে? তীরবর্তী ঈমানের তেজোদ্বীপ্ত জনপদ, পাশে প্রবাহিত কুফরীর বিশাল স্রোত; এই বাস্তবতা, এই ভৌগলিক অবস্থান, পরিবেশ, পরিস্থিতি কিসের ইঙ্গিত বহন করে? দয়াময় তার বান্দাকে পরীক্ষা করেন। তবে পরীক্ষা করেন তাকে সম্মানিত করার জন্য, তাকে পুরস্কৃত করার জন্য। সাহাবীগণ দ্বীনকে গালিব করার পথেই সম্মান ও স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন।

শিরক ও জাহেলিয়াতের ধারাকে প্রত্যক্ষ করে একদল আলোর সোপান অতিক্রম করে সৌভাগ্য অর্জন করেন। আরেকদল সেই পাপের স্রোতে অবগাহন করে ডুব দিয়ে অতল অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এদের শেষকৃত্য জানাযাটা পড়তেও নিষেধ করা হয়। হায়রে মানবজীবন! একে মহাজীবন বলে যতোই কল্পকাহিনী তৈরি করবে, ততোই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে।

যারা ভাগ্যবান তারা কুরআনুল কারীমের পাতায় পাতায় শিরক ও তৌহিদের ব্যবধানকে প্রত্যক্ষ করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, প্রায় অধিকাংশই কুরআন বুঝি না। তাই ভালোমন্দের বিবেচনাও অবিবেচকের মতো। তবে অন্তর্চক্ষু খুলে দেবার জন্য আরেকটি সুযোগ চোখের সামনে ছিলো। চোখ বন্ধ করে পথ চলছি বলে ভুল ঠিকানায় চলে গেছি। নয়তো শিরকের এতোবড় লীলাভূমি চোখের সামনে বিদ্যমান থাকতে শিক্ষার জন্য তাই কি যথেষ্ট ছিলো না? অন্তরে তৌহিদের বাণী, কানের কাছে প্রতিদিন আযানের ধ্বনি, এ কথাই কি মনে করিয়ে দেয় না, শিরক ও জাহেলিয়াতকে বিশ্বাসীদের এতো নিকটবর্তী করে দেয়া হয়েছে এক মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য? এই অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়েই আমাদের পবিত্র হতে হবে।

শিরক ও জাহেলিয়াতের তীর্থক্ষেত্রে যে মুসলমান জন্মগ্রহণ ও বসবাস করার পর আলোর জগতে ছুটে আসে, তাকে জ্ঞানদান করা হাস্যকর বটে। শত শত বৎসর ধরে এই উপমহাদেশে শিরক ও ঈমানের লড়াই চলেছে। তাজা খুনের স্রোত অতিক্রম করে ঈমানের লালনকারীরা তীরে উঠে এসেছে। তীরে বসা বকধার্মিকরা নসিহত করলে পুঁটিমাছই তা শুনবে। আল্লাহ পাক যাদের চোখ দিয়েছেন তাদের দৃষ্টিশক্তিও দিয়েছেন, যাদের অন্তর দিয়েছেন, তাদের ঈমানী শক্তিও দিয়েছেন। আর যাদেরকে তৌহিদের পতাকাবাহী হবার দায়িত্ব দিয়েছেন তাদের শক্তিকে দ্বীনের

জন্য কবুল করে নিয়েছেন। তাদের জীবনকে শিরকের মোকাবেলায় ওয়াকফ করে নিয়েছেন। তাদের রক্তকে ইসলামের জন্য খরিদ করে নিয়েছেন।

বাস্তবতা এই, যার দৃষ্টি শিরক ও জাহেলিয়াতকে প্রত্যক্ষ করেনি তার অন্তর তৌহিদের জন্য জ্বলে উঠেনি। আমরা যাদের উত্তরসূরি, ইতিহাস সাক্ষী, তারা মর্দে মু'মিন ছিলেন। মরণজয়ী মুজাহিদ ছিলেন। শিরক ও জাহেলিয়াতের বিনাশকারী তৌহিদের পতাকাবাহী ছিলেন।

তাই মুজাহিদের বসতি নিরাপদ মুসলিম জনপদ নয়। তাদের পদচারণা হবে শিরকের অরণ্যে। সেই জন্য দ্বীনকে গালিব করতে শিরকের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় হওয়া জরুরি। যে অন্ধ ব্যক্তি চোখের জ্যোতি ফিরে পায় সেই আলোর মূল্য বুঝে ও অন্ধত্বকে ঘুঁচিয়ে দিতে যতো মূল্য দেয়া উচিত সেই মূল্য তার পক্ষেই দেয়া সম্ভব।
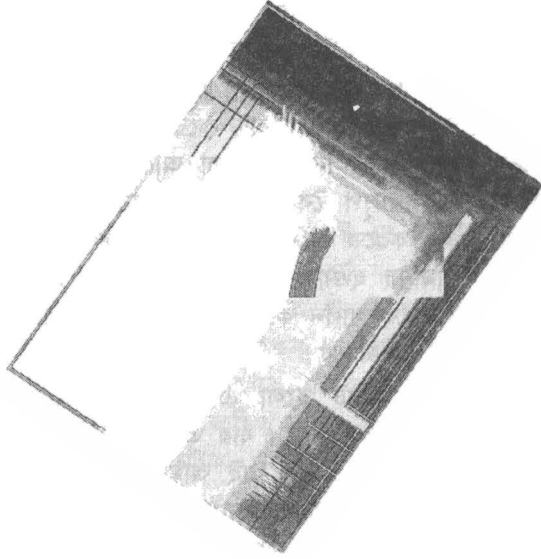
ভোট কি পবিত্র আমানত?

আমি ভোট দেই না। এই নিয়ে অনেক কথা শুনতে হয়। সেই কবে একবার বটগাছে ভোট দিয়েছিলাম। এরপর প্রতিবারই ভোটার তালিকায় নামধাম উঠছে, বাড়িতে ভোট ভিক্ষুকরা যথারীতি আসছেন। কিন্তু আমার কঠিন হৃদয় ভিক্ষুকদের প্রতি কিছুতেই সদয় হয় না। এই জন্য নানান অভিযোগে অভিযুক্ত আমি।

অনেকে বলেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ নাগরিক অধিকার। অতএব অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা সুনাগরিকের পরিচয় নয়। যারা একথা বলেন, তারা ব্যাপারটা আংশিক বুঝেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করাও নাগরিক অধিকার; অধিকার প্রয়োগ করাও যেমন বৈধ; অর্থাৎ ভোট দেওয়া যদি সুনাগরিকের পরিচয় হয়, তাহলে ক্ষেত্র ও সময় বিশেষে ভোট না দেওয়াও সুনাগরিকের পরিচয়। একথা আমার নয়, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীরাই সময় ও সুযোগে নাগরিকদের ভোট দিতে বলেন। সরকারি প্রচারযন্ত্রে বলা হয়, *আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দেবো*। একেবারে খাঁটি কথা। একথাও খাঁটি, *আমার ভোট যাকে দেবো, তাকে পেলে নিশ্চয় দেবো*।

অনেকে বলেন, একমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে লালন করা যায়। কিন্তু গণতন্ত্র তো স্বর্ণডিম্ব প্রসবিনী রাজহংসী নয় তাকে লালন করতে

হবে! কোনো বিচারেই গণতন্ত্র একটি সৎ ও সুন্দর প্রক্রিয়া নয়, যা পৃথিবীকে ভালো কিছু দিতে পারে। তাই গণতন্ত্রের বুলি শুনলে এখন সবাই বিদ্রুপ করে। হয়তো কেউ কেউ গণতন্ত্রকে কামধেনু মনে করে লালন করছে। তবে তাদের কামধেনুর দুগ্ধ তারা নিজেরাই সাবাড় করে দেয়, সবাইকে দেয় না। মুসলিম জাতির জন্য জীবনব্যবস্থা নির্ধারণ করা আছে। তার পাশে গণতন্ত্র একটি দুর্গন্ধময় বিষাক্ত সরীসৃপ বৈ আর কিছু নয়। এমন নিকৃষ্ট মতবাদকে মুসলিমমানস লালন করতে পারে না। পৃথিবীর অসভ্য জাতিগুলো যাদের কাছে সভ্য হয়েছে, বনমানুষ হওয়ার পর্যায় থেকে ফিরে এসে সভ্যতার দাবিদার হয়েছে তারা গণতন্ত্রকে লালন করার আহ্বান জানায় এই জন্য, তারা তাদের মুক্তিদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়।

অনেকে বলেন, ভোট হলো একটি পবিত্র আমানত। সাধারণভাবে আমানতদারি একটি পবিত্র কাজ। যার তার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। পবিত্র আমানত হলে তো কথাই নেই। এই আমানতদারির জন্য বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন। আমানতদারের প্রথম যে গুণটির প্রয়োজন সেটি হলো তার বিশ্বস্ততা। ভোট যদি পবিত্র আমানত হয়, তাহলে আমানতদারের পবিত্রতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নয়। কিন্তু এই পবিত্র আমানতগুলি এখন যাদের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে তারা কারা? আমানতের খেয়ানত করা মহাপাপ। অথচ ভোট প্রার্থীদেরকে খেয়ানতকারী যদি বলা না যায় তাহলে খেয়ানতের অন্যকোনো অর্থ আছে, যা মুসলমানের জানা নেই।

মুসলমান ভোট দেবে কেন ?

মুসলমান ভোট দেবে গণতন্ত্রকে লালন করার জন্য? জনপ্রতিনিধিদের সার্বভৌম আইনসভা প্রতিষ্ঠার জন্য? অথচ এই গণতন্ত্রই ধর্মনিরপেক্ষতার পথকে উন্মুক্ত করে। প্রতিনিধি পরিষদ যদি সার্বভৌম হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধিত্ব কে করবে? মানুষের সার্বভৌমত্ব আজ মানুষের জন্য আইন তৈরি করছে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আল্লাহর আইনকে উপেক্ষা করে।

মুসলমান ভোট দেবে কাকে ?

এমন প্রার্থীকে নিশ্চয় নয়, যে কুরআনের খেলাফ কাজ করে, দ্বীনের খেলাফ চলে, নবীর ওয়ারিশদের সংগ্রামকে মোকাবেলা করে, আল্লাহর মনোনীত জীবনবিধানকে উপেক্ষা করে। এমন প্রার্থীকে নিশ্চয় নয়, যার ব্যক্তিগত বা দলগত নীতির কারণে দ্বীন পরাজিত হওয়া বাকি থাকে। যার আদর্শগত চেতনায় বস্তুবাদই কেবল প্রকাশ পায়, যার সান্নিধ্যে মুমিনের ঈমান–আকিদা,

দুনিয়া–আখিরাত বিপন্ন ও ছারখার হয়ে যায়। এমন বরবাদীকে সওদা করার জন্য মুসলমান কেমন করে যেখানে সেখানে লাইন দিয়ে তার আমানতকে গচ্ছিত রাখতে যাবে?

আমরা ভোট দিচ্ছি কাকে ?

আমরা ভোট দিয়ে বিজয়ী করছি তাকেই যে একটি আসন পেয়ে তার পাপের পরিধিতে আরো বিস্তৃতি ঘটায়। এতোদিন সে তার পাপের অংশীদারি একাই ছিলো, এবার ভোটদাতাকে তার অংশীদার করলো। তার পাপ, জুলুম, দ্বীনের সাথে বাগাওয়াতি সবকিছুর ইন্ধন যুগিয়েছি আমরাই। ছোট জালিম পরাজিত হলে বড় জালিম জিতে যাবে এই অজুহাতে বা দৃষ্টিকোণ থেকেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মহান দায়িত্ব পালন করেন অনেকে। আসলে আমরা আমাদেরই পাতানো ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি। নিজেরা বুদ্ধি খাটিয়ে এবং বান্ধবদের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে এমন কলকব্জা তৈরি করেছি, এখন মাথা বের করতে পারছি না।

আল্লাহ পাক মুসলমানদের জন্য সহজ সরল পথ ও পদ্ধতি বানিয়েছিলেন অথচ আমরা পাপীদের পথই পছন্দ করলাম। ভোট যদি আমানতই হবে তাহলে ওরা ভিক্ষা করবে কেন? যে সৎ ও আমানতদার তার কাছে আমানত রাখার জন্য মানুষ ছুটে যাবে। ইসলামের ইতিহাস কি তাই বলে না? মুসলমানের ইতিহাস তো ইতিহাসের গৌরব। মুসলিম জাতিকে বেওকুফ বানিয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। আমরা বেওকুফ বনেছি এইজন্য, ইতিহাসের ধারায় আমাদের গণ্য করা হয় না। অন্যস্রোতে বিলীন হয়ে ইতিহাসকে দোষ দিলে নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত হবে। হাতে পায়ে ধরে ভিক্ষা করে, আকুল প্রার্থনা করে, প্রার্থী হয়ে যা সংগ্রহ করা হয় তাকে যদি পবিত্র আমানত বলা হয়, আর দাতাও যদি তাতে স্বস্তিবোধ করেন, তাহলে হাবিলের কাকের সামান্য বুদ্ধিটুকুও হারিয়ে যাবে।

আমাদের এখন কি করা উচিত? ভোটের খেলায়, নির্বাচনী ডামাডোলে, হারজিতের জোয়ারভাটায় আমাদের নায়েবে রাসূল ও তাদের লাখ লাখ অনুসারীদেরকে খুব একটা উৎসাহী হতে দেখা যায় না। এরাই জানেন ইসলামের স্বর্ণযুগে কোন পদ্ধতিতে একটি জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত করা হয়েছিলো। আজকের পৃথিবীও প্রতি যুগের মতো সেই সোনালী দিনের কিছু চিত্র ধারণ করে আছে। জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানরা তাই আফগানিস্তানের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যান। বাস্তবিকই তারা সেখানে একজন আমীরুল মুমিনকে দেখতে পান, বারুদের গন্ধের সাথে জিহাদের সৌরভ সেখানে ছড়িয়ে আছে, দ্বীনকে গালিব করতে প্রবাহিত রক্তের সিঞ্চনে খিলাফতের বীজ সেখানে

বপন করা হয়েছে বিধায় দয়াময়ের একনিষ্ঠ বান্দারা সেখানে এক শিশু মহীরুহকে প্রত্যক্ষ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

আপদমস্তক খেয়ানতকারীর কাছে আমানত গচ্ছিত রাখা যেমন চরম নির্বুদ্ধিতা, তেমনি বাতিলের কলাকৌশলকে সম্বল করে কামিয়াবী হাসিল করার বাসনাকে নির্বুদ্ধিতা বললে নির্বোধকেই চরম লজ্জা দেয়া হবে। নির্বাচনকে কখনো কেউ সাময়িক কৌশল হিসাবে ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কৌশল খাটাতে গিয়ে পরাজয়কে নিশ্চিত করা হলে তা হবে আত্মঘাতী কৌশল। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি প্রক্রিয়া। মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে কার সাথে? প্রতিদ্বন্দ্বি যদি তাগুত হয়, দ্বীনের খেলাফ হয়, তাহলে তার মোকাবেলাও কি লাইনে দাঁড়িয়ে ব্যালটের মাধ্যমে করতে হবে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন শিক্ষা তার উম্মতকে কখনো দেননি। জিহাদে যাননি অথচ সাহাবী ছিলেন এমন কথা মুখে উচ্চারণ করা অসম্ভব বিধায় ফয়সালার জন্য জিহাদের ময়দানকেই সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। জান্নাতের এতো নিকটবর্তী স্থানকে পাশ কাটিয়ে দূরবর্তী অবস্থানকে বেছে নেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? নেহায়েত দুর্বল হলে এবং হিম্মত না থাকলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

হ্যাঁ'র দল আর না'র দলের হাল দেখেও কি আমাদের একটুখানি চিন্তা করতে ইচ্ছা হয় না? ভোট দেয়ার কথা ভাবতেও আমার শরীর এখন শিউরে উঠে। এই ভোটপ্রার্থীদের কেউ কেউ এখন কুরআনের উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন দাবি করছে। এদেরই কেউ হয়তো একদিন মহান সংসদে কুরআনের উত্তরাধিকার বিধানের সংশোধনীর একটি বিল পেশ করে বসবে। তখন বলা হবে, যারা এর পক্ষে তারা হ্যাঁ বলুন, যারা এর বিপক্ষে তারা না বলুন। তাদের চিৎকারে আসমান-জমিন কেঁপে উঠবে। তখন বলা হবে, আমার মনে হয় হ্যাঁ এর পক্ষই জয়ী হয়েছে, হ্যাঁ বিজয়ী হয়েছে। সুতরাং বিলটি পাশ হবে। এভাবে কণ্ঠ ভোটে আমার দ্বীনকে পরাজিত করতে ওদের অন্তরাত্মা একটুও কাঁপবে না। ভোটদানে আমার ভীতির এটিও একটি কারণ।
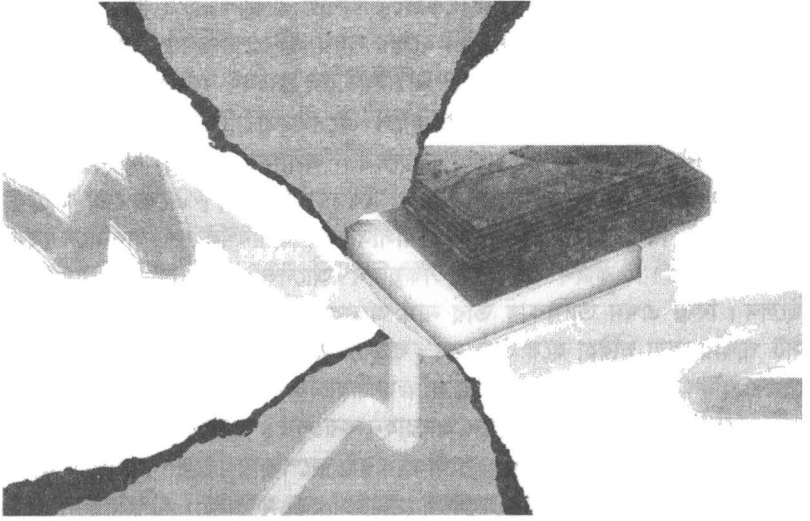
ভিআইপিদের তাকওয়া

পবিত্র হজ্জব্রত পালনে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে পুরো মিশনের প্রধান হয়ে যিনি জেদ্দা বিমানবন্দরে অবতরণ করলেন তিনি একজন মন্ত্রী। ধর্মমন্ত্রী। সাথে একডজন আত্মীয়-স্বজন, কয়েকজন রাজনৈতিক সহচর, একজন এমপি। মন্ত্রী সৌদি সরকারের মেহমান। বিরাটাকার গাড়ি নিয়ে সরকারি কর্মকর্তারা বিমানের কাছে এসে মাননীয় মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন। মন্ত্রী গাড়িতে উঠতে যাবেন, পেছনে লাইন দিয়ে উঠতে চাইলো সঙ্গী-সাথীরা। সৌদিরা তাদেরকে একনজর দেখে কি বুঝলো কে জানে, মন্ত্রীকে এক গাড়িতে উঠতে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। অন্য গাড়িতে নিজেরা উঠে তীরবেগে ভিআইপি লাউঞ্জের দিকে চলে গেলো। সাথীদের নিয়ে পরবর্তী বিড়ম্বনার কাহিনী খুবই করুণ।

এবার হজ্জের শেষে দেশে ফেরার পালা। মন্ত্রী আবার তার দলবল নিয়ে বিমানবন্দরে হাজির। বিমানের প্রথম ফিরতি ফ্লাইট। ভিআইপিতে ঠাসা। বিমান কর্মকর্তাদের গলদঘর্ম অবস্থা। কে কখন আসবেন, বিমানবন্দরে এসে কোথায় উপবেশন করবেন, বিমানে কোন সিটে আসন গ্রহণ করবেন ইত্যাদি নিয়ে

চুলচেরা হিসাব চলছে। সামনের কেবিনে অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ ক্লাসে পঁচিশ-ত্রিশটি সিট। পেছনে প্রায় আড়াইশ। হজ্বের সময় এই শ্রেণীবিভাগ সাময়িকভাবে বাতিল থাকে, তা সত্ত্বেও ভিআইপিরা এক্সিকিউটিভ ক্লাসেই বসেন।

ধর্মমন্ত্রী মহোদয় ভিআইপি টার্মিনালে এসে যথারীতি পৌছলেন। রয়েল প্রটোকল বিদায়ের সব আয়োজন করছেন। অন্যান্য ভিআইপিরা যথারীতি অন্যান্য যাত্রীদের সাথে অন্য টার্মিনালে অবস্থান করছেন। একে তো যাত্রীর ভীড়, তার উপর ভিআইপিদের সিট ও মালামালের হিসাব নিকাশ, সবমিলে যেন এক লঙ্কাকাণ্ড। একজন ভিআইপি কিছুদিন আগেও বিমানের সর্বময় কর্তা ছিলেন। কিন্তু এখন তালিকায় তার নাম অনেক নিচে। তিনি সামনের কেবিনে সিট পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। যাই হোক, অনেক বিচার-বিবেচনা করে আসন বণ্টন নিয়ম মাফিক করা হলো। যাত্রীরা বিমানে আসন গ্রহণ করছেন। মন্ত্রী রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় বিমানে আরোহন করলেন। আসনে উপবেশন করেই ইশারা করলেন নিজ সাথীদের। সাথীরা এরই অপেক্ষায় ছিলেন। মুহূর্তে তারা এক্সিকিউটিভ ক্লাসে এসে বসে পড়লেন। আমরা তো হতবাক। এদিকে আসনের মালিকরা যার যার আসনে এসে দেখেন, সেখানে অন্যলোক বসে আছে। সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। সামনের বিশেষ আসনে মন্ত্রী মহোদয় উপবিষ্ট, পাশের আসনে তার এক জিগরি দোস্ত। গোল বাঁধলো এখানেই। এই ফ্লাইটে যতো ভিআইপি ভ্রমণ করছেন তার মধ্যে মাননীয় ধর্মমন্ত্রীর স্থান সবার উর্ধ্বে। তিনি একজন প্রতিমন্ত্রী। একই ফ্লাইটে হজ্বব্রত সমাধা করে একজন প্রাক্তন মন্ত্রীও ভ্রমণ করছেন। যিনি তার আমলে আরো বহু উচ্চপদে আসীন ছিলেন। সঙ্গত কারণেই তাকে আসন দেয়া হয়েছে মাননীয় ধর্মমন্ত্রীর পাশের আসনে। তিনি তো এলেন; এসে দেখেন সেখানে অন্যলোক। মন্ত্রীকে কেউ কিছু বলতে সাহস পাচ্ছেন না। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম এমপি সাহেবের কাছে। অন্তত তিনি তো তার বন্ধু মন্ত্রীকে বুঝিয়ে পাশের সিটটি খালি করে দিতে পারেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে তাকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করলাম। এমপি সাহেব একেবারে খিস্তি মেরে উঠলেন, আরে রাখেন মিয়া, জ্যাতা মন্ত্রীর সামনে মরা মন্ত্রী নিয়া এতো ফাল পাড়েন ক্যান? যাই হোক, ব্যাপার কি জানতে চাইলে কেউ প্রাক্তন মন্ত্রীকে বলে দেয় ধর্মমন্ত্রীর কাণ্ডকারখানা। আর যায় কোথায়? রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা। প্রথমে বাংলায় তারপর ইংরেজিতে শুরু হলো তার চিৎকার। তিনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিও বটে। কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। একবার ধর্মমন্ত্রীর কাছে যাই তো একবার প্রাক্তন মন্ত্রীর কাছে জোড়হাতে ক্ষমা চাই। কিন্তু প্রাক্তন মন্ত্রী প্রায় মারমুখী হয়ে উঠেছেন। তিনি এই ক্ষমাহীন অন্যায়ের যেন একটা বিহীত ব্যবস্থা করেই ছাড়বেন। ধর্মমন্ত্রী সরকারের

ক্ষমতাধর ব্যক্তি। কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুচ্ছে না। আমি আবার ছুটে গেলাম এমপি সাহেবের কাছে। বললাম, ভাই, মরা মন্ত্রী যে জ্যাতা মন্ত্রীকে মেরে ফেলছে! একটু আসেন না একটা কিছু করেন। তিনি আমাদের দিকে অগ্নিবান নিক্ষেপ করে নিজেই সামনের কেবিন ছেড়ে পেছনের দিকে চলে গেলেন। আমি বহুকষ্টে প্রাক্তন মন্ত্রীকে বুঝিয়ে এমপি সাহেবের ছেড়ে যাওয়া আসনে বসতে রাজি করালাম। অবশ্য ইতোমধ্যে ধর্মমন্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনরা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে প্রায় কাঁপছিলেন। কিন্তু প্রাক্তন মন্ত্রী সবার দিকে পরম সম্ভ্রমের সাথে তাকিয়ে অভয় দিলেন এবং শান্তভাবে আমাকে অনুসরণ করে পেছনে চলে গেলেন।

আল্লাহপাক বলেছেন : *তোমাদের মধ্যে যে যতো বেশি খোদাভীরু, সে ততো বেশি সম্মানিত*। অর্থাৎ তাকওয়ার ভিত্তিতেই একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে।

আমাদের ভিআইপিরা অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন অন্যবিচারে, অন্যমাপকাঠিতে। দুনিয়াদারদের হিসাব-নিকাশই আলাদা। তবে এরা যখন আখেরাতের হিসাব নিকাশেও একই ফর্মুলা ব্যবহার করে বসেন, তখনই লাগে গণ্ডগোল। এসব ভিআইপিরা খুব কমই সাধারণের সাথে এক কাতারে নামাজ পড়ার জন্য জামাতে হাজির হবেন। যদি হাজির হয়ে যান, আমরা তাকে সামনের কাতারে স্থান না দিয়ে স্বস্তি পাই না। কিন্তু সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ইমামতি করার প্রশ্ন উঠলে তখন ভিআইপির বিনয় দেখে তাজ্জব বনে যেতে হয়। যদিও বিনয়ের কারণ সহজেই বুঝা যায়। দুনিয়ার কোনো জ্ঞানেই তিনি পেছনে নেই, কেবল দ্বীনের অতিপ্রয়োজনীয় ইলমটাই তাকে শুধু বেকায়দায় ফেলে দেয়। অথচ সমাজের উচ্চমর্যাদার আসনে আসীন ব্যক্তির কাছে অতিসহজে এই অতিসহজ দায়িত্বটুকু পালনের ব্যর্থতা কেউ আশা করে না। এই ব্যর্থতাকে আড়াল করতে যেয়ে তারা দ্বীনের সকল *জামাত*কেই এড়িয়ে চলতে সচেষ্ট থাকেন।

ভিআইপি মানে *ভেরি ইমপর্টেন্ট পার্সন* অর্থাৎ *খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি*। এই গুরুত্ব যে কত মারাত্মক ব্যাপার, তা একবার প্রত্যক্ষ করলাম পবিত্র হজ্বের মওসুমে। তখন জেদ্দায় আমার স্থায়ী বসবাস। হজ্ব সমাগত। ভাবলাম এবার হজ্ব করবো মিশনের সাথে; প্রতিবারই ওরা অনুরোধ করে তাদের মেহমান হবার জন্য। একদিন এ্যাম্বাসি অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। আসলে এটি কনসুলার অফিস, এ্যাম্বাসি রিয়াদে। ওরা সমাদর করতে আগ্রহী, অথচ সবাই খুব ব্যস্ত। এ জন্য আমি তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু একজন জোর করে তার অফিসে নিয়ে বসালেন। আমারও দরকার ছিলো কিছু আলাপের ও হজ্বে

কোন সময় কিভাবে তাদের সফরসঙ্গী হবো ইত্যাদি। ভেতরে খুব জরুরি আলাপ হচ্ছে। আমি একান্তে চুপচাপ বসে রইলাম। বড় বড় ভিআইপিরা আসছেন, তাদের বিরাট তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে। খোদ ধর্মমন্ত্রী তো আছেন, তারপর একজন কেবিনেট মিনিষ্টারও আসছেন। তিন-চার জন সচিব ও অতিরিক্ত সচিব। বিভিন্ন সরকারি ও আধাসরকারি সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ। অনেকেই সস্ত্রীক। এ ছাড়াও আছেন অনেক উচ্চপদে আসীন ভিআইপিদের পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়িবৃন্দ। আরো আসছেন কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন ভিআইপি।

আলোচনার মাঝখানে উপর থেকে ডাক পড়লো। সেখানেও মিটিং। অফিসার দু'হাত ধরে আমাকে রাজি করে ফেললেন যেন অপেক্ষা করি। আমাকে বাসায় লিফ্‌ট দেবেন এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন। টেবিলে রাখা অনেকগুলো পত্র-পত্রিকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। বুঝলাম অনেক্ষণ বসতে হবে। অগত্যা *পড়াশোনা* শুরু করলাম। এরই মধ্যে একখানি সুন্দর বাইন্ডিং খাতাও পাওয়া গেলো। অনেক লেখালেখি, কাটাকুটি; বিষয়বস্তু এতোক্ষণ যা আলোচনা হচ্ছিলো তা। অর্থাৎ ভিআইপিদের হজ্বের আয়োজন, ব্যবস্থাপনা, নির্দেশনা ইত্যাদি। জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে শুরু করে মক্কা গমন, অবস্থান, মদীনায় যাতায়াত, সেখানে অবস্থান, আরাফাতে যাতায়াত ও অবস্থান ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থাপনা থেকে একেবারে জেদ্দা বিমানবন্দরে বিদায় পর্যন্ত পুরো সফরের ইতিবৃত্ত পড়ে আমার বেহুঁশ হবার দশা। এই বিরাট আয়োজনের মুসাবিদা যারা করেছেন তারা যথার্থই বিশেষজ্ঞ বলে আমার বিশ্বাস হলো। অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ধাপে ধাপে সফরের প্রতিটি অংশকে কুশলী হাতে যেন তৈরি করা হয়েছে। মিনার বিশাল তাঁবুতে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ কিভাবে তৈরি হবে তাও প্রকৌশলীর কুশলি হাতে আঁকা হয়েছে। মি‍শনের অসংখ্য গাড়ি কখন কোথায় অবস্থান করবে তার নির্দেশিকা যথাস্থানে দেয়া হয়েছে। কনসুলার অফিসের সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়দায়িত্ব, সময়সূচি অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে দেয়া হয়েছে। মদীনায় আল্লাহর মেহমানরা প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে তাঁবুতে অবস্থান করবেন। আর আমাদের মিশনের মেহমানরা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে কি কি সুযোগ-সুবিধা পাবেন তার উল্লেখ দেখে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, এসব তাঁবুতে কোনো গরিব দেশের জনপ্রতিনিধিরা অবস্থান করবেন ও কাফনের মতো ইহরামের কাপড় পরে বলবেন : *লাব্বায়িক– হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাজির।*

মিনায় মিশনের নির্মিতব্য তাঁবুর যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত চমকপ্রদ। পুরো কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি হলেন মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী। অতএব তার কক্ষটির বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। পাশে থাকছেন কেবিনেট মন্ত্রী। পুরো কার্পেট বিছানো রুম। তবে ভিআইপিদের পদমর্যাদা অনুসারে কার্পেটের তারতম্য

আছে। ফুলের টব কোন রুমে কয়টি থাকবে, তাও নির্দিষ্ট করা আছে। বিছানাপত্র সাজসজ্জা সবই মিশনের; ভিআইপিরা এসব এস্তেমাল করা ছাড়া অন্যান্য কি কি খায়েসের কথা ব্যক্ত করছেন তাও বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জেনে নেয়া হয়েছে এবং সেই অনুসারে সবকিছু আঞ্জাম দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আরাফাতে মাত্র সাত-আট ঘণ্টা অবস্থানের ব্যাপার। তাঁবুর অবস্থা মিনার মতোই। খানাপিনার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ তো রীতিমতো বিয়ের আয়োজন। পুরো সফরের তালিকা দিয়ে পাঠকের মনোকষ্ট বাড়াতে চাই না। শুধু মিনাতে প্রথম দু'দিন ও পরের তিনদিনের বিরামহীন আপ্যায়নের সামান্য উল্লেখ করছি মাত্র। কাচ্চি বিরিয়ানী প্রায় প্রতি বেলাতেই আছে। অতিরিক্ত ডিস হিসেবে *কারী* থাকবে। উট, খাসি, গরুর গোস্ত কখনও রেজালা, কখনও ভুনা। সার্বক্ষণিক মওজুদ থাকবে প্রচুর আঙ্গুর, আপেল, সোলেমানী চা, ঠাণ্ডা পানীয়, বরফ দেয়া লাবান ইত্যাদি। খানাদানার পর অনেকেই পানসুপারি খেতে চাইবেন। সৌদিআরবে পান খাওয়া নিষিদ্ধ। যে খায় ও যে বিক্রি করে দু'জনকেই পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু মিশন কি করে এসব জোগাড় করবে তার কোনো উল্লেখ না থাকলেও পরিবেশনায় পানদানিতে পানসুপারির ব্যবস্থা আছে। এমনকি কে কোন জর্দা পছন্দ করেন, তাও টীকায় উল্লেখ আছে। আমি অবাক হলাম একথা জেনে, ম্যাডামরা কে কোন জর্দা পছন্দ করেন একথা এরা জানলেন কেমন করে? খাবার পর অনেকের ধুমপানের অভ্যাস আছে। তার ব্যবস্থাও আছে। কার্টুনভর্তি সিগারেট থাকবে এবং কার কোন ব্রাণ্ড চাই সেটাও মোটামুটি জানা আছে বিধায় সেই অনুসারে খরিদ ও বিতরণের তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

মিশনের একটি স্কুল আছে। স্কুলের অস্থায়ী প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষক এই ভিআইপি খিদমতের বিশাল আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। স্কুলের সমস্ত গাড়ি, ড্রাইভার, কর্মচারী কোনো কিছু বাদ নেই। আমার সখ হয়েছিলো মিশনের সাথে হজ্ব পালন করবো; কিন্তু পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য যে এলাহি কাণ্ড হতে যাচ্ছে, তা অনুমান করে আমার মন ভেঙে গেলো। আমি এক হতদরিদ্র মানুষ। এই বিরাট কর্মকাণ্ডে ভীষণ বেমানান। মুহূর্তে স্থির করে ফেললাম, দয়াময়ের সমীপে একাই যাবো। কিছু না বলে মিশনের বাইরে চলে এলাম। পথে একটি ইচ্ছা মনে জাগলো, মিনার মাঠে মিশনের তাঁবুটি খুঁজে বের করতে হবে এবং ভিআইপিদের হজ্বব্রত পালনের বিশাল আয়োজনটি সরেজমিনে দেখে নিতে হবে।

ভিআইপি আর তাকওয়া দু'বিপরীতধর্মী জিনিস। যার মধ্যে *তাকওয়া* আছে তিনি হাজার চেষ্টা করেও ভিআইপি হতে পারবেন না। তবে কিছু কিছু অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আছেন তারা দু'দিক *ম্যানেজ* করে চলেন। এদের বুদ্ধি দেখলে হাবিলের

কাকও অবাক হবে।

একজন ভিআইপি দেশের স্বনামধন্য ইসলামি চিন্তাবিদ। পবিত্র রমজান মাসে টেলিভিশনে সংযম ও তাকওয়ার উপর আবেগজড়িত আলোচনা করেন। তাকে একজন মুত্তাকী ভিআইপি বলা যেতে পারে। কেননা তিনি একবার ঢাকার বাইরে তার অফিস পরিদর্শন করতে গিয়ে অধীনস্থ কর্মকর্তার উপর ভীষণ ক্ষেপে যান এজন্য যে, সেই অফিসে বালতি ও বদনা ছিলো না। বেচারা কর্মকর্তা পরদিন বড় সাহেবের ফেরার আগে যথারীতি বালতি ও বদনা পানিতে পূর্ণ করে সোফাসেটের পাশে এমনভাবে রাখেন যাতে ভেতরে প্রবেশ করতেই তা চোখে পড়ে। যখন দেশে মুহুর্মুহু হরতালের ডাক পড়ছিলো তখন এই ভিআইপি চিন্তিত হয়ে পড়েন। বাসা উত্তরায়, অফিস মতিঝিলে। নতুন বুদ্ধি মাথায় চলে এলো। বিমানবন্দর এলাকায় কিছু কর্মকাণ্ড তার আওতাধীন। নির্দেশ জারি হলো বড় সাহেব বিমানবন্দরেও অফিস করবেন। সাথে সাথে পরিকল্পনা প্রস্তুত। রাতারাতি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে অফিস করা হলো। নিজের সমস্যার সমাধান হলো কিন্তু অন্যদের উপর হুকুম জারি থাকলো, যাত্রাবাড়ি, সদরঘাট যেখানেই থাকবে সকাল ন'টার মধ্যে বিমানবন্দরে পৌছতে হবে। আবার টঙ্গী খিলক্ষেতের লোককেও মতিঝিলের অফিসে ন'টার মধ্যে অফিসে পৌছতে হবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও।

প্রতিবছর প্রচণ্ড শীতে এদেশের গরিব মানুষগুলো কি যাতনা ভোগ করে তার বিবরণ ভিআইপিরা সংবাদপত্রে *পাঠ* করেন। ফুটপাতে, প্ল্যাটফর্মে, পার্কে, জেলখানায় প্রতিটি শীতের রাত্রির সাথে মৃত্যুযুদ্ধ করে। আমাদের সোনারসন্তান ভিআইপিরা শীতকালীন নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়ে বহু মূল্যবান বক্তব্য পেশ করে জগতকে ধন্য করেন। কিন্তু অন্নহীন বস্ত্রহীনদের মৃত্যুসংবাদ শুনে কোনো মৃতের বাড়িতে তশরিফ নিয়ে নিজেদেরকে ধন্য করেন না।

ভিআইপিরা মানুষের নিকট সম্মানের পাত্র। আর তাকওয়া অবলম্বনকারীরা আল্লাহর নিকট সম্মানিত। আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেন, সে ভিআইপি হবার লজ্জা থেকে নিস্কৃতি পেতে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে অস্থির হয়ে উঠেন। মাওলার মেহেরবানির তাজ যার মাথায় পরানো হয়েছে তার কোনো পোশাকী নামের দরকার আছে!

লর্ড কার্নিংহাম ছিলেন ইংল্যাণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত খৃস্টান পরিবারের সন্তান। কিছুদিন আগে তিনি আমেরিকাতে যান বেড়াতে। সেখানে তার অতিঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে আগেই সংবাদ দেয়া ছিলো। বিমানবন্দরে নেমেই তিনি উৎসুকনেত্রে বন্ধুকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তাকে না দেখে বাসায় ফোন করলেন। সেখান থেকে জবাব এলো, তিনি বাইরে গেছেন তবে

বিমানবন্দরে যাননি। কার্নিংহাম বিস্মিত হলেন, কিছুটা বিক্ষুব্ধও হলেন। উঠলেন হোটেলে। বন্ধুর সাথে আর যোগাযোগ হলো না। যথারীতি লণ্ডনে ফিরে এলেন। লিখলেন এক লাইনের ছোট্ট একটি চিঠি : *বন্ধু, কিসে তোমাকে আমার উষ্ণ আলিঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন করলো?*

বন্ধু ছোট্ট জবাব দিলেন : *জিমি, যে জিনিসের আলিঙ্গন আমাকে তোমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে তা তোমার নিকট পাঠালাম, আমাকে ভুল বুঝো না।'*

বন্ধু একখানা পবিত্র কুরআনুল কারীম পত্রের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। বন্ধুবিচ্ছেদে বিমর্ষ কার্নিংহাম গভীর অভিনিবেশে কুরআন পড়লেন এবং মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে মুসলমান হয়ে গেলেন। লর্ড কার্নিংহাম নিজেই নিজের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করলেন : জামাল উদ্দীন কার্নিংহাম।

আমেরিকায় বন্ধুকে দীর্ঘ চিঠি লিখলেন : *প্রিয়তমেষু, তোমাকে হারিয়ে অন্তর মন হাহাকার করে উঠেছিলো, হৃদয় উজাড় হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু বিনিময়ে তুমি যা দিলে তার প্রতিটি শব্দ একেকটি বন্ধু হয়ে আমার অন্তরকে জড়িয়ে ধরেছে। হাজার হাজার বান্ধবের গুঞ্জরণে আমার হৃদয়ের বিশাল আঙ্গিনা মুখরিত হয়ে উঠেছে। এদের সবাইকে নিয়ে এবার তোমার দুয়ারে আসতে চাই, জন্ম জন্মান্তরের বন্ধুদের নিয়ে তোমাকে একবার আলিঙ্গন করতে চাই।*

বন্ধু জবাব দিলেন : *কাল প্রত্যুষে ফজরের সালাতে সিজদাহ থেকে মাথা তুলে দেখতে পাবে আমি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন করার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি।*
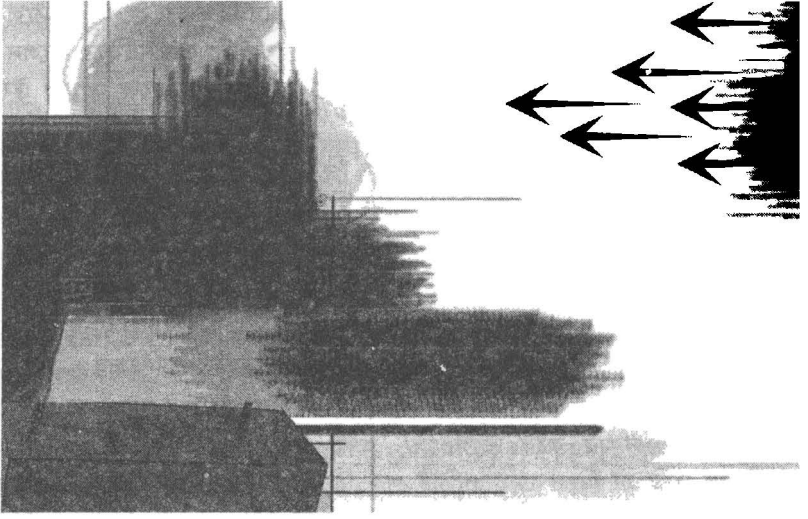
কপালে হেদায়েত নেই তাই এখনো ওদের সংশয়

ষাটের দশকে ঢাকার জগন্নাত কলেজে যখন ছাত্র ছিলাম, তখন আমাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন এক সংশয়বাদী। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস, জ্ঞানের চর্চাই তাকে সংশয়বাদী করে তুলেছিলো। মানুষের মনে সংশয় দেখা দিতে পারে এটা অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু সেই সংশয়কে দূর করার প্রচেষ্টা কিংবা সংশয়মুক্ত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা থাকলে তার পরিণতি শুভ হয়। মানুষ চিন্তা চেতনার সোপান অতিক্রম করে উর্ধ্বমুখী হতে পারে, এই নিয়মও অস্বাভাবিক নয়। তবে কেউ যদি আপন সংশয়ে তুষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল। যেমন আমার শিক্ষাগুরু। তার বাসস্থানের নামও ছিলো *সংশয়*। বাড়িটির সম্মুখ দিয়ে যেতে আমার বড় আফসোস হতো।

এর আগে যখন ঢাকা কলেজে পড়তাম, তখন আরেক গুরু পড়াতেন বিবর্তনবাদ। চার্লস ডারউইনের মহান (?) মতবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি

যেন অন্যকোনো জগতে চলে যেতেন। মনে হতো, ডারউইনকে তিনি শুধু এক মহাবিজ্ঞানীই মনে করেন না, বরং তিনি যেন এক ঋষি। ঋষি যেন তার অন্তরে মানুষের বিবর্তনের কথা স্বহস্তে লিখে দিয়ে গেছেন। সৌভাগ্যবশত তার ছাত্ররা কেউ তার মতো হয়নি। তবে তিনি সেই লখিন্দরই রয়ে গেছেন। বিষও নামেনি, হুঁশও ফেরেনি।

কয়েক বছর আগে লণ্ডনের এক মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম। সেখানে ডারউইনের বিবর্তনবাদকে ধাপে ধাপে বেশ মনোরম করে দেখানো হয়েছে। গ্লাসে দাগ কেটে কোনো এক দুষ্টছেলে ইংরেজিতে লিখে রেখেছে : *ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যুক*। উপরে চার্লস ডারউইনের বিশাল ছবি। কী মারাত্মক! অথচ কী নির্মম সত্য। হয়তো সেই জন্য কেউ লেখাটি তুলে ফেলেনি বা ঢেকেও রাখেনি।

সংশয় যেন আগুনে ভস্মীভূত ছাই। হাত-পা কাটলে যখন রক্ত পড়ে, তখন একটু ছাই দিয়ে চেপে ধরলে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। সংশয় মানুষের অন্তরে চিন্তার অবাধ চলাচলকে ছাইচাপা দিয়ে দেয়। এমন সংশয়বাদীরা মহান প্রভু এক অদ্বিতীয় পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে নিয়েও সংশয় করে। সংশয় করে মানব শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. কোনো মনোনীত নবী কিনা এবং মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীম আল্লাহ পাকের বাণী কিনা? এই সংশয়ের বীজ তো এই জমিনে অনেকে বুনেছে, যার ফসল এখন পথে-ঘাটে চলতে গেলেই পাওয়া যায়। অসাবধান হলেই পিচ্ছিল খোসায় আছাড় খাওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি।

কুরআনুল কারীম আল্লাহ পাকের বাণী, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. বাণীবাহক মাত্র। এই সহজ সত্যকে মানুষ কেন মানবে না? সংশয়বাদীরা মানুষকে সত্যবিমুখ করার সব কৌশলই জানে। আসুন, কোনো কৌশল দিয়ে নয় বরং দয়াময়ের সহজ-সরল পথের উপর দাঁড় করিয়ে এইসব মানুষকে এমন কিছু কথা বলি, যাতে ওরা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। তবে হাবিলের কাকের বুদ্ধিটুকুও যাদের নেই, তাদের কথা আলাদা :

১) কুরআনুল কারীম নিজেই চ্যালেঞ্জ করছে, এতে কোনো ত্রুটি নেই। কোনো ত্রুটি তুমি খুঁজে পাবে না, যদি পারো দেখাও। সন্দেহবাদীরা কেন সেই চেষ্টা করে না? বিশালাকার এই গ্রন্থটি শত সহস্র তত্ত্ব ও তথ্যে পরিপূর্ণ। চেষ্টা করেও কি একটি ভুল কিংবা অসামঞ্জস্য বের করা যায় না? বিরুদ্ধবাদীরা শত শত বৎসর চেষ্টা করেও সামান্য একটি ত্রুটিও কেন আবিষ্কার করতে পারলো না? আল্লাহ পাক মানুষকে ক্ষমতা তো কম দেননি। মঙ্গল গ্রহে পৌঁছতে আর কয়দিনই বা বাকি?

২) নবী কুরআনের বাণীবাহক মাত্র। সেই নবীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে

রাখলেই ধীরে ধীরে চিন্তার পাপড়িগুলো খুলে যাবে এবং সত্য উন্মুক্ত হয়ে অন্তরকে বিস্মিত করে তুলবে। তেইশ বছরের নবী জীবনে প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবী নবীর সান্নিধ্যে এসেছেন। তেইশ বছর তো নয় যেন এক বিশালজীবন। অকল্পনীয় অসাধারণ ঘটনার আধার এক মহানজীবন। এই জীবনের অগণিত সাথীরাও একেকজন নক্ষত্রের মতো। তাঁরাও আপন ঔজ্জল্যে আলোকজ্জ্বল তারকা। বিশাল কর্মময় জীবন তাঁদেরও। নবীর নিত্যদিনের সহচর, দুঃখ-বেদনার সাথী, মৃত্যুর মুখোমুখি সেখানেও তারা হাজির; দীর্ঘসফর, হিজরত, তারা কোথায় নেই? তেইশটি বছর ধরে কুরআনের বাণী মানুষের কাছে পেশ করলেন কিন্তু কুরআনের কোথাও এইসব জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীদের নাম নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি ছিলেন তাঁর স্ত্রীর ক্রীতদাস মাত্র। যায়েদ বিন হারেসা। পরমবন্ধু আবু বকর রা., প্রিয় জামাতা উসমান রা., যুদ্ধের ময়দানে অমিততেজ ওমর রা., আলী রা., পুত্র-কন্যা কারো নাম নেই। দয়াময়ের কথার বাইরে একটি কথা উচ্চারণের ইখতিয়ার ছিলো না বিধায় কুরআনে এই সব জলীলুলকদর সাহাবী ও আপনজনদের নাম নেই। যদিও তাঁরা নবী জীবনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলেন।

৩) নবুওতের আগে চল্লিশ বছর নবীজি যে জীবনযাপন করেছেন, তাও তুলনাহীন। মাতৃগর্ভেই পিতৃহীন, শিশুকালে মাতৃহারা; এতিমের জীবন। যৌবনে দীর্ঘ সফরে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ঘটনা-দুর্ঘটনা এসবের কোনো উল্লেখ নেই। অথচ কুরআনের বাণী তাঁরই মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে।

৪) সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বিশ্বাস করে আসছে, পৃথিবী স্থির, সূর্য ঘুরে। যুগ যুগ ধরে এই বিশ্বাসের উপর মানুষ অটল হয়ে আছে। নবীজি কুরআনের বাণী পেশ করে বললেন, না, পৃথিবীও ঘুরছে। এই একটি কথার জন্য গ্যালিলিওর মতো বিজ্ঞানীকে তাঁর দেশবাসী হত্যা করে। কেন আজকের অবিশ্বাসীরা এইটুকু চিন্তা করে দেখে না, মাত্র তিনশত বৎসর পূর্বে বিজ্ঞানীরা সূর্য ও পৃথিবীর পরিভ্রমণের যে তথ্য দিয়েছেন, তা চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে কুরআন ঘোষণা করেছে তার উম্মী নবীর মুখে।

৫) কুরআনের ঘোষণা, আবু লাহাব অভিশপ্ত। আবু লাহাব নিজ কানে তা শুনলো। এই বিপদসংকেত শোনার পর দশ বছর বেঁচে থেকেও সে একটিবার কালেমার বাণী উচ্চারণ করে কুরআনের ঘোষণাকে রদ করে যেতে পারেনি। নবী যদি বলেন, উত্তর, সে বলে দক্ষিণ; নবী বলেন দিন, সে বলে রাত্রি। এমন শত্রুকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার একমাত্র সুযোগটিও সে গ্রহণ করতে পারেনি। নবীর রিসালাত ও কুরআনের উৎস নিয়ে যারা বদ চিন্তা করে, তারা আবু লাহাবের নসিব নিয়েই দুনিয়া ত্যাগ করবে।

৬) সন্দেহবাদীরা সাধারণত খুব একটা মূর্খ হয় না। খুব পড়াশোনা করতে করতে একসময় তারা অনুভব করে, সংশয়ের বীজ কখন যেন কেউ তাদের অন্তরে বপন করে গেছে। তারপর হয় অঙ্কুর, হয় কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, অবশেষে এক মহীরুহ। কিন্তু যার উপর সন্দেহ, সেই মহান কিতাবটি পড়ে দেখে না একবার। কথায়, ভাষায়, অলঙ্কারে ও বর্ণনায় যে বিস্ময় বিস্ফোরিত হয়, যে অপরূপ সৌন্দর্য আয়াতগুলোকে জড়িয়ে আছে, তার সান্নিধ্যে যদি কিছুটা সময় অবস্থান করতো, তাহলে ওদের অন্তর ওলটপালট হয়ে যেতো। বিশ্বাসের তুফানে বারবার বেহুঁশ হয়ে পড়তো। অন্যদিকে নবীর ভাষা, প্রকাশ ও বর্ণনাভঙ্গিকে উপলব্ধি করে আরেকবার বিস্মিত হতো মানুষের মাঝে এক অসাধারণ মহামানবকে আবিষ্কার করে।

৭) আল্লাহ পাকের কালাম যেমন সর্বকালের জন্য মুজিজা, তেমনি তাঁর শেষ নবীও চিরনবীন কালোত্তীর্ণ জীবন্তমুজিজা। নবীজি সর্বযুগের মানুষের নিকট এক বিস্ময়। মানুষ যতো জ্ঞানী হবে, চিন্তার সোপান যতো বেশি অতিক্রম করবে, ততো বেশি বিস্ময় নিয়ে নবী তাদের সামনে হাজির হবেন। নবীর জীবন সম্বন্ধে আল্লাহ যখন বলেছেন, তিনি তাঁর দ্বীন পূর্ণ করে দিয়েছেন। নবী তখন বলেছেন, হয়তো তোমাদের সাথে আগামীবার আরাফাতে আর দেখা হবে না। নবীজি তখন ষাটোর্ধ পৌঢ় মাত্র; অসুস্থও নন, বার্ধক্যেও পৌঁছেননি। কয়েকটি মোবারক দাড়ি পাক ধরেছে মাত্র। সম্পূর্ণ কর্মক্ষম ও সচল। কিন্তু আল্লহর বাণীবাহক তাঁর স্রষ্টার অমোঘ নিয়তির অধীনে ছিলেন। অতএব আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হলো, নবীর জীবনের ইতিও টেনে দেয়া হলো।

৮) কুরাইশরা ইহুদিদের কাছে প্রতিনিধি পাঠালো পরামর্শের জন্য। ইহুদি পণ্ডিতরা কয়েকটি জটিল প্রশ্ন শিখিয়ে দিলো তাদের। ফিরে এসে কুরাইশ প্রতিনিধিরা মুহাম্মদ সা. কে প্রশ্ন করলো। তিনি সময় চাইলেন, পরদিন জবাব দিবেন। কিন্তু ওহী এলো না। তারপর দিনও না। এদিকে কুরাইশরা তামাশা জুড়ে দিলো। যতোই সময় যায় ওদের কটুক্তি ততো বাড়ে। নবী মনের দুঃখে পাহাড় থেকে পড়ে জীবন শেষ করে দিতে চাইলেন। পরে ওহী এলো, বিলম্বের কারণও জানিয়ে দেয়া হলো। দুমূর্খরা এই ঘটনা জানে, তবু নবীর সাথে ওহীর সম্পর্ক নিয়ে সংশয়মুক্ত হতে পারে না। নবী নিজের ওয়াদা পর্যন্ত রাখতে পারেননি, জবাবও পরদিন দিতে পারেননি। কেননা ওহী আসেনি। তিনি তো ছিলেন ওহীর বাহক মাত্র।

৯) কুরআনের বাণীবাহক কুরআনকে পুস্তকাকারে বাণীবদ্ধ করে যাননি। উসমান রা. যা পারলেন তিনিও তা পারতেন। কিন্তু প্রয়োজনবোধ করেননি। আল্লাহ পাক কুরআনকে হিফাযত করবেন, এই ঘোষণার পর তিনি এই নিয়ে আর চিন্তা করেননি।

১০) আল্লাহপাক বলেছেন : কুরআনের মতো একটি সূরা এমনকি একটি আয়াতও তৈরি করতে পারবে না। পারেনি। পারার চেষ্টাও করেনি। নবীর সাথে বারবার যুদ্ধে মোকাবেলা করেছে, কিন্তু নবীর মুখ থেকে যে চ্যালেঞ্জ শুনেছে তার মোকাবেলা করতে কোনোদিন আসেনি। আজও পৃথিবী জুড়ে ইসলামকে মোকাবেলা করার জন্য মুশরিকরা বহু *পরামর্শ* করে। কিন্তু কুরআনের ঐ চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলার জন্য কোনো পরামর্শ সভা গোপনেও ডাকে না, প্রকাশ্যেও না।

১১) কুরআন চুরি ও যেনার শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. কোনোদিন এই শাস্তি থেকে কাউকে রেহাই দেননি। অথচ বদরের যুদ্ধে যারা তাঁর মাথার উপর তরবারি তুলেছে, তিনি তাদেরও ক্ষমা করে দিয়েছেন। নবী কুরআনের বাণীবাহক ছিলেন, কুরআনের অনুসারী ছিলেন। অথচ সংশয়বাদীরা নবীর সাথে কুরআনের বাণীর তালগোল পাকিয়ে নিজেরা বিভ্রান্ত হচ্ছে, অন্যকেও সন্দেহের বেড়াজালে আটকে দিচ্ছে।

১২) কুরআন যেমন আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম, নবীও তেমনি তাঁর প্রেরিতপুরুষ। ইসলাম তাঁর মনোনীত দ্বীন। আল্লাহকে যে চিনেনি সে নবী, কুরআন ও দ্বীনকে চিনেনি। মরিস বুকাইলির মতো গ্যারি মিলার কুরআনকে নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। একটি ঘটনার কথা তার মুখে শুনুন : কানাডার টরেন্টোতে এক নাবিক ছিলেন, যিনি সমুদ্রে জীবন কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন অমুসলিম, তার এক বন্ধু ছিলো মুসলমান। বন্ধু তাকে একটি কুরআন দিলেন পড়ার জন্য। পড়া শেষ করে কুরআন ফেরত দিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন : *এই মুহাম্মদ কি নাবিক ছিলেন কখনো?* বন্ধু বললেন : *না, বরং তিনি মরুভূমির বাসিন্দা ছিলেন।* ব্যস, মুহূর্তে নাবিক কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। কুরআনে সমুদ্রে ঝড়ের যে বর্ণনা তিনি পড়েছেন, তা কেউ প্রত্যক্ষ না করে বলতে পারে না।

১৩) নবীজি কোনো রোগের উপশমের জন্য ঔষধের নাম বলে দিতেন। অতিউপকারী এসব ঔষধের কোনো উল্লেখ কুরআনে নেই। নেই এজন্য, বিজ্ঞান ও আবিষ্কার থেমে থাকবে না; নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে ঔষধের পরিবর্তন হবে, যুগের পরিবর্তনে নতুন ঔষধ আবিষ্কৃত হবে। আর কুরআন ত্রুটিমুক্ত থাকবে, এটা ছিলো আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত। তবে একটি ঔষধ তখনো কার্যকরী ছিলো, এখনো আছে, তাহলো মধু। এখানে আরেকটি ব্যাপার প্রণিধানযোগ্য। কুরআন বলেছে স্ত্রী মৌমাছিরা বাসা ছেড়ে বাইরে যেয়ে মধু সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। আজ থেকে মাত্র চারশত বৎসর পূর্বেও সেক্সপিয়র লিখেছেন, এই মৌমাছিরা পুরুষ এবং সৈন্যবাহিনীর মতো বাসায় ফিরে একজন রাজার কাছে

নিজেদের সমর্পিত করে। এটাই ছিলো তখন পর্যন্ত মানুষের বিশ্বাস। তারও একশত বৎসর পর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন : *পুরুষ নয়, স্ত্রী মৌমাছিরাই ফিরে আসে এবং একজন রাণী মৌমাছির কাছে তারা হাজিরা দেয়।*

১৪) কুরআন চৌদ্দশত বৎসর পুর্বে বলেছে, যা কিছুতে প্রাণ আছে, তার সবই পানি দিয়ে তৈরি। এই কথাটি প্রমাণ করে অমুসলিমরা ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। চিন্তা করুন, চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে একজন মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আরেকজনকে বলছেন : এই যে যা কিছু দেখছো তোমার দেহে, তার সবটাই প্রায় পানি দিয়ে তৈরি; কি অবিশ্বাস্য কথা! এই সূত্রটি আবিষ্কারের জন্য মাইক্রোস্কোপের দরকার হয়েছিলো এবং এই মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার হয় সেদিন মাত্র। এই যন্ত্রই আবিষ্কার করে, একটি সেল মূলত অসংখ্য সাইটোপ্লাজম দ্বারা গঠিত এবং এই সাইটোপ্লাজমের ৮০% পানি। সংশয়বাদীরা কি বলবে, মুহাম্মদ সা. কোনোভাবে হয়তো তা জেনেছিলেন। তাহলে কি তিনি একটি মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করে তার মাধ্যমে ব্যাপারটি জেনে নিয়ে ঐ যন্ত্রটি নষ্ট করে ফেলেছিলেন।

১৫) এবার আসুন মাতৃগর্ভে মানবশিশুর পর্যায়ক্রমে রূপান্তরের কুরআনিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। একবার রিয়াদের কিছু উৎসাহী যুবক এই প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য কানাডার এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে আমন্ত্রণ জানায়। বর্তমান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রূণ বিশারদ ডা. কিথ মুর এই বিষয়ের উপর কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছেন, যা বিশ্বের বৃহত্তম বিদ্যাপীঠসমূহে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আছে। ডা. মুরকে এ প্রসঙ্গে কুরআনের তরজমা শুনানো হলো। মুর মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তার মুখ দিয়ে কথা সরে না। যাই হোক, মুর তার দেশে গিয়ে কুরআনের কথা সবাইকে জানালেন। পরদিন বড় বড় দৈনিকের হেডলাইন– *ডা. মূর কর্তৃক প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার।* এই নিয়ে সারাদেশে কিছুদিন তোলপাড় চললো। এখানে উল্লেখযোগ্য, ডা. মুর কুরআনের ব্যাখ্যা পড়ার পর তাঁর কয়েকটি পুস্তকের কিছু অংশ পরিবর্তন করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ভ্রূণতত্ত্বের এই বিশ্লেষণ, যার সাথে কুরআনের বিশ্লেষণ হুবহু মিলে যায়, তা আবিষ্কার করতে তাঁকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করতে হয়েছে। সংশয়বাদীদের জবাব ডা. মুর নিজেই দিয়েছেন : চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে সম্ভবত কেউ মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেছিলো, পরে তা দিয়ে ভ্রূণ সংক্রান্ত তথ্য জেনে নিয়ে সে মুহাম্মদকে বলে, এই কথাগুলো আপনার কিতাবে লিখে নিন। এরপরে সে ঐ যন্ত্রটি চিরদিনের জন্য নষ্ট করে ফেলে। ডা. কিথ মুর কোনো সংশয়বাদীকে দেখলে নিশ্চয় বলতেন : *তোমাদের কি হাবিলের কাকের বুদ্ধিটুকুও নেই?*

১৬) পবিত্র কুরআনুল কারীমে একটি প্রাচীন শহরের উল্লেখ আছে, যার নাম ইরাম (স্তম্ভের শহর)। এই শহরের সাথে তখনকার মানুষ পরিচিত ছিলো না! এবং ইতিহাস এই শহর সম্বন্ধে কোনো সাক্ষ্য কখনো দেয়নি। মানবজাতির কাছে এই তথ্য ছিলো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সম্প্রতি একটি বিখ্যাত পাশ্চাত্য জার্নাল এক বিশেষ নিবন্ধে লিখেছে : ১৯৭৩ সালে সিরিয়াতে *আলবা* নামে একটি শহর খননকার্যের মাধ্যমে আবিস্কৃত হয়েছে। শহরটি চার হাজার তিন শত বৎসরের পুরাতন বলে বিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেছেন। আলবার লাইব্রেরীতে একটি রেকর্ডে লেখা রয়েছে, আলবাবাসিরা কাদের সাথে কোথায় বাণিজ্য করতো। সেই তালিকায় এ কথাও লেখা আছে, ইরাম শহরের মানুষের সাথে আলবাবাসিরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। এইসব তথ্য অবিশ্বাসীদেরকেও নির্বাক করে দেয়, কিন্তু সংশয়বাদীরা তারপরও মাথা চুলকাতে থাকে। অদৃষ্ট আর কাকে বলে?
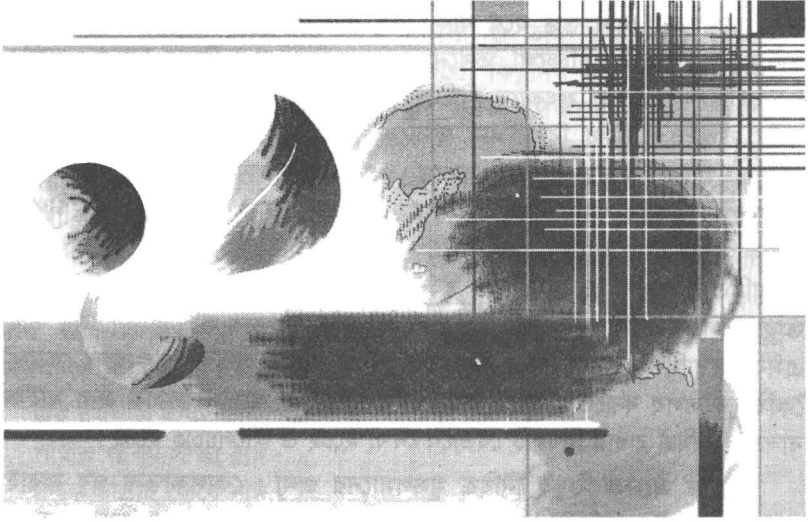
'ওরা দিনের আলো ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়'

আযান একটি আহ্বান এবং একই সাথে একটি ঘোষণাও বটে। একটি উদাত্ত আহবান ও একটি অমোঘ ঘোষণা। এমন একটি ঘোষণা যার মোকাবেলা করতে পারে না অন্যকোনো ঘোষণা। তাই আযানের ধ্বনি ও আওয়াজ এমন হওয়া চাই যাকে অন্যকোনো আওয়াজ যেন অতিক্রম করতে না পারে। আযানের ঘোষণা এমন যা পৃথিবীর সকল কুফরকে স্তব্ধ করে দেয়, সকল শিরককে বাতিল করে দেয়। আযানের ধ্বনি শয়তানের বুকে পদাঘাত হানে। আকাশ ও পৃথিবীকে বিদীর্ণ করে আযান ঘোষণা করে :

আল্লাহই শ্রেষ্ঠ
আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই
নিশ্চয় মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিতপুরুষ
সালাতের দিকে এসো।
মঙ্গলের দিকে এসো।

এই আযানকে কেন্দ্র করে মুসলমান কোনো কোনো সময় বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হবে এটা কোনো বিস্ময়ের কথা নয়। আল্লাহর দ্বীনের আলো নিভে

যাক, আযানের ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যাক, এই কামনা নতুন কিছু নয়। কুরআনুল কারীম যখন অবতীর্ণ হচ্ছিলো, তখনো এমন বাসনার কথা উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে *ওরা দিনের আলো ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়।* কুরআনের বাণী কেয়ামত পর্যন্ত বাস্তবরূপ নিয়ে বিরাজমান থাকবে। তাই আজও এসব কামনা-বাসনা একদল মানুষ অন্তরে পোষণ করছে। এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হাতের আঙুল কামড়াতে থাকবে তারা কেয়ামত পর্যন্ত। মুসলমানের জন্য এই বাধাবিপত্তি অনাকাঙ্ক্ষিত হতে পারে। তার প্রমাণ কুরআনুল কারীমের পবিত্র ঘোষণা। এই বিরোধিতার কারণ খুব সূক্ষ্ম নয়, অতিস্পষ্ট। আমরা যারা এর কারণ বুঝি না তারা আসলে বুঝার চেষ্টা করি না অথবা বুঝে না বোঝার ভান করি। আর তাই এসব বিরোধিতার নানা বিচার-বিশ্লেষণ করতে লেগে যাই। সম্ভব হলে কোনো কৈফিয়ত তলব করতেও সচেষ্ট হই। যেমন ভারতে আযান দেয়ার জন্য মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ করার বিষয়টি যেভাবে দেখা হচ্ছে ও আলোচিত হচ্ছে।

ভারতে অনেক কিছুই নিষিদ্ধ মুসলমানের জন্য। কোলকাতায় গরু জবাই এমনকি কুরবানি পর্যন্ত মুসলমানদের নিজের মহল্লায়ও এখন আর নিরাপদ নয়। গরু জবাই নিষিদ্ধ হলেও গরুর মাংস খুব উপাদেয় এটা সবাই খুব জানে। আর তাই কোলকাতার মুসলিম হোটেলে খেতে গিয়ে দেখেছি কিভাবে মাটির হাড়িতে মাংস কাদের কাছে কতভাবে চালান হয়ে যায়?

বিংশ শতাব্দীর নিষ্ঠুরতম সংবাদগুলোর একটি সংবাদ যা শুনে সারাবিশ্ব ধিক্কার দিয়েছে, তা হলো বাবরী মসজিদ ধ্বংস। রামের জন্মভূমি একটি পবিত্র জায়গা। বাবরের তৈরি মসজিদও পবিত্র উপাসনালয়। তবু কেন দুনিয়ার মানুষ রামের স্মৃতিকে ধারণ করার চেয়ে বাবরের প্রতিষ্ঠিত মসজিদকে অধিক গুরুত্ব দিলো? তাহলে কি আধুনিক যুগের মানুষ রাম জন্মকাহিনী বিশ্বাস করতে চায়নি? হনুমানের ইণ্ডিয়া থেকে কলম্বো পর্যন্ত ফ্লাইং করে লঙ্কায় এয়ার এ্যাটাক, লঙ্কাকে পুড়িয়ে ছারখার, রাক্ষস জাতীয় এক বিচিত্রপ্রাণীর পরাজয় এবং অবশেষে ফিরতি ফ্লাইটে সীতাকে নিয়ে হনুমানজীর ইণ্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তন, এসব বিশ্বস্ত কথা কি মানুষ বিশ্বাস করতে চায়নি? মানুষতো তার প্রস্তরযুগ, লৌহযুগ, বিবর্তন-পরিবর্তন, ইতিহাস উৎস সবই সন্ধান করে পেরেশান হয়ে আছে। তারা কি জেনে ফেলেছে , রামের জন্ম এই পৃথিবীতে কখনো হয়নি? অতএব অযোধ্যার মাটিও তার পদচুম্বনে কখনো ধন্য হতে পারেনি। রাম যদি বাস্তব না হয়ে থাকেন, তাহলে রামরাজ্য বাস্তবায়িত হবে কেমন করে? অযথাই কি তবে একটি পবিত্র মসজিদকে ভেঙে দিলো ওরা? ভুল বুঝতে পেরে তাদেরই বংশধররা হয়তো আবার ঐ মসজিদ পুনঃনির্মাণ করবে এবং গভীর সিজদায় মাথা অবনত করে তাদের পিতৃপুরুষের ভুল শিকার করে নেবে।

তালাক সংক্রান্ত খোরপোষ নিয়ে মামলা ও তার রায় নিয়ে ভারতের মুসলিমসমাজে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিলো কিছুদিন আগেও। কুরআনকে নিষিদ্ধ করার জন্য আইনের আশ্রয় নেবার ধৃষ্টতা দেখানো হয়েছে ভারতের মাটিতেই। দ্বীনের আলোকে নিভিয়ে দেবার এসব প্রচেষ্টাতো অব্যাহত আছেই, সে সাথে আছে ঈমানকে কুফরের দিকে ধাবিত করার নানাবিধ কৌশল। মুসলমানের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু। কিন্তু ভারতের মুসলমানদের সমবেত কণ্ঠে বলতে হবে, *জনগণমন অধিনায়ক জয়হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।* আরো বলতে হবে, *বন্দে মাতরম।* ইসলাম যখন বিজয়ীর আসন ত্যাগ করে মুসলমানের মানা না-মানাতে কোনো তফাৎ থাকে না। তখন মুসলমানও সাম্যের গীত গায় পরম আহ্লাদে, যেমন :

জয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতা রাম
ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম।
সবকো সুমতি দে ভগবান।

আল্লাহ্ পাক মুসলমানকে কোনো সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হবার সুযোগ দেননি। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা নিজেও সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে বিরাজমান। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নামকে শিরকমুক্ত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর শানকে তার মর্যাদায় আসীন রাখতে মুসলমান কোনো আপোস করতে পারে না; আর পারে না বলেই আজ থেকে ৬২ বছর পূর্বে ১৯৪৭ সালে জমিনকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। কাদের জন্য এই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিলো, তা কি আমরা জানি না? নাকি জানতে চাই না? ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ইতিহাস নিজেই ঘটিয়ে থাকে। আজ যারা তাদের পিতৃপুরুষকে চিনতে চায় না তাদের জন্য ইতিহাস অপেক্ষা করে থাকবে যখন তাদের পূর্বপুরুষরা আজকের এসব পূর্বপুরুষদেরকে চিনতে চাইবে না।

মাইকে আযান নিষিদ্ধ করার পক্ষে রায় দিয়েছেন কোলকাতা হাইকোর্টের কয়েকজন বিচাপতি। বিচারপতিরা কোনো সাধারণ মানুষ নন। তারা বুদ্ধি খাটিয়ে রায় দিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে ভারতের সাধারণ মানুষ যা চায় তারচেয়ে কিছু বেশি চেয়ে থাকেন অসাধারণ মানুষরা। যেমন বঙ্গভঙ্গ রদ করতে যারা মাঠে নেমেছিলেন তাদের পুরোভাগে ছিলেন অসাধারণরা। এরা যা করেন বুঝেশুনেই করেন।

আযানের ধ্বনি উচ্চ হবে না নিম্ন হবে এটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন বিচারপতিরা। বিচারে তারা নিরপেক্ষ ছিলেন কিনা তা নিয়ে বিস্তর কথা বলা যায়, বলা হচ্ছেও। তবে তারা আযানকে বুঝতে ব্যর্থ হননি, কেননা তারা

তাদের সমাজের পণ্ডিত ব্যক্তি। আমাদের সমাজেও যেমনটা বুঝেছিলেন এক পণ্ডিত কবি। আযানের ঘোষণা পণ্ডিত বিচারকদের শুধু কর্ণকে বিদীর্ণ করেনি, অন্তরকেও বিচলিত করেছে, চিত্তকে অস্থির করেছে। তাই বিচার-বিবেচনা শিকেয় তুলে দিয়ে যে রায় না দিলেই নয়, তাই দিয়ে দিলেন অর্থাৎ মাইকে আযান দেয়া যাবে না। কেন দেয়া যাবে না? আসুন সে কথায় যাই।

(১) আল্লাহই শ্রেষ্ঠ : মহান আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মুখে বলা সম্ভব হলেও তা অনুমান করা কোনো সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর সৃষ্টিজগত কত বড় সেটাই কেউ অনুমান করতে পারে না, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কত বড় তা জানা তো বহু দূরের কথা। মুসলমান আল্লাহ পাকের ৯৯টি গুণসম্পন্ন নাম জানে। প্রতিটি গুণে আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর সাথে যাদের পরিচয় নেই, আল্লাহকে চিনে না, তারা অন্যকিছুকে বড় মনে করবে, আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে বড় মনে করবে অথবা কোনো কিছুকে বড় বানিয়ে নেবে যার কোনো দলিল তাদের কাছে নেই। যুগ যুগ ধরে তাদের পূর্বপুরুষ যা মানছে তারাও তা মানছে। এসব মানুষ চিরাচরিত অভ্যাসের কারণে মানতে পারছে না যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ। যা মানতে চাইছে না, তা শুনতেও চাইছে না। তাই *আল্লাহই শ্রেষ্ঠ*– মুয়াজ্জিনের এই ঘোষণা তার কিংবা অন্যের কর্ণকুহরে পৌছুক সে তা চাইবে না। তার সত্য বিমুখ অন্তর স্বভাবতই ঈর্ষান্বিত হবে এবং মুয়াজ্জিনের ঘোষণাকে প্রতিরোধ করতে বাধারপ্রাচীর তৈরি করবে।

(২) আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই : মুয়াজ্জিন জগতবাসীর প্রতি ঘোষণা দেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তার এই ঘোষণা কুফর ও শিরকের ভিতে নাড়া দেয়। যাদের অগণিত ইলাহ আছে, ঈশ্বর-ঈশ্বরী আছে তাদের বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে। কল্পনা ও মাটির তৈরি ইলাহরাও হয়তো করুণ চোখে তাদের ভক্তদের দিকে তাকিয়ে থাকে (!) মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে বিশ্ববিধাতার এই সুকঠিন ঘোষণা অবিশ্বাসীর হৃদকম্পন বাড়িয়ে দেয়। তাদের মিথ্যা ও ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর তাই এই অমোঘ ঘোষণাকে প্রতিহত করতে তারা পরামর্শ করে। এই আওয়াজকে নির্ধারিতসীমার বাইরে যেতে বাধা দেয়। আল্লাহকে মাবুদ বলে যারা জানে তারা এই রহস্যটুকু জানবে না কেন? একমাত্র মুনাফিকরাই অবিশ্বাসীদের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনে এগিয়ে আসে। অসংখ্য ইলাহর কাছে যারা মাথানত করে এবং এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করে তারা যখন আযানের ধ্বনিকে স্তিমিত কিংবা অনুচ্চ করে দিতে আবদার করে, তখন মুসলমানের সতর্ক হওয়া উচিত। কেননা এটা কোনো সামান্য আপোসরফা নয়, বরং এটা ইসলাম ও তার অনুসরণকারীর অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করার আবদার।

আল্লাহর দ্বীনকে কৌশলে পরাজিত করার ফন্দি বৈ আর কিছু নয়।

(৩) নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিতপুরুষ : খৃস্টান ও ইহুদিরা আল্লাহকে মানতো কিন্তু শিরক করে ও মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল না মেনে তারা কাফেরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঈশ্বরের স্বয়ং অবতাররূপে অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদে যারা বিশ্বাস করে তারাও আল্লাহর প্রেরিতপুরুষদের সংবাদ থেকে বঞ্চিত থেকেছে। মুয়াজ্জিন বলেন, *আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।* আযানের জবাবে মুসলমানরাও এ সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন। অন্যদের তখন কি প্রতিক্রিয়া হয়? একজন একটি ঘোষণা দিলেন, যারা শুনলো তাদের একদল তাকে সত্যায়ন করলো ও মেনে নিলো। ভিন্নদিকে যারা শুনলো কিন্তু চুপ করে থাকলো তাদের অবস্থা কি? তারা মানলো না বরং অস্বীকার করলো। এ অস্বীকার কখনো চুপ থেকে করে, কখনো বাধা দিয়ে করে। মাইকে আযান দিতে বাধা দেয়ার অর্থও খুব পরিস্কার। উম্মতে মুহাম্মদীর দাবিদাররা অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হলে নবীর মুহাব্বতে আপ্লুত হয়ে উঠে। এমনি বিপদে পড়েই একসময় সবাই নামের পূর্বে মুহাম্মদ লিখতে শুরু করেছিলো। বিপদ কেটে গেলে আবার আকাশ, সাগর, জয়, বিজয় লেখা শুরু করে। দুর্দিনের কথা বেমালুম ভুলে যায়। ভারতের মুসলমানরা শিরা-উপশিরায় উপলব্ধি করছেন তারা পরাজিত বলেই তাদের দ্বীন পরাজিত। দ্বীন যেখানে পরাজিত সেখানে মুসলমানের জীবনযাপন বৃথা, অর্থহীন। মুসলমানের জীবনের কামিয়াবি তার দ্বীনের কামিয়াবিতে।

(৪) সালাতের দিকে এসো : মুয়াজ্জিন সবাইকে আহ্বান করেন সালাতের দিকে আসার জন্য, যেখানে দয়াময় আল্লাহর সমীপে একনিষ্ঠ হয়ে এক কাতারে দণ্ডায়মান হবে ছোট-বড় সবাই। যেখানে থাকবে না উচু-নীচু, শ্বেত-কৃষ্ণ ভেদাভেদ। সকলে এক প্রভুর পদতলে মাথানত করতে সিজদায় পড়বে। দু'হাত তুলে তার কাছেই প্রার্থনা জানাবে। যারা একত্ববাদী নয়, সালাতের এসব মহত্ব থেকে যারা দূরে অবস্থান করে তারা সংগত কারণেই মুয়াজ্জিনের ঐ আহ্বানের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে।

(৫) মঙ্গলের দিকে এসো : আহ্বানকারী মঙ্গলের দিকে আহ্বান করছেন। এ মঙ্গল শুধুমাত্র দুনিয়ার মঙ্গল নয়, পরকালেরও মঙ্গল। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা আসেন তারা দুনিয়ার মঙ্গলের চেয়ে অধিক কামনা করেন পরকালের মঙ্গল। অন্যদিকে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে যারা আরেক ঠিকানায় যাবেন তাদের ঠিকানা আর দ্বীনের আলো পথ দেখিয়ে যে ঠিকানায় নিয়ে যাবে দু'টির গন্তব্য এক নয়। বরং মুয়াজ্জিনের আহ্বান শুনে যারা মঙ্গলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে

তারা অন্যদের গন্তব্যস্থলে না যাবার জন্য কান্নাকাটি করে, আকুলভাবে প্রার্থনা করে। দুনিয়াতে ভিখারীর জীবনযাপন করতে রাজি থাকেন, তবু ঐ আগুনের আলো ও উত্তাপের কাছে যেতে রাজি হন না। মুয়াজ্জিনের উচ্চকণ্ঠ আওয়াজ যে মঙ্গলের দিকে আহবান করে সেই মঙ্গল নসিব হওয়ার জন্য ইসলামের পুন্যজগতে আশ্রয় নিতে হয়। অন্যথায় যারা আযানের টুটি চেপে ধরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিতে চায়, তাদের সান্নিধ্যে থাকলে অপমৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে।

কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরা কেন আযানের আওয়াজকে নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দিলেন তা বুঝার জন্য গভীর চিন্তার প্রয়োজন নেই, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরও দরকার নেই। আমরা আমাদের পিতৃপুরুষের জীবনের দিকে ফিরে তাকালেই দেখতে পাবো, এসব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র। ইতিহাসের এসব বাঁক ঘুরেই আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের জন্য বসতিনির্মাণ করে গেছেন। যখন তারা ইসলামের পতাকার নিচে আশ্রয় ও সমবেত হয়েছিলেন, তখনই তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো, আখিরাতে মুমিন-মুশরিকের ঠিকানা এক হবে না। আমাদের মহৎপ্রাণ পরম জ্ঞানবান পূর্বপুরুষ দুনিয়া থেকেই তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছার জন্য নিজস্ব ভুবন তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, আর তারা তা তৈরিও করে গিয়েছিলেন।

সামজিকভাবে কুরবানী ও গরু জবাই নিষিদ্ধ ঘোষণা, মুসলিম আইনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা এবং কুরআনকে নিষিদ্ধ করার জন্য আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়ার পরও কেন মুসলমান রাখিবন্ধনে ব্যর্থ হচ্ছে এ নিয়ে অনেক মাসিমার সন্তানরা শোকে মুহ্যমান হয়ে আছে। মুসলমানের সন্তানরা যখন দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতি কটাক্ষ করে তখন খোঁজখবর নিয়ে জানতে ইচ্ছা করে এদের গলদটা কোথায়? দ্বিজাতিতত্ত্ব এ ভূখণ্ডের মুসলমানদের নবআবিস্কৃত কোনো তথ্য নয়। দেড় হাজার বছর পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মুশরিকদের পরাস্ত করেছিলেন এবং জাজিরাতুল আরব থেকে ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুসলিম জাতিসত্তা তার স্বাতন্ত্র নিয়ে ইতিহাসের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছে। শংকর শ্রেণীর মুসলমান এ কাফেলায় কখনো যোগ দিতে পারেনি বিধায় এর উদ্দেশ্য ও গন্তব্য সম্বন্ধে অনবহিত থেকে যায়, আর অবান্তর কথা বলতে থাকে।

যে নামাজ পড়ে না তার আযান শোনার দরকার হয় না। প্রতি রমজানে যার আলসার হয় ডাক্তারের পরামর্শে দিনেরবেলা কিছু না কিছু খেতে হয়। কোটি কোটি টাকার মালিক অথচ ব্যাংক-ঋণ থাকার অজুহাতে যাকাতের হিসাব করতে পারে না। বছর বছর আজমির গিয়ে মানত করে আসে, আর হজ্বের সফর মুলতবি করে রাখে সেই পর্যন্ত, যখন মানত করার প্রয়োজন থাকবে না।

মুসলমান পিতা-মাতার সন্তান হিসাবে নিজেও মুসলমান হয়ে ঈমানকে ধারণ করেছে, অথচ ইসলামধর্ম আর মানবধর্ম দুটোরই জয়গান গায় যদিও জানে একদল ধর্মহীনমানুষ মানবধর্মের আবিষ্কর্তা। আযানের ধ্বনি শুনে যে কবির বেশ্যার কথা মনে পড়ে যায়, তার ভক্তরা মুসলমান পিতা-মাতার ঘরেও জন্মগ্রহণ করেছে, জন্মের পর এ হতভাগাদের কানের কাছে তাদের পূণ্যবান পিতা বা পিতৃতুল্য কেউ আনন্দ ও আবেগজড়িত কণ্ঠে আযান শুনিয়েছেন।

আযান শোনার জন্য যাদের কান উদগ্রীব হয়ে থাকে, তারা দয়াময়ের মেহেরবানিতে আশ্রিত। তাদের তৃষিত অন্তর দয়াময়ের নামের সুধায় সিক্ত। তাদের হৃদয়বীণায় দয়াময়ের কথামালা ঝংকৃত। মুয়াজ্জিন যখন আযান দেন তখন তারা জবাব দেন। মুয়াজ্জিন যখন বলেন, সালাতের দিকে এসো, মঙ্গলের দিকে এসো, তখন তারা বলেন, দয়াময় ছাড়া কোনো সহায় নেই, কোনো শক্তিও নেই যে তাঁর মেহেরবানি ব্যতীত স্বেচ্ছায় এ আহবানে সাড়া দিতে পারে।

বাংলাদেশ পীর-ফকিরের দেশ

খুব জোর গলায় আমরা বলি, বাংলাদেশ পীর-ফকিরের দেশ, উলামা-মাশায়েখের দেশ, অলি-আউলিয়ার দেশ। তাদের পুণ্যস্মৃতিতে ধন্য আমাদের এই জন্মভূমি। তাদের পায়ের চিহ্ন ধারণ করে আছে এখানকার প্রতিটি জনপদ। কিন্তু কেমন পীর-মাশায়েখ ছিলেন তারা? এ যুগের পীর-দরবেশদের আস্তানার সাথে তাদের কি কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে? খুব জোর গলায় কি বলা যাবে, সেই পুণ্যবানদের জীবনযাপনের সাথে আজ কারো মিল আছে?

হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী র. তিনশ ষাটজন সেনানায়কের মুর্শিদ ছিলেন।

পীর জঙ্গী বঙ্গদেশ থেকে মুজাহিদ সংগ্রহ করে দিল্লি পাঠাতেন।

হাজী শরিয়তুল্লাহর নাম নিয়ে শরিয়তপুর কতখানি ধন্য হয়েছে বলা মুশকিল, তবে তিনি ভারতরত্ন ছিলেন। ভারতের আযাদী-আন্দোলনের ইতিহাসে এই রত্নের অবস্থান নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল।

একটি পরিবার, তাদের সংগ্রাম, তাদের প্রতিভা ও জ্ঞান এবং সেই সাথে পীর-মুর্শিদের গৌরবময় ঐতিহ্য এসবই সেই কামিল পুরুষের চিন্তা-চেতনার ফসল।

ফকির মজনু শাহ আড়াই হাজার অনুসারী নিয়ে যখন ঘোড়াঘাটে পৌঁছেন, তখন ইংরেজ সেনাপতি আরো সৈন্য পাঠানোর জরুরিবার্তা পাঠায় হেডকোয়ার্টারে। এতে বুঝা যায়, এরা কেমন ফকির ছিলেন!

বগুড়ায় অবস্থিত মজনু শাহর দুর্গটি ছিলো গভীর জঙ্গলে অবস্থিত। শুধু পূর্ববঙ্গ নয়, সারা ভূভারতই ছিলো কালজয়ী পীর মুর্শিদের চারণভূমি।

মাওলানা সৈয়দ নিসার আলী কুরআনের হাফেজ ছিলেন। ধর্মপ্রচারক ছিলেন। অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। মুজাহিদের প্রশিক্ষক ছিলেন। আমরা তিতুমীর আর বাঁশের কেল্লা ছাড়া আর কী-ইবা জানি? কত বড়মাপের একজন মানুষ অথচ কত তুচ্ছ আমাদের হিসাব-নিকাশ?

সৈয়দ আহমদ শহীদ যিনি ইতিহাসে বালাকোটের শহীদ বলে পরিচিত।

হাজী ইমদাদুল্লাহ। যিনি ইংরেজের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে হিজরত করেন এবং মুহাজেরে মক্কী বলে খ্যাত হন।

মুজাদ্দেদে আলফে সানী তথাকথিত মহান সম্রাট আকবরের ভ্রান্ত দ্বীনে এলাহীর বিরুদ্ধে ছিলেন এক অকুতোভয় মর্দে-মুমিন।

মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী ও মাওলানা কাসেম নানুতুবী সাতান্নর আযাদী আন্দোলনের মহানায়ক ছিলেন। এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিয়ে সাতশ' উলামা-মাশায়েখকে ফাঁসি দেয় ইংরেজ। তাদের অনুসারী প্রায় ত্রিশ হাজার মুসলমান শাহাদাত লাভ করেন ফাঁসি, গুলি ও জেলখানার নির্যাতনে। আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী আন্দামানের দ্বীপান্তরে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর সময়ও কাফনের কাপড়ে মুক্তিরবার্তা লিখেছেন।

দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহ সংস্কারের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, তার বাস্তবায়ন করা কোনো আউল-বাউল ফকির বা ধ্যানমগ্ন দরবেশের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

ভারতবর্ষের মতো এক বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি বাদশাহ আলমগীর জিন্দাপীর বলে তার জীবদ্দশায় খ্যাত হয়েছিলেন; অথচ রাজ্যশাসনের পঞ্চাশটি বছর খ্যাত হয়ে আছে অসংখ্য যুদ্ধের ঘটনা ও অভিযানের ইতিহাসে।

এই হলো আমাদের অতীত ইতিহাসের পুণ্যস্মৃতি। এসবই আমাদের গৌরবগাঁথা। এদেরই আমরা উত্তরসূরি। তাদের পুণ্য বিশ্বাসের ফল আজ আমরা বাংলাদেশের মুসলমান। আজ সেইসব পীর-মাশায়েখের মাজারগুলো ধুপ-ধুনায় অন্ধকার হয়ে গেছে। আলোরদিশারী আলিমদের গুণকীর্তন করেই তাদের ভাবশিষ্যরা পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। সেসব কীর্তিমান পুরুষ আল্লাহর অলি ছিলেন ঠিকই, তবে ঝোপ-জঙ্গলে ধ্যান করে তারা জীবন অতিবাহিত করেননি। তসবিহ তাদেরও ছিলো, তবে তা হাতে নয় অন্তরে ছিলো; হাতে ছিলো তরবারি। ইসলামের নিরাপদ বসতি স্থাপনে তারা বুকের তাজা রক্ত প্রবাহিত করলেন আর আমরা জমিনে জঙ্গল আবাদ করেছি, যাতে জন্তু-জানোয়াররা নিরাপদ আশ্রয় পায়।

আল্লাহ পাক অবিশ্বাসীদেরকে কি জন্তু জানোয়ার কিংবা তারও অধম বলে ভর্ৎসনা করেননি? গালি দেওয়া দয়াময়ের শানের খেলাফ। কিন্তু পশু আর

মানুষের তফাৎ এতোটুকুই, মানুষ বুদ্ধিমানপ্রাণী আর পশু নির্বোধপ্রাণী। মানুষ নির্বোধ হয়ে গেলে তখন তার মানুষ পরিচয়টি তার থাকে না। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা বলে আখ্যায়িত করেছেন। পশু আর মানবের প্রসঙ্গ স্বভাবতই আছে। কারণ শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। দ্বীন এখন এমন খেল-তামাশা হয়েছে, হাততালি দেয়ার মতো কিছু একটা করাই যেন দ্বীন। আর দুটি দুর্বল হাতই তালি মারার জন্য যথেষ্ট।

মুজাহিদ ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.।

মুজাহিদ ছিলেন তার সোয়া লাখ জলীলুলকদর সাহাবী এবং পরবর্তী প্রতিটি যুগে ঈমানের আহ্বানকারী মর্দে-মুমিনরা ছিলেন মুজাহিদ।

পৃথিবীর প্রাচীনতম জাহেলিয়াতের ঐতিহ্য বহন করতো আমাদের এই জনপদ। এই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মুশরিক জনপদে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা খুব সহজ কাজ কখনও ছিলো না। এখন এই যুগে ক'জন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে অবিশ্বাসীর দুয়ারে পৌঁছতে পারে? আমাদের পূর্বপুরুষ পুণ্যবান পীর-মাশায়েখ ও উলামায়ে দ্বীন কী কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে কামিয়াব হয়েছিলেন সেই ইতিহাস দুর্বলচিত্ত মানুষ স্বভাবতই উপেক্ষা করবে। ঈমানের দাওয়াত মানে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা; অন্যের প্রতি আরোপিত সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করা এবং এই প্রত্যয়-প্রতিষ্ঠায় জীবনযাপন করা। এই দুরূহ কাজটির আঞ্জাম দিতে তখন সাহসের প্রয়োজন হয়েছিলো সঙ্গত কারণেই। আজ সাহসের অভাবে কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী পাল্টে গেছে। তবে এখন সমাজে জাহেলিয়াতের কালোথাবা ভেঙে দিতে হলে প্রকাশ্য রাজপথে *সাহাবা সৈনিকদের সমাবেশ* করতে হয়। মাসের পর মাস ধরে দেশজুড়ে অপসংস্কৃতির জাল বিস্তার করে শিকার যখন ডাঙ্গায় তুলবে, ঠিক তখনই সামান্য কয়েক মিনিটের সমাবেশ আর অল্পকিছু পথ পরিক্রমাই যথেষ্ঠ হয় শয়তানের পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিতে। শয়তানের বিরাট আয়োজনকে মাত্র দু'একজন পীর মাশায়েখ রুখে দিতে পারেন এই দৃশ্য হাবিলের কাক দেখলো, দেখলো না কেবল তারাই যারা ভণ্ডপীরের মুরীদ হয়ে নিজের দুনিয়া-আখিরাতকে অন্ধকার করে রেখেছে।

এদেশ যথার্থই পীর-আউলিয়ার দেশ। নেতৃত্ব তাদেরই। নির্দেশ তারাই দিতে পারেন। কেননা তাদের নির্দেশ পালন করা হবে সমবেতভাবে, এই ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করে না। শত্রুও না, মিত্রও না। তবে এই নির্দেশের জন্য তাদেরও ময়দানে আসতে হয়, মঞ্চে দাঁড়াতে হয়, পথে নামতে হয়। এই বাস্তবতা আগে ছিলো, এখনও আছে। পীর-আউলিয়ারা এদেশে এসে কখনও কোনো তেলেসমাতি দেখাননি। আল্লাহর দ্বীনকে জমিনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবনকে উৎসর্গ করার অনন্য দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছেন, আল্লাহর পথে

একনিষ্ঠ সংগ্রামীর প্রতি কিভাবে খোদায়ী নুসরত নাযিল হয়, কিভাবে আল্লাহপাক তার বান্দার প্রতি কৃত ওয়াদা পালন করেন; এসব অপরূপ দৃশ্য মানুষকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। আলিম ও মাশায়েখরা তাদের তালেব শিষ্যদের শিখিয়েছেন কিভাবে কালেমার জন্য হাসিমুখে ফাঁসির দড়িতে জীবন দিতে হয়।

আজ যখন কোনো বেয়াদবকে মনে করিয়ে দিতে হয়, এদেশ পীর-মাশায়েখের দেশ, তখন একথাও উচ্চারণ করতে কেন দ্বিধা হয়, ঐসব মর্দে-মুমিনরা মুজাহিদ ছিলেন। তাদের শিষ্য-সাগরিদরাও মুজাহিদ ছিলেন, তাদের ছাত্ররা মুজাহিদ ছিলেন এবং আজো সেই একই সিলসিলায় কালেমা বিশ্বাসীরা পথ চলছে। অতএব অযথাই কেউ এই পথকে পিচ্ছিল না করুক, পথে কাঁটা বিছিয়ে না রাখুক, পথকে বিপজ্জনক করার দুঃসাহস না দেখাক।

পদ্মফুল যেমন স্বচ্ছ সরোবরে জন্মে, তেমনি মরণজয়ী মুজাহিদের রূহানী শক্তি জন্ম হয় দ্বীনের আলোকোজ্জ্বল পাঠশালায়। কালেমার বিদ্যাপীঠে কুরআনের দরসে যে জীবন তৈরি হয়, সেই জীবনই অপার বিশ্বাসে সওদা হয় দয়াময়ের হাটে, জান্নাতের বিনিময়ে। যেগুলোকে আমরা এখন মাদ্রাসা বলি।
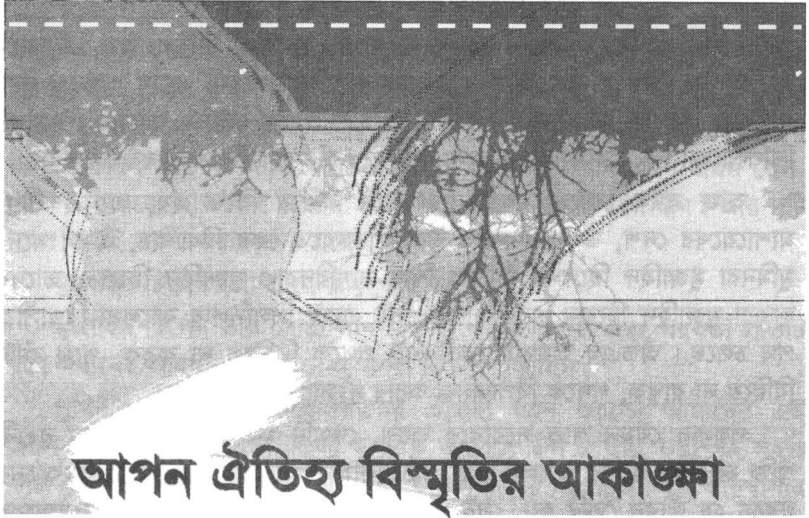
আপন ঐতিহ্য বিস্মৃতির আকাঙ্ক্ষা ও মুনাফিকের সংখ্যা

মাইকে আযান নিষিদ্ধকরণ ও কুরবানি প্রতিরোধের হেতু কি?

লোকমান হাকিমকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, হিকমত শিখলেন কোথায়? জবাবে লোকমান হেকিম বললেন, হিকমত শিখেছি মূর্খের কাছে। ওদের মূর্খতাই আমাকে হিকমত শিক্ষা দিয়েছে।

আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন, আল্লাহকে চিনলেন কি করে? আমি লোকমান হাকিমের অনুকরণে বলবো, চিনেছি আল্লাহবিমুখদের কাছ থেকে; ওদের হাল-অবস্থা দেখেই আল্লাহকে চিনতে পেরেছি। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক বলেছেন, *তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে আর আল্লাহও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন; তারা ফাসিক।*

ভুলে যাওয়ার সাথে চেনা-জানার প্রশ্নটি জড়িত থাকে। একদল লোক আল্লাহকে চিনতো কিন্তু ভুলে গেছে। আমাদের বর্তমানকালের একটি প্রজন্ম প্রায় এরকমই। ভুলে যাবার প্রতিফল যথারীতি ভোগ করতে শুরু করেছে অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে গেছে। আত্মবিস্মৃতি এক নির্মম শাস্তি। যখন কেউ আত্মবিস্মৃত হবে তখন সে তার মাতা বা পিতাকে মৃত্যুশয্যায় রেখে বন্ধুদের সাথে জুয়া খেলবে, স্ত্রীর প্রসববেদনার সময় মদের আড্ডায় বিভোর থাকবে, সন্তান-সন্ততির

অসুখ-বিসুখে উদাসীন হয়ে বাইরে ঘুরবে, তাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে, ইলম শিক্ষার ব্যাপারে বেখবর থাকবে, আপনজনদের বিপদাপদে নির্বিকার থাকবে।

শুধু তাই নয়, যে তার মাবুদকে ভুলেছে সে তার নিজ অস্তিত্বকে ভুলবে। সে এমন মানুষ হবে যার সাথে অমানুষের কোনো তফাৎ থাকবে না। তার সাথে জড়পদার্থের কোনো ব্যবধান থাকবে না। সে বিস্মৃতির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আল্লাহকে ভুলে যাবার মাশুল গুণবে। আপন সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যাবার অভিশাপে সে বিস্মৃতির শাস্তি এবং দুনিয়ার জীবনের শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ্ এদেরকে *ফাসিক* বলেছেন। অতএব পরকালের শাস্তি তো রইলই। দুনিয়াতে তাদের কর্মফলের জের টানবে তাদের উত্তরাধিকারী-বংশধররা।

দুনিয়াতে যে দ্বীনহারা হয়েছে সে মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীর জন্য হয়তো কিছু সম্পদ রেখে যাবে, কিন্তু দ্বীনের সম্পদ রেখে যাবে না বিধায় তার সন্তান-সন্ততিরা দ্বীনহীন হয়ে থাকবে। তাদের জীবন উজাড় হয়ে থাকবে। সেই শূন্যস্থান তারা পূরণ করবে বেদ্বীনের রেওয়াজ-রীতিতে। দ্বীনের আমল-আখলাক ও সুন্নতের সৌন্দর্য দিয়ে সংসারকে সাজিয়ে যেতে পারবে না যারা, তাদের রেখে যাওয়া সংসারকে শয়তান সাজিয়ে দেবে শিরক ও কুফর দিয়ে।

ঈমানের উপর হামলা করা শয়তানের সার্বক্ষণিক কাজ। ঈমানের প্রতিরক্ষাকে যারা দুর্বল করে রাখে অচিরই তাতে ফাটল ধরে; একসময় সব প্রাচীর ভেঙে দিয়ে বেঈমানী প্রচণ্ড বেগে প্রবেশ করে তাদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড একাকার করে দেয়। প্রতিপক্ষের অবাধবিচরণে তার আজন্মলালিত সংসার পশুপ্রবৃত্তির লীলাভূমিতে পরিণত হয়। ইসলামবিহীন উন্মুক্ত ঘরে কামপ্রবৃত্তির সাথীরা প্রবেশ করে ঘরের বাসিন্দাদের কুলষিত করে।

যে ঘর অবিশ্বাসীর ঠিকানা হয়ে যাবে, সে ঘরে দ্বীনের আলো তার জ্যোতি হারাতে হারাতে একসময় নিভেই যাবে। আপন ঔরসের সন্তানরা আলো হারিয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে যাবে; এর চেয়ে জন্মান্ধ হয়ে জন্ম নেয়াও মঙ্গলজনক ছিলো তাদের জন্য। দুর্ভাগ্যের জন্য তাদের পিতা-মাতাকে দোষারোপ করেই ক্ষ্যান্ত হবে না, অভিসম্পাতও দেবে। আজ যারা তাদের পিতৃপুরুষের পুণ্যময় জীবনকে মসি লিপ্ত করে যাচ্ছে, আগামীকাল তাদের সন্তানরাই তাদের নামকে উচ্চারণের অনুপোযুক্ত করে ছাড়বে।

একশ্রেণীর মানুষ তার পবিত্র ধর্মের উপর পানি ঢেলে দিয়েছে। সত্যদ্বীনকে ধারণ করে মিথ্যার সাথে সন্ধিস্থাপন করেছে। নিরপেক্ষতার চুক্তিতে স্বাক্ষর করে আত্মতৃপ্ত হয়ে আছে, যদিও নিয়তির অপ্রতিরোধ্য নিয়মে আপন উত্তরসূরিদের জন্য অন্যধর্মে প্রবেশ করার অনুমতি নিজ হাতে সই করে গেছে।

কুরআনুল কারীম আমাদের জন্য জীবন্ত নিদর্শন। আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কালাম, মহান সত্তার সাথে যার সম্পর্ক। এই কুরআনের সাথে ধৃষ্টতা, জীবনবিধান থেকে তাকে নির্বাসন, মানুষের তৈরি তন্ত্রমন্ত্রের পাশাপাশি তার মামুলি আসন, শুধু মুখে ও বক্তৃতায় কুরআনের পবিত্রতা বয়ান– এসব আচরণ কুরআনের প্রতি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কোনো মুসলমানের ঘর এমন নেই যেখানে কুরআন অনুপস্থিত। কিন্তু অধিকাংশই অব্যবহৃত ধুলোমলিন। ভেতরে অমলিন, হাতের স্পর্শ পড়েনি বলে; বাইরে মলিন, ধুলার প্রলেপে একাকার বলে। জীবন্ত নিদর্শন কতদিন আর এভাবে নিষ্ঠুর নিথর হয়ে থাকবে? ঘরের নিষ্ঠুর বাসিন্দাদের ছেড়ে একদিন সে ঘরকে বিরান করে চলে যাবে। শ্মশানের নিরবতা নিয়ে সেই ঘর কতদিনই বা টিকে থাকবে?

যুগ যুগ ধরে যাদের পূর্বপুরুষরা ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য সংগ্রাম করে গেলেন, আজ তারা সংগ্রাম করছে তাগুতকে বিজয়ী করার জন্য। এদের আইন, বিচার, শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজ, অর্থ ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশকে উপেক্ষা করে তৈরি করেছে। এদের সংগ্রামের প্রতিপক্ষ এখন ইসলামও এটা চিন্তাকরতেই কষ্ট হয়। আজ যে সংগ্রামের সূত্রপাত তারা করে গেলো, যেখানে ইসলামকে তাদের পতিপক্ষ হতে হয়েছে তার পরিণতি কত ভয়াবহ হবে সেটা তাদের চিন্তার ব্যাপার নয়। কেননা কেমন দ্বীনের মোকাবেলা করতে যাচ্ছে তা নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা-ভাবনাই নেই। ইসলাম যেমন থাকবে মুমিনের অন্তরে, তেমনি থাকবে জমিনের উপর। তাগুতের বান্ধবরা তাদের সন্তানদের রেখে যাচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে।

এই জনপদে কদাচিৎ এমন একটি মানুষ পাওয়া দুষ্কর ছিলো যে সদম্ভে ইসলামের প্রতিপক্ষে দাঁড়াতে সাহস পেতো। কিন্তু এখন দল বেঁধে রাজপথে এসে হুংকার দিয়ে বলে তাদের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে। যাদেরকে বাদ দিয়ে আমরা আমাদের দ্বীনকে বোঝার, জানার এবং পাবার কথা ভাবতে পারি না, তাদেরকে ধমকি দিয়ে পথে নামতে নিষেধ করে। পথ এখন তাদের, যে পথে তাগুত ও তারা চলবে। যেন ইসলাম পরাজিত হয়ে গেলো। যেন আরো কেউ বিজয়ী হয়ে গেলো। যেন হুংকারে কাজ হয়ে গেলো। যেন ফুৎকারে সব বাতি নিভে গেলো। দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামীদের সাথে যারা দুশমনী করে যাবে, তাদের কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে তাদের সন্তানরা জগতে লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্যের জীবনযাপন করবে।

ইসলামের পতাকাবাহীরা মানুষের সাথে প্রবঞ্চনা করেন না, শঠতা করেন না, মিথ্যার আশ্রয় নেন না; যা বলছেন করছেন দিনের আলোর মতো তা স্পষ্ট। আল্লাহর কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা বলেন না, নবীর কথা বলতে গিয়ে

নিজের কথা বলেন না, কুরআনের কথা বলতে গিয়ে স্বরচিত কথা বলেন না, কোনো কিছুর অপব্যাখ্যা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে তাদের কথায় একদল মানুষ ক্ষেপে যায় কেন? কেন তাদের জ্বালা হয়, যন্ত্রণা হয়? হয় এজন্য যে, এই জাতীয় মানুষের কথা আল্লাহ্ বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআনে এদের বর্ণনা আছে। এদের ঔদ্ধত্য কার বিরুদ্ধে? এই ত্রাস, এই সন্ত্রাস, এই মোকাবেলা কার সাথে? আল্লাহর দ্বীনের প্রতিপক্ষ হয়ে যে কলঙ্কের ছাপ কপালে লাগাবে তা বহুপুরুষেও মুছে যাবে না। যে অভিশাপ নিয়ে মৃত্যু হবে তার জন্য কোনো উত্তরপুরুষের প্রার্থনার হাত কখনো উঠবে না; এমন অভিশপ্তের নাম তার বংশধর নেবে না; নিতে লজ্জা পাবে। তার পরিচয় গোপন করতে সচেষ্ট হবে এবং অলক্ষে অপবিত্র নামকে মুছে দেবে। এটা খুব স্বাভাবিক যার দ্বারা দ্বীনের প্রবাহ প্রতিহত হবে তার রক্তের প্রবাহকে প্রতিহত করে দেয়া হবে। আল্লাহ্ দ্বীনকে প্রতিহত করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেননি। বিদ্রোহীদের রক্তেরধারা কালজয়ী হতে পারে না, এটাই জগতের রীতি।

তবে মানুষের শিক্ষার জন্য কিছু ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটানো সৃষ্টিজগতের রীতি। আজ আমরা আছি, আমাদের পূর্বে আমাদের পিতা-মাতারা ছিলেন। তার পূর্বে তাদের পিতৃপুরুষরা ছিলেন। এই ধরায় দ্বীনের মশাল জ্বালিয়ে একদল পথ চলেছেন; তাদেরই কেউ কেউ আত্মবিস্মৃত হয়ে ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকা পড়েছেন। পিতৃপুরুষের জীবনধারাকে পরিবর্তন করার চিন্তা-ফিকির করছেন। ইতিহাস সাক্ষী, এদের বংশধররা মরা গাঙে বসতি করেছে এবং অচিরেই লুপ্ত হয়ে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে। ইতিহাসের এই বিশেষ দ্রষ্টব্যগুলো আমরা নিয়তই দেখছি, নিকট অতীতে দেখেছি, বর্তমানও তা থেকে বাদ যাবে না। আজ যারা দ্বীনের কাফেলাকে প্রতিরোধ করতে চায়, অতর্কিত হামলায় রক্ত প্রবাহিত করতে চায়, ঈমানের ঝাণ্ডা নামিয়ে দিয়ে বিজয়ী হতে চায়, তাদেরকে খুঁজে পেতে ইতিহাস ব্যর্থ হবে।

তাই বলছিলাম, আল্লাহকে চিনেছি আল্লাহ বিমুখদের চিনেছি বলে; দ্বীনকে চিনেছি দ্বীনহারাদের চিনেছি বলে। যেমন ধরুন, একবাড়িতে খুব ঝগড়া-বিবাদ হয়। সামান্য কিছুতেই ঝগড়া বেধে যায়। এদের চিৎকারে আশপাশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে কয়েকজন নিরপেক্ষ প্রতিবেশীকে দায়িত্ব দিলো কঠোর ব্যবস্থা নিতে। বাড়ির লোকজন তাদের মানতে রাজি হলো। প্রতিনিধিদের একজনকে নেতাও বানানো হলো। এরা বাড়িটিতে গিয়ে হুকুম জারি করলো কেউ কোনো আওয়াজ করতে পারবে না। এদের দাপটে বাড়ির শিশুটির কান্নাও বন্ধ হয়ে গেলো। সকালবেলা একজন তেলাওয়াত করতেন, সেই আওয়াজও স্তব্ধ করে দিলো। অশান্তি দূর করতে গিয়ে বিচারকের দল বাড়িটিকে শ্মশান বানিয়ে দিলো।

কিছুদিন আগে আমাদের দেশেও এমনটা হয়েছিলো। চরম অরাজকতার মধ্যে সবাই কয়েকজনকে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন। এরা নিরপেক্ষ থাকবেন বলে সবাই বিশ্বাস করলেন। তারা নানা হুকুম জারি করলেন। নিজেরা যেমন ভালো তেমন আরো ভালো মানুষ জোগাড় করে মাস তিনেক খুব দাপটে দায়িত্বপালন করলেন। এরা চলে যাওয়ার পর সকলের চক্ষু চড়কগাছ। হায় আল্লাহ! এসব করেছে কি? এরা নিরপেক্ষ ছিলেন কেবলমাত্র ইসলামের ব্যাপারে। সবাই জানলো নিরপেক্ষতাও *আরেকটিপক্ষ*। তিনমাসে ইসলামিশিক্ষার যেটুকু তারা বাদ দিলেন তাতে সবাই শুকরগুজার হলো এই ভেবে, যদি আরো কিছুদিন থাকতেন তাহলে না জানি কোন দশা হতো? হায়রে বিচার, হায় বিচারপতি! দেশের সবচেয়ে জ্ঞানীগুণী লোকের এ কেমন ব্যবহার তাদের নিজ ধর্মের প্রতি? তবে কি তারা আসলে জ্ঞানী ছিলেন না? আল্লাহর মনোনীত দ্বীন থেকে তারা কি মাহরুম ছিলেন? হ্যাঁ, ছিলেন। ছিলেন বলেই যুগ যুগ ধরে সংগ্রামের ফসল আমাদের দ্বীনের শিক্ষাকে যতোটুকু সম্ভব জীবনে প্রতিষ্ঠা করা গিয়েছিলো, তার উপর কুঠারাঘাত করতে পারলেন তারা। ইসলাম জিন্দা হয় কারবালার পর। এই নিষ্ঠুরতা দেখেও আমরা দ্বীনদারী আর দ্বীনহীনদের তফাৎ বুঝবো না?

এতো প্রতিকূল পরিবেশ ও আর্থসামাজিক রাজনৈতিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও অগণিত মহৎ পরিবার তাদের কিছু সন্তান-সন্ততিকে দ্বীনিশিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে পাঠিয়ে দেন, জীবন উৎসর্গ করে কুরআনুল কারীমের শিক্ষাকে অর্জন করে নবীজীর ওয়ারিশ হবার যোগ্য হতে। এরাই যদি দ্বীনের দাওয়াতের কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতেন, তাহলে দ্বীনহীন জ্ঞানীরা জবানকে সামাল দিয়ে চলতো, আল্লাহবিমুখ বুদ্ধিজীবীরা নসিহত করা থেকে বিরত থাকতো; আজীবন একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধকদের মোকাবেলায় আধাশিক্ষিত জ্ঞানপাপীরা শ্লাঘা ও সীমালঙ্ঘনে অনুৎসাহিত হতো।

জলীলুলকদর সাহাবী হোজাইফা আল ইয়ামান রা. আল্লাহর নবীর বহু গোপন তথ্য অবগত ছিলেন। এজন্য তাকে বলা হতো সাহিবু সিররি রাসূলুল্লাহ। তিনিই ছিলেন একমাত্র সহচর যার কাছে নবীজী সমকালীন মুনাফিকদের তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। হোজাইফা রা. বিশ্বস্ততার সাথে এদের নাম গোপন রাখতে সচেষ্ট থাকতেন। ওমর রা. এই রহস্যটি জানতেন। তাই হোজাইফা রা. যখন কোনো জানাজায় না যেতেন তখন ওমর রা. নানা অজুহাতে সে জানাজায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন। ওমর রা. খলিফা হলে হোজাইফা রা. গভর্ণরের পদে আসীন হন। হোজাইফা রা. একা একটি বাহনে চড়ে মদীনায় আসছেন। পথে খেজুর বাগানে লুকিয়ে অপেক্ষা করছেন খলিফা ওমর রা.।

হোজাইফাকে একাকী পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ওমর। করুণ মিনতি ও আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন, হোজাইফা, দয়া করে একটিবার বলো, প্রিয়নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে যেসব মুনাফিকের নাম বলেছিলেন তাদের মধ্যে ওমরের নামটি ছিলো কিনা?

জানি না একথা শুনে হুজাইফার সাথে আসমান ও জমিন কেঁদে উঠেছিলো কিনা?

মাত্র কয়েক সহস্র মুসলমানের বসবাস ছিলো মদীনায়। নবী স্বয়ং উপস্থিত। কুরআন নাজিল হচ্ছিলো চোখের সামনে। অথচ মুনাফিকের তালিকাও বিদ্যমান। আজ দেড় হাজার বছর অতীত হতে চলেছে। শত শত কোটি মুসলমানের বসবাস এই পৃথিবীতে। কোটি কোটি মুসলমান শুধু এই জনপদেই বাস করে। আগের মতো সবই আছে। মুসলিম আছে, মুশরিক আছে, ইহুদি-খৃষ্টান আছে। কিন্তু মুনাফিকের নাম শোনা যায় না। সত্য হচ্ছে, ওরাও আছে। তাহলে হয়তো সংখ্যায় ওরা এতো বেশি যে মুসলমানের তালিকা প্রস্তুতই সহজ হবে, কিন্তু মুনাফিকদের সম্ভব নয়। আজ দ্বীনকে, দ্বীনের আহ্বানকারীকে, দ্বীনের পথিককে, দ্বীনের হুকুম-আহকাম, সুন্নাহ ও ইসলামি আমল-আকিদাকে নিয়ে যে তামাশা ও কটাক্ষের প্রবণতা দেখা যায়, তাতে এই সত্যই প্রতিভাত হয়।

দল ও মতের উপর অবিচল থেকে দুনিয়ার দেনাপাওনা শেষ করে একদিন চোখ বন্ধ করতে হবে। নেতা আর জনতা কেউ কারো উপকারে আসবে না। দ্বীনহীন দিনগুলো পাপের ফসল হয়ে থাকবে। সেই পাপের বীজ বংশের ধারায় প্রবাহিত হতে থাকবে। ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে, বিজয়ী করতে যে কাফেলা রাজপথ অতিক্রম করছে সামান্য ইতস্তত না করে অনতিবিলম্বে তাদের সাথে শামিল হয়ে কাতারবন্দী না হলে না জানি কখন মালাকুল মউত পেছন থেকে ডাক দিয়ে বসেন। তখন একপা না সামনে উঠবে, না পিছনে। এমতাবস্থায় ভিন্নমত ও ভিন্নপথের সবক নিয়ে তাগুতের অনুসারী হয়ে দুনিয়া ছাড়লে অনন্ত আগুনই সব ঈর্ষার জ্বালা মিটিয়ে দেবে আর উত্তরপুরুষের ভাগ্যেও একই আত্মবিস্মৃতি নসিব হলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।
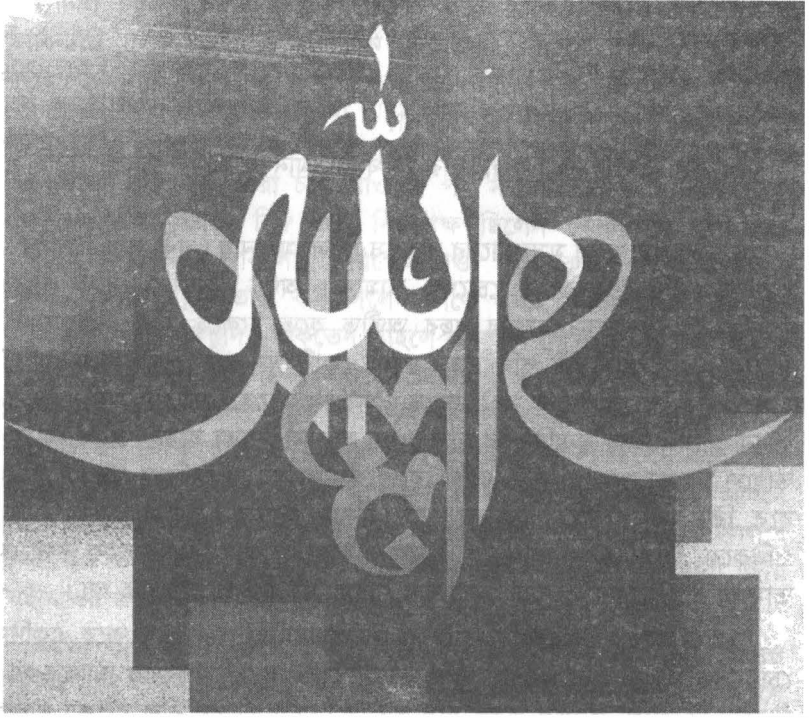
দয়াময়ের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল-কুরআন

অনেকদিন আগের কথা। আমার এক জ্যেষ্ঠ সহকর্মী বাংলাদেশ থেকে বদলি হয়ে বিদেশে গেছেন। দেশে তার অসুস্থ বৃদ্ধ শ্বশুরকে রেখে গেছেন, যিনি সম্পর্কে তার মামা। ছোটকালে পিতৃহারা হলে এ মামাই তার লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। অতএব এ বৃদ্ধ একাধারে তার শ্বশুর, মাতুল ও পিতা। পরমভক্তিতে ডাকেন বাপজান।

বাপজানের অসুখ প্রায়ই কঠিন আকার ধারণ করে। খবর পেয়ে আমার সহকর্মী দেশে ছুটে আসেন। কিছুদিন সেবা শুশ্রুষার পর কর্মস্থলে ফিরে যান। কখনো একেবারে যাই যাই অবস্থা হয়ে উঠে। তড়িঘড়ি খবর পাঠাই। সহকর্মী হাতের কাছে যে ফ্লাইট পান, তাতে চেপে ছুটে আসেন। বিদেশে তখন তিনি বিমানের একজন স্টেশন ব্যবস্থাপক।

বাপজানের জন্য তার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না। বিদেশের মাটিতে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতেন আর মনের শান্তি ও বাপজানের রোগমুক্তির জন্য এখানে

ওখানে ছুটে বেড়াতেন। এভাবে একদিন এক দ্বীনদার পীরের দরবারে হাজির হলেন। ভক্তরা পরিচয় করিয়ে দিলো, দরবেশ স্নেহভরে কাছে ডেকে এনে বসালেন। ম্যানেজার সাহেব তার অন্তরের দুঃখ-বেদনার কথা খুলে বললেন ও দো'আ চাইলেন। পীর সাহেব আস্তে করে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবাজি নামাজ পড়েন? আল্লাহর অলীর সামনাসামনি বসে মিথ্যা বলতে মন সায় দিলো না। বললেন, মাঝে মাঝে পড়ি। দরবেশ স্মিতহাস্যে বললেন, হ্যাঁ, বাবাজি, নামাজ তো মাঝে মাঝে পড়ারই জিনিস। সে সুবহে সাদিকের সময় ফজরের ওয়াক্তে, এভাবে বহু সময় পরে আসর আর একবারে দিনের শেষে মাগরিব। এশা তো সে রাতের বেলা। ম্যানেজার সাহেবের দু'চোখে অশ্রু নেমে এলো। দরবেশ তাকে লজ্জা দিলেন না, কিন্তু নসিহত করলেন যথার্থভাবে।

এভাবেই দিন কাটছিলো। একদিন হঠাৎ করে আমার অফিসে সংবাদ এলো, বাপজানের অবস্থা আশংকাজনক। সংবাদদাতা জানালেন সময় সম্ভবত শেষ। শেষ দেখা বুঝি আর হলো না। আল্লাহর কী ইচ্ছা জানি না, হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, এখুনি যে বিমানটি ঢাকা ছাড়ছে, সেটি তো ওখানেই যাচ্ছে। আমি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতো দৌড় দিলাম বিমানের দিকে। বিমান ছাড়ার শেষ মুহূর্তটি বাকি ছিলো। সিঁড়ি সরানোর বাকি। ইঞ্জিন ষ্টার্ট দিয়েছে। শুধু ইঙ্গিতে বুঝালাম, অতিজরুরি ব্যাপার। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম এবং সরাসরি ককপিটে ঢুকে পড়লাম। ক্যাপ্টেন পুরাতন বন্ধু; অতিসংক্ষেপে বুঝালাম, একটুখানি সময় দাও, এক টুকরা কাগজ ও কলম দাও, একটি চিঠি দেবো, ব্যস। কাগজ-কলম নিয়ে তীরবেগে সহকর্মীকে লিখলাম, এ বিমানে যদি চলে আসতে পারেন, তাহলে হয়তো বাপজানের সাথে দেখা হতে পারে।' কাগজটি ভাজ করে পাইলটকে বললাম, বন্ধু বিমান অবতরণের সাথে সাথে চিঠিটি ম্যানেজার সাহেবকে দেবে, অতিজরুরি। এ বলে দ্রুত নেমে এলাম। বিমান চলে গেলো।

বিমান যথারীতি তার গন্তব্যে পৌঁছলো। যাত্রী আগমন-নির্গমন নিয়ে ম্যানেজার সাহেব ছিলেন দারুণ ব্যস্ত। ক্যাপ্টেন বিমান থেকে নেমেই চিঠিটি পৌঁছে দিলেন। ম্যানেজার সাহেব চিঠিটি নিয়েই ছুটলেন আবার যাত্রীদের দিকে। ছোটাছুটি আর পেরেশানীর মধ্যে চিঠি পড়ার অবসর মিললো না কিছুতেই এবং একসময় সবযাত্রী বিমান আরোহন করলে বিমান তীরগতিতে বিদায় নিলো আপন গন্তব্যে প্রত্যাবর্তনের জন্য।

ম্যানেজার সাহেব টারমাক থেকে ছুটে গেলেন লাইটপোস্টের দিকে এবং পকেট থেকে চিঠি নিয়ে যা পড়লেন, তা শুধু তাঁর অন্তর বিদীর্ণ করে একটি চিৎকার হয়ে বেরিয়ে এলো। কিন্তু বিমানের তিন ইঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জনে তা তৎক্ষণাত হারিয়ে গেলো। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন, বিমান ঢাকার যাত্রী নিয়ে আকাশে উড়ছে।

কোনো রকম রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে অন্য এয়ারলাইনসের টিকিট সংগ্রহ করে একাধিকবার যাত্রাবিরতি ও উড়োজাহাজ পরিবর্তন করে যখন ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করলেন, তখন তাকে নিয়ে যাওয়া হলো সরাসরি করবস্থানে তার বাপজানের কবর জিয়ারতের জন্য।

এভাবে জীবনের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে আবার যথারীতি বিদেশে কর্মস্থলে ফিরে গেলেন। কাজকর্মে মন বসছে না। তাই একদিন হাজির হলেন পীর সাহেবের দরবারে। সব শুনে পীর সাহেব গভীর স্নেহে বললেন, বেটা, ঠিক এভাবে আপনার পরওয়ারদেগার আপনার কাছে একটি মেসেজ অর্থাৎ এক অতিজরুরি বার্তা পাঠিয়েছেন তার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। আপনি কি সে মেসেজ- যার নাম কুরআনুল কারীম- পড়েছেন? যদি না পড়ে থাকেন, তাহলে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে আপনার। দেখুন বেটা, একখানি জরুরি চিঠি সময় মতো না পড়ার কারণে মৃত্যুর সময় বাপজানের কাছে যেতে পারলেন না। অথচ কতো সহজে কাজের মাঝে একবার চিঠিখানি পড়ে নিতে পারতেন। ঠিক এমনিভাবে দুনিয়ার হাজার ঝুট-ঝামেলার মাঝখানে সময় করে আল্লাহর কালাম পড়ে নিতে হবে। এবং যতোদিন হায়াত মিলবে, ততোদিন এ কালাম পড়তে হবে ও সে মতে চলতে হবে। দয়াময় আল্লাহ অত্যন্ত জরুরি সবকথা বলে পাঠিয়েছেন আপনাকে আল কুরআনের মাধ্যমে। আপনার আমার সামনে এক মুসিবতের সময় আসছে। মৃত্যুর মুসিবত, কবরের মুসিবত, কেয়ামতের মুসিবত, হিসাবের মুসিবত, দোজখের মুসিবত। এসব মুসিবতের সময় কেমন করে নাজাত পেতে হবে, সেসব কথা তিনি দয়া করে তার বান্দাদের জানিয়েছেন। পরকালের পথ তো পাড়ি দিতে হবে, কী নিয়ে পাড়ি দেবেন, কেমন করে পাড়ি দেবেন এসব সংবাদ যথাসময় আপনার কাছে পৌছে গেছে; মৃত্যুদূত আসার আগেই তা পাঠ করবেন কি করবেন না, সেমতো প্রস্তুতি নেবেন কি নেবেন না, সে কথা একবার ভেবে দেখুন।

আশেপাশে কোথাও কবরের জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা আছে। আপনি বেখবর থাকলেও আপনার আপনজন যথারীতি সে ঠিকানায় আপনাকে পৌছে দেবে। মুনকার-নকিরের সে ঠিকানা জানা আছে। কবরে-হাশরে-মিজানে সর্বত্র এ কুরআনুল কারীমের কথামতো আপনার সাথে ব্যবহার করা হবে। কুরআন পাক সত্যসংবাদ বহন করে এনেছে। দুনিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, কিন্তু কুরআনের বাণীর কোনো পরিবর্তন হবে না। অনাদি-অনন্তকাল পর্যন্ত এ পাক-কালামের আগাম সংবাদ অনুযায়ী ঘটনা প্রবাহ ঘটতে থাকবে। দয়াময় আমাদের সকলকে কুরআন পাক পড়ার ও বোঝার তাওফীক নসিব করুন।
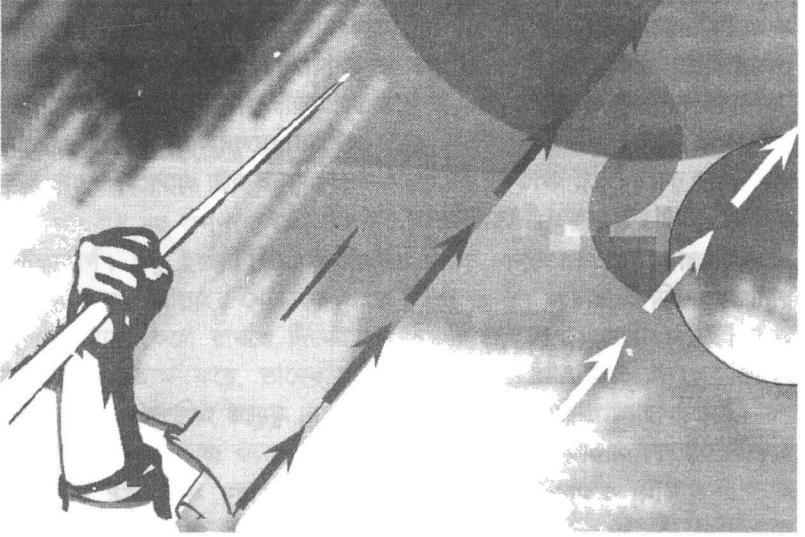
মুমিন একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে

মিশর ফেরাউনের দেশ, মূসারও দেশ। মারনেপতাহ নেই, দ্বিতীয় রামেসীস নেই; নবী মূসা আ. নেই, সামেরীও নেই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ফেরাউন ও সামেরীরা এখনো মিশরের নীলনদের অববাহিকায় বসবাস করে। এই তো সেদিন যখন সভ্যজগতের নব্যফেরাউন জামাল আবদুন নাসের ইখওয়ানূল মুসলিমীনের প্রাণপুরুষ ও বর্তমান মুসলিম জগতের কলিজার টুকরা সাইয়্যেদ কুতুবকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলো, তখন মুজাহিদের আযান ধ্বনিতে পৃথিবী আরেকবার কেঁপে উঠেছিলো। হাসানুল বান্না আরেক ফিরাউনের গুলির শিকার হলেন, কায়রোর রাজপথ তাঁর পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হলো, সারা পথে রক্ত ঝরিয়ে হাসপাতালে গেলেন। ফেরাউন হুকুম দিলো, রক্ত প্রবাহ বন্ধ করলে চিকিৎসকদের গর্দান উড়িয়ে দেবো। বিশ্ব মুসলিমের নেতা অঝোরধারায় রক্ত ঝরিয়ে তাঁর প্রিয়মাবুদের সান্নিধ্যে চলে গেলেন। এখনো মিশরে যেমন ফেরাউনের বসতি আছে, তেমনি আছে মূসা আলাইহিস সালামের উত্তরসূরি, সাইয়েদুন নবী ও নবীউস সাইফের অসিয়তপ্রাপ্ত মুজাহিদের বসবাস। এমনি এক মর্দে মুজাহিদের কাহিনী শুনাবো আজ আপনাদের।

কায়রোর আদালতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত একজন জানবাজ মুজাহিদ ফাঁসির মঞ্চে দণ্ডায়মান। ঘড়ির কাঁটা এক এক সেকেণ্ড করে এগিয়ে যাচ্ছে নির্দিষ্ট

সময়ের দিকে। প্রহরীরা বুক টান টান করে দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্র উঁচিয়ে। নিঃশব্দ গ্যালারীতে দর্শকবৃন্দ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বিস্ফোরিত নয়নে তাকিয়ে আছে আল্লাহর সান্নিধ্যে প্রস্থানরত এক অকুতোভয় মুজাহিদের দিকে। ধীর পায়ে এক মাওলানা সাহেব পবিত্র কোরআন হাতে এগিয়ে এলেন মঞ্চের দিকে। ফাঁসির আসামীর কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনার মৃত্যুর সময় হয়ে এসেছে, এবার প্রস্তুত হউন।' মুজাহিদ হুংকার দিয়ে উঠলেন, আপনি কে?

মাওলানা সাহেব বললেন, আমি সরকারি কর্মচারী।

: আপনি কী চান?

: আমি পবিত্র কালাম পাঠ করবো।

: তারপর?

: তারপর আপনাকে কালেমা পাঠ করাবো। মুহূর্তে অগ্নিশর্মা হয়ে চিৎকারে ফেটে পড়লেন আল্লাহর সৈনিক।

আপনি আমাকে কালেমা পড়াবেন? আল্লাহর দুশমনের বেতনভুক্ত মাওলানা, কী করে আপনার এই আস্পর্ধা হলো যে আপনি আমাকে কালেমা পড়াতে চান? জালিমের সান্নিধ্য কি আপনাকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছে? আপনি কি জানেন না, কিসে আমাকে আজ এই ফাঁসিরকাষ্ঠ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে? আপনি কি জানেন না, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করতে গিয়েই আজ আমার গলায় ফাঁসির দড়ি লেগেছে? আপনি কী জানেন না আল্লাহর দ্বীনকে গালিব করতে গিয়েই আজ আমি আসামী? অথচ জালিমের গোলামী করে আপনি হয়েছেন দ্বীন দরদী কালেমাধারী! আপনি কি আমার আল্লাহকে অন্ধ ও বেখবর মনে করেন? নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক! আপনি কি মনে করেন, আমার আল্লাহ জানেন না তার এই বান্দা কি নিয়ে জীবনের পথ পাড়ি দিয়েছে? বান্দা কোন কালেমাকে বুকেধারণ করে আজ তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করছে? আপনি কি মনে করেন আজ এই মুহূর্তে আমার দয়াময় আল্লাহ শুনতে পাচ্ছেন না কোন কালেমার হৃদয়বিদারী আওয়াজ এ বান্দার বুকের ভিতরের হৃদপিণ্ডটাকে চৌচির করে দিচ্ছে? আফসোস, কালেমার জন্য জীবনদানকারী এক বান্দাকে আপনি এসেছেন কালেমা পাঠ করাতে!

আল্লাহ আপনি স্বাক্ষী থাকুন, আপনার একনিষ্ঠ বান্দা জীবনের শেষ মুহূর্তেও কোনো হটকারিতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। হে অন্তরসমূহের ওলটপালটকারী, আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর দৃঢ় করে দিন। যেদিন থেকে আপনার কালেমার রশি গলায় পরেছি সেদিন থেকে শুরু করে আজ এই ফাঁসির রশি পর্যন্ত আপনার দুশমনের সাথে এই বান্দা এক মুহূর্তের জন্য আপোষ করেনি। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রোতা ও দ্রষ্টা।

আর তখনই বেজে উঠলো বিদায়ের ঘণ্টা। ফাঁসির রজ্জু নড়ে উঠলো ও মুহূর্তে আঁকড়ে ধরলো কালেমার সুধাসিক্ত কণ্ঠকে। মরণজয়ী মুজাহিদ স্মিতহাস্যে দুনিয়ার কালজয়ী জিন্দেগী পাড়ি দিয়ে তাঁর মাবুদের সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

মাওলানা সাহেব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ধিক্কার দিলেন নিজের জীবনকে। প্রহরীরা অস্ত্র নামিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে চোখের পানি মুছলো। শুধু মিশর নয়। পৃথিবীর বহু জনপদে আজ মুসলিম নামধারীরা দ্বীনের পথকে করে তুলেছে কণ্টকাকীর্ণ। শুধু ইচ্ছায় নয় অনিচ্ছায়ও। শুধুমাত্র বেতনভুক্ত হওয়ার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর সৈনিকের পায়ে দিচ্ছে বেড়ি। হাতকড়া পরিয়ে কয়েদীর জিন্দানখানায় ফেলে রাখছে দিনের পর দিন। ওরা কত অসহায়! মুজাহিদকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করে, তাদের আক্বিদা বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করে। তাদেরকে দেখা হলেই সালাম করে, বুকের সাথে বুক মিলিয়ে সান্ত্বনা পায়। তবু কেন এমন নিষ্ঠুর কাজ করে? কাছের মানুষ কেমন করে এমনভাবে পাল্টে যায়? হ্যাঁ পাল্টে যায়, কিন্তু ওরা আমাদের দূরের মানুষ নয়। যাদের অনুশোচনা আছে তারা কখনো দূরের মানুষ হতে পারে না। ওরা আল্লাহর কাছের বান্দা। আমাদেরও কাছের মানুষ। প্রকাশ্য বিচারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন কোনো হতভাগা একজন মুজাহিদকে তালেবান বলে তামাশা করে, তখন এই কাছের মানুষগুলোর চোখে মুখে যন্ত্রনা ফুটে উঠে। যখন কোনো মুসলিম নামধারী, মুজাহিদকে জঙ্গি বলে গালি দেয়, তখন এইসব অনুশোচনাকারী কাছের মানুষগুলোর মুখ মলিন হয়ে উঠে। এটাই স্বাভাবিক। আমরা এ মাটির সন্তান, একে অন্যের ভাই। আমাদের পিতামাতারা ওদের পিতামাতাদের সাথে একই কবরস্থানে শুয়ে আছেন। আমরাও ওদের সাথে একই কবরস্থানে আশ্রয় নেবো। আমরা কারো দুশমন নই। এই জমিনের সকল মুসলমানের জন্য আমাদের কল্যাণের হাত প্রসারিত।

মুজাহিদ শুধুমাত্র কালেমার দাওয়াতদানকারী নয়, কালেমার হেফাজতকারীও, কালেমাকে বুলন্দ রাখতে জীবনদানকারী মুমিন। দ্বীনের দুশমনদের মোকাবেলায় কালেমাকে গালিব করার জন্য জীবনকে বাজি রাখে মুজাহিদ। তার সাথে কোনো মুসলমানের দুশমনি হতে পারে না। মুসলমানের কাফেলাকে সন্দেহের চোখে যারা দেখে, দ্বীনের কর্মসূচির পিছনে যারা গোয়েন্দাবৃত্তির আঞ্জাম দেয়, তাদের মুসলমান নাম পরিত্যাগ করা উচিত। কেননা আল্লাহ এসব কাজকে হারাম করেছেন। ইসলামের জেগে উঠাকে রুদ্ধ করতে যেকোনো প্রয়াসের স্বপক্ষে গোয়েন্দাগিরি আল্লাহ অত্যন্ত অপছন্দ করেন। আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক করে দুনিয়ার জিন্দেগীতে সাফল্যের আশা করা দুঃস্বপ্নের মতো।

ইসলামি হুকুমতকে কায়েম করতে গিয়ে মিশরে, আলজেরিয়ায় মুজাহিদরা মুসলিম শাসকদের ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিচ্ছেন। স্বাধীনতা চাইতে গিয়ে

চেচনিয়া, বসনিয়া, ফিলিস্তিন, আরাকান ও কাশ্মীরের মুসলমানরা কাফের মুশরিকের গুলিতে প্রাণ দিচ্ছেন। আল্লাহর দ্বীনকে ভালোবেসে আমরা কার জিন্দানখানায় বন্দী হবো? জগতের নির্যাতিত মুসলিমকে উদ্ধার করার প্রস্তুতি নিয়ে আমরা কার অস্ত্রে নিহত হবো? কোন বেতনভুক কর্মচারী আমাদেরকে কালেমার দাওয়াত দেবে মৃত্যুর আগে? কার অস্ত্র ঝাঁঝরা করে দেবে আমাদের মুবাল্লিগ কলিজা? কাদের বুটের আঘাতে থেতলা করে দেবে আমাদের সিজদাহকারী কপাল? কোন শকুনির পাখায় ভর করে আসবে মৃত্যুদূত? কোন সীমান্ত রক্তিম হবে কালেমাওয়ালার রক্তধারায়?

বদরের যুদ্ধের পর কোরাইশরা যখন মক্কায় মাতম করছিলো তখন সবচেয়ে বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিলো কোরাইশ প্রধান আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা। তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় সে ছিলো অস্থির। প্রতিশোধের প্রস্তুতি চূড়ান্ত হলো, হিন্দাও তার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির সন্ধান পেয়ে গেলো। ক্রীতদাস ওয়াহশীকে পেয়ে হিন্দা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। এমন নিখুত ও নিশ্চিত বর্শা নিক্ষেপকারীর পক্ষেই সম্ভব ইসলামের সিংহপুরুষের বক্ষ বিদীর্ণ করা।

হিন্দা বললো, 'ওয়াহশী, ওহুদের ময়দানে বর্শার এই রকম একটিমাত্র নিক্ষেপ, ব্যস, বিনিময়ে তোমার চিরগোলামীর আযাদী'।

মুক্তিপাগল ওয়াহশী দিন গুনছেন ওহুদের। সকল অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে উপস্থিত হলো সেই কঠিন দিন। কাফের আর মুমিনের লড়াই, সত্য ও মিথ্যার লড়াই, মুমিন ও মুশরিকের লড়াই, মুমিন ও মুনাফিকের লড়াই। ওহুদের গিরিপথে নবীজির রক্তঝরা লড়াই। সামনে বদর-ওহুদের অমিততেজা সেনাপতি বীরকেশরী হামজা। নবীজির পিতৃব্য আমির হামজা একের পর এক শত্রুসৈন্য সংহার করে এগিয়ে চলছেন। পেছন থেকে অতিসন্তর্পনে তাঁকে অনুসরণ করে চলছেন বর্শাধারী ওয়াহশী। সামনে থেকে সুযোগ গ্রহণ করার সাহস হয়নি। তাই পিছন থেকে বর্শা তাক করছে বারবার। একসময় ঠিকই অব্যর্থ বর্শা যুদ্ধরত সেনাপতির দেহকে বিদীর্ণ করলো। পেছন থেকে অতর্কিত হামলায় বীরশ্রেষ্ঠ মুজাহিদ শহীদ হলেন।

এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ওয়াহশী গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি পেলেন ঠিকই, কিন্তু প্রচণ্ড অনুশোচনায় অচিরই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। নবীজি সা. একবার তাঁকে দেখে বলেছিলেন, 'ওয়াহশী! তোমাকে দেখলে আমার প্রিয়তম পিতৃব্য আমির হামজার কথা মনে পড়ে যায়।'

ওয়াহশী রা. নবীজির এ মর্মবেদনা কোনোদিন ভুলতে পারেননি। যে জীবনে ইসলামের এতো বড় ক্ষতি করেছেন সেই জীবন দিয়ে ইসলামের একটি বড় খেদমত করার বাসনা পোষণ করতেন সবসময়। সেই সুযোগ একদিন এসে গেলো। মিথ্যা নবীর দাবিদার মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যখন জিহাদের

আহ্বান এলো, তখন প্রস্তুত হয়ে গেলেন ওয়াহশী রা.। নবীজির এক অতি আপনজনকে হত্যা করে যে অপরাধ করেছিলেন, তারই প্রায়শ্চিত্ত করলেন নবুওয়তের শত্রু মুসাইলামাকে হত্যা করে। ঈমানদ্বীপ্ত এ সাহাবীর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আজ যারা পার্থিব গোলামির শিকলে আটকা পড়ে আল্লাহর সৈনিকের মোকাবেলা করতে উদ্যত হয়েছেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিমিষে কোনো অন্তরকে ওলটপালট করে দিতে পারেন।

যারাই মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীনের কর্মসূচি থেকে, কুরআনের শাশ্বত আহ্বান জীবনদান থেকে, পৃথিবীর নির্যাতিত মুসলমানকে মুক্তির যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে রাখবে, জেনে হোক বা না জেনে হোক, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তারা নিশ্চিতভাবে ইহুদি মুশরিকের ক্রীড়নক। ইসলামের বিজয় মুসলমানের জিহাদের তামান্নায় নিহিত। যারা আল্লাহর দ্বীনের বিজয়কে সহ্য করতে পারে না অথবা আল্লাহর দ্বীনকে অন্যকিছুর সমকক্ষ ভেবেই তৃপ্ত হতে চায়, তারা না ইসলাম বুঝেছে আর না মুসলমান হয়েছে। আল্লাহর মনোনীত দ্বীন থেকে তাদের অবস্থান দূরের চেয়েও দূরে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েই যারা পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে, তারা আল্লাহর পথের পথিককে চিনতে ভুল করেছে। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর উপর দরূদ পড়েই যারা উম্মতে মুহাম্মদীর খেতাব পেয়ে গেছে তারা নবী জীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী অনুগামীদের ওয়ারেন্ট চাইলে চাইতে পারেন কিন্তু বিচারদিনের একচ্ছত্র অধিপতি মহাবিচারক আল্লাহপাকের অপ্রতিরোধ্য ওয়ারেন্ট মাথায় নিয়েই কেয়ামতের দিন হাজিরা দেবে।

সেই দিন জিজ্ঞেস করা হবে, আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? মুসলমান বলে বড়াই করে ইসলামকে কোন শত্রুর হাতে সমর্পন করেছিলে! মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে ইসলামকে কোন জালিমের হেফাজতে রেখে এসেছিলে! মুসলমানের সন্তান হয়ে ইসলামকে সওদা করে দুনিয়ার কোন সম্পদ কিনেছিলে! মুজাহিদের রক্ত ঝরিয়ে কোন পদক পেয়েছিলে? নিরপেক্ষ সাধু সেজে দ্বীনের ওজন কোন পাল্লায় মেপেছিলে?

জামাল আবদুন নাসের তৃতীয় বিশ্বের নেতা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! বিশ্ব নেতৃত্ব তার আসন গুড়িয়ে দিয়েছে। মুসলিম বিশ্ব তার বেওকুফির মাসুল গুনছে আজও। মুজাহিদকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিজেই হতে চেয়েছিলো ইসলামের ঝাণ্ডাবরদার। কিন্তু মুসলমান আজ তার নাম নিতেও ঘৃণাবোধ করে। তার উত্তরসূরিরা তাকে হিরো বানাতে কম কসরত করেনি, কিন্তু সে গুড়েবালি। আল্লাহ যখন কাউকে লাঞ্ছিত করেন তখন কার সাধ্য তাকে ইজ্জত দেয়?

তুরস্কের আতাতুর্ককে হিরো বানাতে সারা পাশ্চাত্য আদাজল খেয়ে লেগেছিলো। ইসলাম ও খেলাফতের এই দুশমনকে নিয়ে কম ঢাক-পেটানো

হয়নি। একসময় আমরাও তার জয়গানে মেতেছিলাম। কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ তার সাক্ষী। কিন্তু ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে আতাতুর্ক। ইসলামের আলো আবার জ্বলে উঠেছে তুরস্কে। আমরা কি হাসানুল বান্নার নামকরণে একটি পথ দিয়ে কোনোদিন হাঁটতে পারবো? আমাদের দ্বীনের প্রদীপ কি এভাবে টিমটিম করে জ্বলবে? আল্লাহর দ্বীনের আলো নিভু নিভু হয়ে জ্বলতে পারে না। দ্বীনের আলো এমনই উজ্জ্বল যে অন্ধও পথ দেখতে পায় এবং তার ঝলকে আল্লাহর দুশমনের চোখ ঝলসে যায়। ইসলামের আলোকিত ভুবনে মুমিন আপন পর চিনে নেয়। আমরাও আমাদের আপনজনদের আপন পক্ষপুটে টেনে নেবো। ভুল করে যারা পথে পথে কাঁটা বিছায় হাসি মুখে সেই কাঁটা নিজ হাতে তুলে নিয়ে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দেবো। ঘরের দুয়ার তাদের জন্য অবারিত রেখে দেবো। যার অন্তর অনুশোচনায় সিক্ত হয় সে কখনো এ ঘরে আগুন দেবে না। যদিও বা দিয়েছে, একদিন চোখের জ্বলে তা নিভিয়ে দেবে। আমাদের জীবন ক্ষণিকের কিন্তু পথ দীর্ঘদিনের। আজ যে মাতম করবে কাল তার সন্তান এসে চোখের জ্বলে সব দুঃখ মুছে দেবে।

কাফের ছাড়া কেউ আমাদের মোকাবিলায় যোগ্য নয়। মুরতাদ ছাড়া কেউ আমাদের অভিশাপের পাত্র নয়। মুনাফিক ছাড়া কেউ আমাদের ঘৃণা পাবার উপযুক্ত নয়।

দুনিয়ার কোনো ঝামেলাই ঝামেলা নয়। এসব ঝুটঝামেলা আল্লাহপাক পরোয়া করেন না। আল্লাহর অনুতপ্ত বান্দারা শীঘ্রই সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। ততোক্ষণ আমরা যেন দৃঢ়পদ থাকি। আফসোস করে লাভ নেই। গোমরাহির কারণে যার অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন তাকে পথ দেখায় শয়তান। শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে সে মুমিনকে ভয় দেখায়। আর শয়তান তো বিতাড়িত মরদুদ। সুতরাং পরিণতিতে যে থেকে যাবে সে মুমিন ও আপনার ভাই। মুমিন কি কখনো ভ্রাতৃঘাতী হয়?

পাঠক, ফাঁসির মঞ্চে হাসিমুখে যে বান্দা প্রাণ দিলেন, তিনি তো তাঁর প্রিয়মালিকের ঠিকানায় চলে গেলেন। কিন্তু দুনিয়াতে তিনি কি রেখে গেলেন? রেখে গেলেন তার অসংখ্য ভক্ত ও সতীর্থ। আর সেই দীর্ঘশ্মশ্রুমণ্ডিত পাগড়িধারী মাওলানা সাহেবের কি হলো? যিনি জালিমের তাঁবেদার হওয়ার কারণে নিজেকে ধিক্কার দিলেন। একথা বিস্ময়ের ছিলো না, একদিন তিনিই হবেন আরেক মুজাহিদ যিনি বিচারের আসনে সমাসীন হয়ে আল্লাহর আইন জমিনে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর ঐসব প্রহরীদের কি হলো? যারা অস্ত্র নামিয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রস্থান করেছিলো?
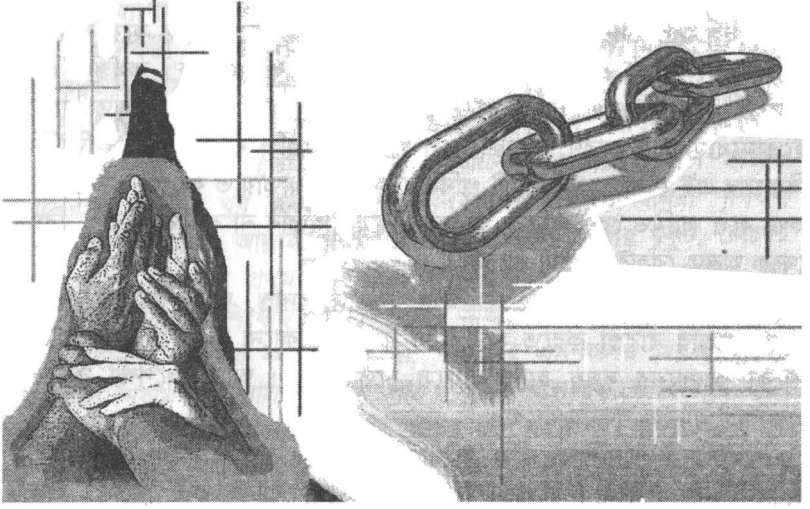
বু'আলী শাদলী ও আমাদের রক্তের বন্ধন

আজ থেকে বেশ ক' বছর আগে বু'আলী শাদলী আমাকে বেওকুফ বলেছিলো। শাদলীর কথা কখনো ভুলিনি, যতোদিন বেঁচে থাকবো মনে থাকবে, শাদলীকেও মনে থাকবে।

জেদ্দার নতুন বিমানবন্দরে তখন কাজকর্ম শুরু হয়েছে মাত্র। জেদ্দাকে বলা হতো পৃথিবীর বৃহত্তম বিমানবন্দর। এলাকার বিশালতার জন্যই সম্ভবত এ রকম বলা হতো। নানা কারণে বৈশিষ্টময় ছিলো বিমানবন্দরটি। দু'ভাগে বিভক্ত বিশাল হজ্জ টার্মিনাল নির্মাণ করেছিলেন আমাদের এ দেশেরই এক প্রতিভাবান সন্তান। বহু বছর হয়েছে এখানো দ্বিতীয় অংশটি ব্যবহার করার দরকার হয়নি। বহু দূর প্রান্তে রয়েছে সুদৃশ্য রয়েল টার্মিনাল। মাঝখানে বহির্দেশীয় আন্তর্জাতিক টার্মিনাল। সবেমাত্র উড়োজাহাজ উঠানামা করছে; অনেক অফিসে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এখনো পৌঁছেনি, কিছু ব্যবস্থা সাময়িকভাবে হয়েছে। মসজিদ তখন শুধুমাত্র সাউথ টার্মিনালে নির্মিত হয়েছে।

সপ্তাহের সাতদিনই কাজ করতে হয়। তাই শুক্রবার সকালে অফিসে গিয়ে ভাবছি, জুমার নামাজের কি ব্যবস্থা আছে জানতে হবে। আমার সব সমস্যার সমাধান দিচ্ছে শাদলী। অতএব তাকেই এখন প্রয়োজন।

শাদলীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ইতোমধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমরা বাংলাদেশ থেকে আর ওরা তিউনিস থেকে এসেছে। কর্মস্থল এক, থাকতে দেয়া হয়েছে একই বাড়িতে। শাদলীর সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে ইতোমধ্যে। তার কারণ, শাদলী বেশ ভালো ইংরেজি বলতে পারে। তিউনিস বিমানের এই চৌকস কর্মকর্তাটি পৃথিবীর বহুস্থানে যাতায়াত করেছে। তার সাথে কথা বলে আমিও বেশ স্বচ্ছন্দ অনুভব করছি। আরবি না বলতে পারার বিপদ থেকে অন্তত রেহাই পাওয়া যাচ্ছে।

শাদলীর সাথে দেখা হওয়া মাত্র বললাম, দোস্ত, আজ শুক্রবার, জুমার নামায পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সে বললো, কোনো চিন্তা নেই। যেখানেই থাকো আজানের সময় হলে অফিসে চলে এসো। আমি অপেক্ষা করবো। একসাথে নামাজ পড়তে যাবো।

যথাসময়ে শাদলীকে অফিসে পাওয়া গেলো। সে আমাকে নিয়ে টার্মাক অঞ্চলে নেমে গেলো। যেখানে ডিউটি কারগুলো পার্কিং করা ছিলো। একটি গাড়িতে আমাকে নিয়ে এপ্রোন ট্র্যাক ধরে গাড়ি চালাতে শুরু করলো। গাড়ি সাউথ টার্মিনালের দিকে চললো, বুঝলাম সাউদিয়ার জামে মসজিদে জুমা পড়তে হবে।

এয়ারফিল্ডের ভেতর দিয়ে একেবেঁকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে। শাদলী গল্প জুড়ে দিলো। এরপর এক অভাবিত প্রশ্ন, *দোস্ত, জুমার নামাজ কি নিয়মিত পড়ে থাকো?*

এ রকম প্রশ্ন ব্যক্তিত্বে আঘাত করে। তবু কিছু মনে না করে জবাব দিলাম, *হ্যাঁ, তা তো পড়ি।*

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন, *তোমাদের দেশে জুমার খুতবা পড়া হয়?*

এবার আর সহ্য করা যায় না। বেশ রাগান্বিত হয়েই বললাম, *কী বলতে চাও তুমি? জুমার নামায খুতবা ছাড়া হয় নাকি? খুতবা তো জুমার অংশ।*

শাদলী নির্বিকার। এবার আরো কঠিন একটি প্রশ্ন করে বসলো, *আচ্ছা, তুমি কি এখানে এসেই নিয়মিত নামাজ পড়ছো, নাকি আগেও পড়তে?*

আমার মেজাজ খুব বিগড়ে গেলো। একজন বয়স্ক মানুষকে এ রকম প্রশ্ন করা ঔদ্ধত্যের শামিল। চোখ রাঙিয়ে বললাম, *তোমার সন্দেহ হয় নাকি? দেখো, আমরা তোমাদের মতোই একটি মুসলিম দেশের অধিবাসী। শিশু বয়সেই আমাদেরকে নামায-কালাম শেখানো হয়। আমরা তোমাদের চেয়ে আমল-আকিদায় কোনোভাবেই পিছিয়ে নেই।*

শাদলী তারপরও নির্বিকার। আপনমনে গাড়ি চালাচ্ছে, সামনের দিকে তাকিয়ে।

আবার প্রশ্ন : *তুমি কি কুরআন পড়ে থাকো?*

তাজ্জব ব্যাপার! এসব কী বলছে? আমার আত্মমর্যাদাবোধ যেন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। অনেকটা তিরস্কারের ভঙ্গিতেই জবাব দিলাম, *তোমার কথায় মনে হচ্ছে, কুরআন আমাদের জন্য নাযিল হয়নি!*

ওকে একটা সমুচিত জবাব দেবার ইচ্ছা মনে খুব তাগিদ দিচ্ছিলো। বললাম, *আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা যথোচিত নয় বলেই মনে হচ্ছে। আমাদেরকে তোমরা খুব কমই জানো। ঘনবসতির হিসাবে আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম জাতি। আল্লাহ পাকের কালাম আমাদের মাথার মুকুট, চোখের মনি। আমার জীবনের প্রথম পাঠই ছিলো কুরআনুল কারীমের হরফ। খুব ছোটকালেই কুরআন শিখেছি। সেই থেকে আজতক কখনো কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। অহংকার করে বলছি না, পরিবারে এমনজনও আছে, যাদের প্রতিদিনের নিয়মিত অভ্যাস কুরআন পাঠ। সারাজীবনে কে কতবার কালামে পাককে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছে হিসাব করা যাবে না। মুখস্ত না করেও শুধু পড়তে পড়তে যতোখানি মুখস্ত হয়ে গেছে তা শুনলে তুমি হয়তো এই রকম প্রশ্ন করতে উৎসাহী হতে না।*

আমার আত্মপ্রশংসা সম্ভবত বেশ উঁচুমাত্রায় চলে যাচ্ছিলো। আত্মসম্মানবোধ, রাগ, প্রতিউত্তর ও শ্লাঘা আমাকে অনেকটা বেসামাল করে তুলেছিলো। আওয়াজও বোধ করি বেশ জোর পেয়ে যাচ্ছিলো।

কঠিন ব্রেক কষে গাড়ি মাঝপথে থেমে গেলো। তীব্রচাহনি নিক্ষেপ করে শাদলী আমার দিকে তাকালো এবং অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বললো, *বন্ধু! তুমি একটি আস্ত বেওকুফ!*

তারপর ধীরে ধীরে নির্মম কথাগুলো বলে যেতে থাকলো, *তুমি বললে, জুমার খুতবা নিয়মিত শুনে থাকো, অথচ খুতবা হয় আরবিতে; নামাজ পড়ছো যথারীতি। সেই নামাযের ভাষাও আরবি। কুরআন পড়ছো সারাজীবন। এই কুরআনও আরবি। অথচ আমি যখন তোমার সাথে আরবিতে কথা বলি, তখন তুমি হয়ে যাও বোবা, এমনভাবে তাকাও যেন বধির। হয়ে যাও পাথর, স্থবির। বন্ধু, তুমি বেওকুফ যদি না হও তবে কি?*

আমি অনুভব করছিলাম, আমার সমস্ত অন্তর-বাহির যেন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড এক বেদনা অনুভব করলাম হৃদপিণ্ডের কোনো একপ্রান্তে। কখন জানি চোখের পাতা নীরবে নিম্নমুখী হলো। শাদলী বুঝি অনুভব করতে পারছিলো আমার পরাজিত চোখের অবনত দৃষ্টি, তাই আস্তে করে হাত রাখলো আমার হাতে। মনে হলো, আমার অন্তরের তপ্তবেদনা দু'চোখের ভুরুগুলোকে ভিজিয়ে দিয়েছে নিদারুণ অভিমানে।

হায়রে দুর্ভাগা জীবন! মানবজীবনের এমন ব্যর্থতার কী কৈফিয়ত থাকতে

পারে? আল্লাহ্ পাকের একমাত্র কিতাব, তাকে ছুঁতে পারি, তাকে দেখতে পারি অথচ তার কথা বুঝতে পারি না। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম করে জন্মিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন তাই দেখতে পারছি। কান দিয়েছেন তাই শুনতে পাচ্ছি। অন্তর দিয়েছেন কিন্তু সেই অন্তর দিয়ে তার কথাগুলো না বুঝেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদিন নতুন করে বান্দার সাথে কথা বলেন না। একবারই সব বুঝিয়ে বলে দিয়েছেন এবং তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই কথাগুলো লিপিবদ্ধ করে আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। দয়াময়ের সেই জরুরি কথাগুলো না বুঝে নির্বোধের জীবনযাপন করছি। জ্ঞান-বুদ্ধির কোনো পথই আমাদের অজানা থাকে না। কঠিন অংক শাস্ত্র পর্যন্ত আমাদের আয়ত্ব হয়ে যায়। জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা সমাজবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, ইতিহাস, অংকন, নির্মাণ, কলা ইত্যাদি কিছুই তো আমাদের আয়ত্বের বাইরে নয়।

বিচার বিচিত্র নীতির অনুসরণ করে চলছি মহানন্দে। পৌরনীতি, রাজনীতি এসব তো সহজ বিষয়। এমনকি দুর্নীতিও বুঝি সুযোগ-সুবিধা মতো। বুঝি না শুধু আমার মালিকের কথা, আমার প্রভুর কথা, আমার প্রিয়তম মাবুদের কথা। বুঝি না সেই কথার অর্থ, যা আমার ইহজীবনের জীবনবিধান; সেই কথার অর্থ বুঝি না, যেকথা আমার পরকালের মুক্তিরবার্তা বহন করে এনেছে।

শাদলীর কথায় তর্ক করতে পারতাম, কৈফিয়ত দিতে পারতাম, কিন্তু বিবেক তা করতে দেয়নি। সে তো ভালোবেসেই আমাকে নির্বোধ বলেছে। এতো বিবেক-বুদ্ধির দাবি, আমি আমার প্রভুর কথার প্রতিটি বর্ণ স্পষ্ট করে শুনবো, পড়বো ও বুঝবো এবং তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

দয়াময় কুরআনুল কারীমকে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির আওতাধীন করে নাজিল করেছেন, রচনায় সহজ রীতি গ্রহণ করেছেন।

জগতে শিক্ষিতের দাবিদার হয়ে মূর্খ ও অজ্ঞতার পরিচয় দিলে শাদলীর মতো বন্ধু তিরস্কার করে বেওকুফ বলবে এটাই তো স্বাভাবিক।

এই রকম তিরস্কার ও অপমান জীবনে এটাই প্রথম নয়। পিতাকে হারিয়ে যেদিন শাব্দিক অর্থে এতিম হলাম, সেদিনও আমার কপালে আরেক তিরস্কার নসিব হয়েছিলো। হাসান নামে এক মিশরী বন্ধু তখন বাংলাদেশে সফরে এসেছিলো। আল্লাহর পথের এ পথিক পথ চলতে চলতে একদিন বন্ধু হয়ে গিয়েছিলো। বন্ধুর দুঃসংবাদ শুনে ছুটে এলো। জানাজার জন্য কফিন ধরে সেও মসজিদের দিকে চললো। কফিন মসজিদের চত্বরে আনা হলো এবং আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে দেয়া হলো। হাসান তখনো কিছু বুঝে উঠতে পারেনি, কিন্তু যখনি সে দেখলো, আমি সামনের কাতারে সমবেত মুসল্লিদের সাথে ইমামের

পিছনে দাঁড়িয়েছি, তখনি সে তড়িৎ ছুটে এলো আমার কাছে এবং প্রায় টানাটানি শুরু করলো আমাকে সামনে ইমামের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি যতোই বলি, জানাজা পড়াবেন ইমাম সাহেব, ততোই সে অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলে, তুমি কেন পড়াবে না? আরবিভাষী হাসানের কথা সবাই বুঝতে না পারার কারণে সে যাত্রা রক্ষা পেলাম। ইমাম সাহেবই জানাজা পড়ালেন। অভিমানী হাসান জানাজা আদায় করে আমাকে কিছু না বলেই অদৃশ্য হয়ে গেলো।

হাসান আমার উপর অভিমান করেছিলো। তিরস্কার করেছিলো। আমি চুপ করেই ছিলাম। আমি জানি, হাসানের দেশেও ইমাম ও আলেম বুজর্গরা জানাজার নামাজে ইমামতি করে থাকেন। তবে পিতামাতারাও যোগ্য সন্তান রেখে যান জানাজার নামাজ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে তাদের রুহের প্রতি সদকায়ে জারিয়ার পুণ্যসমূহ পাঠানোর জন্য। হাসান এমনটাই আশা করেছিলো আমার কাছ থেকে। কিন্তু সমাজের নিয়মনীতি অথবা আমার পলাতক মন আমাকে সাহস যোগাতে পারেনি পিতার শেষকৃত্যে যোগ্য সন্তানের ভূমিকা পালন করতে।

আমি আমার বাবার জানাজা পড়ালে অনেকেই সন্তুষ্ট হতো। কিন্তু আমরা দ্বীন থেকে পলাতক হয়ে দ্বীনদারী করি। দ্বীনের পথ একদিকে, আমরা আরেকদিকে। আল্লাহপাক সর্বশ্রেষ্ঠ, অনাদি অনন্ত, মহা-মহীয়ান, পরম পরওয়ারদিগার, নূর-আলা-নূর। তার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরী নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, যিনি নবীদেরও নবী। দয়াময়ের কিতাব পবিত্র কুরআনুল কারীম মানুষের জন্য একমাত্র জীবনবিধান। আল্লাহর দ্বীন ইসলাম, তাঁরই মনোনীত দ্বীন। কার সে পুণ্যের ফল জানি না, দয়াময়ের এই অসীম দয়া কেন হলো জানি না, কী কারণে এই মেহেরবানী হলো জানি না, তবু এটাই সত্য, আমরা এই দ্বীনকে পেয়েছি এবং মুসলিম হয়েছি। কেউ চেয়ে পায়, কেউ না চেয়েও পায়। কেউ সর্বস্বের বিনিময়ে পায়, কেউ জন্মগ্রহণ করেই পায়। না চেয়েও পাওয়া সম্পদ অমূল্য সম্পদ। এতোবড় সম্পদ পেয়েও মিসকিনের মতো হাশর হবে এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে? সে জন্যই এই নিয়ামতের দাবি হলো কুরবানি। যারা এই কুরবানি দেয়, জীবন দেয় তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি?

আসমানে বিদ্যুৎ চমকালে একজন আশার আলো দেখে, আরেকজনের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠে।

আশ্চর্য! আল্লাহর দ্বীনের আলো যখন চমকে উঠে, তখন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত সকল তাগুতের অন্তর কাঁপতে শুরু করে। অন্তরে দ্বীনের আলো আর অন্তরে শিখার আলো একজনকে মুমিন করে আরেকজনকে মুশরিক করে। হাজার মাইল দূরের দ্বীনের আলো সহ্য করতে পারে না, কিন্তু অতিনিকটের

শিখার আলোয় রাখিবন্ধন করে; এসব পিতৃপুরুষের কোন পুণ্যের ফসল?

ইতিহাসের অসংখ্য পুনরাবৃত্তি ইতিহাসের পাতায়ই লেখা আছে। মক্কা বিজয়ের দিন মক্কাবাসী টুঁ-শব্দটি করতে পারেনি। মদীনার মুনাফিকরাও কোনোদিন অস্ত্র হাতে নেবার সাহস করেনি। মুজাহিদের বহু প্রতিপক্ষ আছে, তাই বলে সবাই নয়। মদীনার মুশরিকরা মুজাহিদ-সাহাবীদের বিজয় দেখে হাতের আঙুল কামড়াতো। সেই হিংসা-যন্ত্রণা আজো আমরা বহু আদম সন্তানের চোখে-মুখে, আচার-আচরণে, লেখায়-রচনায় দেখতে পাই। বিদেশের মাটিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে আমার জন্মভূমির উপর হামলাকারীকে দুধ-কলায় পুষতে পারি। সংঘাত আর সন্ত্রাসে যারা রক্ত ঝরায় পথে ঘাটে, তাদের আশ্রয় স্বদেশের মাটি। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের পতাকা হাতে নিয়ে কোনো মুমিন পথে নামলে কেয়ামতের বিপদ দেখে গলা ফাটিয়ে যে চিৎকার করবে, সেও তার নামের আগে *মুহাম্মদ* লেখে। কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে প্রতিদিন রক্তাক্ত করছে যারা, তারা শুক্রবারের জুমার নামাজে খুতবা শুনে বিভোর হয় আবেগে। শিখার আলো যাদের চোখ ঝলসে দিয়েছে, তারা দ্বীনের আলো দেখতে পায় না। আগুনের শিখা দুর্ভাগা কপালকে পুড়িয়ে দিয়েছে। কেয়ামতের অনিবার্য অনির্বান চিরন্তন অগ্নিশিখা দুনিয়া থেকেই বুকে ধারণ করে নিয়ে যাবে– এই যদি বিধিলিপি হয় তাহলে তা খণ্ডানো যাবে না।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। এই দ্বীনের সাথে সংঘাত আল্লাহর সাথে সংঘাত। এমন দুঃসাহসের পরিণতি প্রতিটি মুসলমানের জেনে রাখা উচিৎ। যারা জানে না, তাদের জানিয়ে দেয়া উচিৎ। প্রতিটি মুসলমানের সাথে আমাদের রক্তের বন্ধন। এই বন্ধনকে ছিন্ন করছে যারা মুমিন শুধু তাদেরই শত্রু।

দুনিয়াতে আমরা যাদের অনুসরণ করে চলেছি, আখিরাতেও কি তাদেরই অনুসরণ করবো? জাতিসংঘ কোনো মুসলিম দেশে অবরোধ করলে আমরাও করি।

আল্লাহ বলেন, দ্বীনের আলোকে ওরা ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহর দুশমনরা যা চায় আমরাও কি তা-ই চাই? আল্লাহপাকের জীবনব্যবস্থা নিজেদের জন্য গ্রহণযোগ্য করে নিতে পারলাম না, সেই বিধান অন্যে গ্রহণ করলে তাকে অন্তত স্বীকৃতিটুকু দিতে পারি না। এমন মুসলিম নামধারণকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীকৃতি দেবেন এই আশা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ আর কিছু নয়। শিরক ও কুফুরে নিমজ্জিত জাতি সীমালঙ্ঘনের চূড়ান্ত করে চলেছে। উপযুক্ত শাস্তির জন্য কোনো শর্ত পূরণ করতে বাকি রাখেনি। এখন শুধু আলোর পথ ধরবে অথবা ধ্বংস আর লানতকে নসিব করে অবিলম্বে আল্লাহর জমিন ত্যাগ করবে।

একজন হিন্দু লেখক বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনপ্রশস্তি লিখেছেন এভাবে : 'যখন এই মহামানবের আবির্ভাব হয়, তখন সমগ্র আরবের খ্যাতি ছিলো শুধুমাত্র এক শূন্য মরুঅঞ্চল হিসাবে, এর বেশি কিছু নয়। এই শূন্যতা থেকে মহানবীর সোনালী স্পর্শে জন্ম নিলো এক নতুনজীবন, এক নতুনসভ্যতা, এক নতুনসাম্রাজ্য। যার বিস্তৃতি ছিলো মরক্কো থেকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এবং যার প্রভাব পড়েছিলো অবশেষে তিন মহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে– এশিয়ায়, আফ্রিকায় ও ইউরোপে।

মানবতা ও সভ্যতার দাবি হচ্ছে, সমগ্র বিশ্বকে যে ধর্ম এবং তার সভ্যতা ও দর্শন যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করেছে, শাসন করেছে, তার সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা, তাকে সম্যকভাবে জানা।

ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষভাবাপন্ন ইতিহাসবিদ উইলিয়াম মুরের অন্তর বিদীর্ণ হলেও তাঁকে লিখতে হয়েছে, *দেড় সহস্রাধিক বছর পরও কোনো কিতাব এমন অবিকল অক্ষত থাকা বিস্ময়কর*।

সে তো আল্লাহর কিতাব। আমি বলি, মুহাম্মাদের জীবনেরও একটি বালুকণা সমান তথ্যও আরবের বিস্তৃত মরুভূমিতে হারিয়ে যায়নি। তাঁর কোনো জীবনী লেখককে গভীর সাধ্য-সাধনা ও গবেষণা করে কোনো কিছু উদ্ধার করতে হয়নি। সেইসব দিন তো দ্রুত অতীত হতে চলেছে, যখন ইসলামকে রাজনৈতিক বা অন্যকোনো কারণে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছিলো।

আরবের কোনো একটি গোত্রের এক অতিথির একটি উট অন্য এক গোত্রের চারণভূমিকে সামান্য নষ্ট করার কারণে বিবাদ বেঁধে যায়। এই নিয়ে চল্লিশ বছর যুদ্ধ চলে, নিহত হয় সত্তুর হাজার। ফলে দুই গোত্রের জীবিতদের সংখ্যা নগণ্য হয়ে পড়ে; এই জাতিকে আত্মসংযম ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দিলেন মুহাম্মাদ সা.। যে দৃশ্য ইতিহাস বিস্ময়াভিভূত হয়ে লিপিবদ্ধ করেছে। শত্রুপক্ষের শত উস্কানি ও চক্রান্তকে উপেক্ষা করে অবশেষে যখন প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধে বাধ্য হয়েছেন তখনও মুসলমানকে সমকালীন যুদ্ধনীতির মোকাবেলায় ভিন্ন নীতিতে যুদ্ধ পরিচালনার শিক্ষা দিয়েছেন। যে জন্য তিনি সারাজীবনে যতো যুদ্ধে অংশগ্রহণ বা পরিচালনা করেছেন তাতে মাত্র কয়েকশ যোদ্ধা নিহত হয়েছে। দুর্ধর্ষ আরবজাতিকে যুদ্ধের বিভীষিকা ও বিশৃঙ্খলার মাঝেও সালাত আদায়ে নিবিষ্ট হওয়ার শিক্ষা দিতে তিনি সামর্থ হয়েছিলেন। সেই অসভ্য ও বর্বর যুগে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রকেও মানবতার শিক্ষাঙ্গনে পরিণত করতে সক্ষম হন। যুদ্ধে অগ্নিসংযোগ, ধোঁকাবাজি, অঙ্গীকার ভঙ্গ, নির্যাতন, শিশু বা নারী হত্যা, বয়স্কদের হত্যা, এমনকি খেজুরের ডালপালা ভাঙা বা জ্বালিয়ে দেয়া অথবা ফসলের একটি গাছকেও নষ্ট করা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। কোনো উপাসনালয় বা তার পূজারির ক্ষতিসাধন নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো।

তিনি নিজেই ছিলেন তাঁর কথা ও কাজের সর্বোচ্চ উদাহরণ। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী ও অপ্রতিরোধ্য নেতা। এই শহরেই তাঁকে দশ বছর নির্যাতন করা হয়েছে। এই মাতৃভূমি থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়েছিলো। এমনকি তিনশ' মাইল দূরে মদীনায় আশ্রিত হলে এরা সেখানে গিয়েও আক্রমণ করেছে। আজ তারা পদানত। যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তিনি যথারীতি প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি ঘোষণা করলেন ঠিক বিপরীত। *আজ কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, সবাই মুক্ত।* এ যে কত বড় বিস্ময় এবং এ শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব। এখানে তাঁর সেই শত্রুও ছিলো যে ওহুদে তাঁর পরমাত্মীয় ও সেনাপতি হামজাকে হত্যা করার পর বক্ষবিদীর্ণ করে কলিজা টুকরো টুকরো করে চিবিয়েছিলো। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের যে বার্তা তিনি বহন করে এনেছিলেন তা বিশ্বমানবতাকে সুউচ্চ আসনে আসীন করেছে। আরো অনেক ধর্ম এই বার্তার ধারক; তা সত্ত্বেও ইসলামের নবী তাঁর কর্মে ও জীবনে প্রত্যাদিষ্ট বাণীর যে বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়ে গেছেন তা শতাব্দি শতাব্দি ধরে ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করতে থাকবে। খলিফা উমর, খলিফা আলী, খলিফা মনসুর, আব্বাস এবং অন্যান্য বহু খলিফা ও রাজন্যকে বিচারকের সামনে সাধারণ নাগরিকরে মতো হাজির হতে হয়েছে।

আজ সাদা-কালোর লড়াই বিশ্বকে রক্তরঞ্জিত করছে। চেয়ে দেখুন বিলালের দিকে। চৌদ্দশ' বছর পূর্বের কথা। যেদিন বিলালকে কাবা ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে

আযান দেয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়, সেদিন কোরাইশ নেতাদের মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। এই পরিবর্তন কোনো দুর্ঘটনা ছিলো না। সাময়িক কোনো ব্যাপারও ছিলো না। এই শিক্ষা চিরস্থায়ী হওয়ার জন্যই এসেছিলো। তাই আরবের বহু স্বনামধন্য অভিজাত পরিবার ঐ কৃষ্ণকায় যুবকের নিকট তাদের কন্যা বিবাহ দিতে আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা মহান খলিফা হযরত উমরের দরবারে বিলাল উপস্থিত হলে তিনি সসম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন, *আমাদের নেতা এসেছেন*। বাস্তবিকই তিনি সাইয়েদেনা বিলাল নামেই সম্মোধিত হতেন।

জর্জ বার্নাড শ' বলেছেন, *আগামী একশ বছরের মধ্যে ইসলাম ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপকে শাসন করার সম্ভাবনা রয়েছে।*

নারীজাতিকে সর্বপ্রথম শৃঙ্খলমুক্ত করেছে ইসলাম। আরবদের চিরাচরিত রীতি ছিলো, যার হাতে বর্শা ও তরবারি থাকবে সেই উত্তরাধিকার ও ওয়ারিশ হবে। দুর্বলের প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করে প্রথম ইসলামই। চৌদ্দশ' বছর আগে নারীর অধিকার আদায় করে ইসলাম। এর বারোশ' বছর পর ১৮৮১ সালে গণতন্ত্রের সূতিকাগার নামে খ্যাত ইংলাণ্ডে বিবাহিতা নারীর অধিকার নামে আইন পাস করা হয়। শত শত বছর পূর্বে মুসলমানের নবী দৃপ্তকণ্ঠে নারীর অধিকার ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিলেন।

রাজনীতি ও অর্থনীতিকে ইসলাম পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তার মানব চরিত্র তৈরির মাধ্যমে। একজন অর্থনীতিবিদ যথার্থই বলেছেন, *ইসলাম পরস্পর বিরোধী বাহুল্যের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং সবসময় মানুষের চরিত্রকে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা চালায় যা সভ্যতাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে। উন্নতিকে নিশ্চিত করে এক মজবুত বিশ্বাসী ব্যবস্থায়, যার নাম যাকাত। আর প্রতিরোধ করে যাবতীয় অর্থনৈতিক অনাচার ও উৎপীড়নকে। দান ও সৎকর্মকে করে উৎসাহিত। এমনকি এতিমের প্রতি বাৎসল্যকে এক বিরাট পুণ্যময় কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইসলামই প্রথম।*

মহানবী নিজে এতিম ছিলেন। এতিমদের প্রতি তাঁর মহানুভবতা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে অবাক বিস্ময়ে।

সমকালীন মানুষের বিচারে, যুগের মান নির্ণয়ের বিচারে, পরবর্তী যুগের উপর প্রভাব ইত্যাদি সার্বিক মাপকাঠিতে সকল মানবীয় নিক্তি-পাল্লার মাপে মুহাম্মাদ সা. ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

ইতিহাসই সাক্ষ্য দিয়েছে, বন্ধু কিংবা শত্রু সবাই নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে তাঁর সততাকে, তাঁর বিশ্বস্ততাকে ও অপরূপ চরিত্র মাধুর্যকে। যারা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশকে বিশ্বাস করতে পারেনি তারাও তাঁর কাছে বিচার প্রার্থনা করতে ছুটে

আসতো। যারা তাঁর নবুওয়তকে বিশ্বাস করেনি তারা তাঁকে বিভ্রান্ত মনে করে তাদের দিকে টেনে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। যদিও সত্যকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তাঁর একান্ত নিকটজন ও সঙ্গী-সাথীরা। জন্মাবধি চোখের সামনে বেড়ে উঠা প্রতিটি দিনক্ষণের সাথে পরিচিতরা কোনো দ্বিধায়, সংশয় বা শংকায় পতিত হননি সত্যের উন্মেষ হওয়ায়। প্রভুর প্রত্যাদেশ প্রাপ্তিতে নবীরও কোনো চিত্তবৈকল্য হয়নি। নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠা ও একনিষ্ট বিশ্বাসের কারণে তাঁর অনুসারীরা ত্যাগ ও তিতিক্ষার সর্বোচ্চ উদাহরণ হয়ে রয়েছেন। মৃত্যুকে তাঁরা দু'বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করেছেন তাঁদের নবীর প্রতি অপার বিশ্বাসের কারণে। প্রাথমিক যুগের ইসলামের ইতিহাস পড়ুন; আপনার অন্তর ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রতি নির্যাতনের বর্ণনায় কান্নায় ভেঙে পড়বে।

মহীয়সী সুমাইয়াকে বর্শা ছুড়ে হত্যা করা হলো। যুবক ইয়াসিরের দু'পা দু'টি উটের সাথে বেঁধে দু'বিপরীত দিকে ধাবিত করা হলো।

খাব্বাব বিন হারিসকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে বুকের উপর দাঁড়ানো হতো এবং এতে তাঁর দেহের মাংস-চর্বি পর্যন্ত গলতে থাকতো। এই ছিলো মুহাম্মাদ সা.-এর অনুসারীদের সাথে দুর্ব্যবহার। এ অনুসারীদের নেতা ছিলেন মুহাম্মাদ সা.। ইসলামের প্রাথমিক যুগের অনুসারীরা অসাধারণ কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন ইতিহাসে। প্রথম চার খলিফার মেধা ও ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের খিলাফত সোনালী যুগ হয়ে খ্যাত রয়েছে ইতিহাসে। এরা সবাই বিশ্বনবীর পরশমানিক ধারণ করেই এমন আলোকজ্জ্বল হয়েছিলেন।

মুহাম্মাদের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করতে পারি মাত্র। ইনিই মুহাম্মাদ সা.। একজন নবী, একজন সুদক্ষ সেনাপতি। এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক। একজন দিগ্‌বিজয়ী, এক সফল ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রচারক, দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অসাধারণ বাগ্মী, সংস্কারক, অসহায় ও এতিমের সংরক্ষক। ক্রীতদাসের সহায়ক, নারীমুক্তির প্রথম প্রবক্তা। ন্যায়পরায়ণ বিচারক এবং এক মহান সাধক। এই সমস্ত গুণাবলির প্রতিটি গুণে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আঁধার।

অসহায়ত্বের করুণতম ছবি হলো একজন অনাথ শিশু। নবীর জীবন শুরু হয়েছে অনাথ হয়ে। পার্থিব জগতের চরম উৎকর্ষ যদি রাজশক্তি হয়, তাহলে তিনি সেই উচ্চতার শিখরে অবস্থান করেছেন। এক অনাথ শিশু থেকে সাম্রাজ্যের অধিপতি, এক বিশাল ও মহান জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দিশারী, সকল মানবজাতির মুক্তির লক্ষে সাফল্য দানে সক্ষম একক ও সফল ব্যক্তিত্ব।

যদি ধরে নেওয়া হয়, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব কোনো অন্ধকারে নিমজ্জিত বর্বর জাতিকে আলোর জগতে ফিরিয়ে আনায় নিহিত, তাহলে আরবজাতির

ইতিহাস তার সর্বোচ্চ উদাহরণ হবে। একমাত্র মুহাম্মাদ সা.-এর মতো শ্রেষ্ঠ মানবের পক্ষেই সম্ভব এমন জাহেলিয়াত থেকে টেনে তুলে একটি জাতিকে সর্বকালের মানুষের জন্য আলোকবর্তিকায় রূপান্তরিত করা। এক অনাথ শিশু থেকে ক্রমান্বয়ে যেভাবে আরবের রাজশক্তিকে ধারণ করেছিলেন, যে শক্তি পারস্যের খসরু ও রোমান সিজারের সমকক্ষ (তারও অধিক) ছিলো, যার আবেদন এই চৌদ্দশ' বছরে এতোটুকুও ম্লান হয়নি, ইতিহাসের শ্রেষ্ঠমানবের আসন শুধু তাঁরই।

এথেন্স বা রোম, পারস্য বা ভারতবর্ষ বা চীনের প্রাচীন কোনো বিদ্যাপীঠের বিদ্যার্থী ছিলেন না মুহাম্মাদ সা.। অথচ তিনিই ছিলেন শাশ্বত সত্যের সর্বপ্রধান শিক্ষক। অক্ষরজ্ঞানহীন এমন এক প্রবক্তা যার মুখ নিঃসৃত বাণী ও কথা জ্ঞানপিপাসুদের অন্তরকে আপ্লুত করে দিতো। অশ্রুরবন্যায় প্লাবিত করতো। কোনো সামরিক প্রশিক্ষণ যার ছিলো না, তাঁর পরিচালনায় মুসলিমবাহিনী বিশ্বের দুর্ধর্ষ জাতিগুলোর নাম ইতিহাস থেকে মুছে দিলো। একই ব্যক্তিত্ব যিনি একটি ধর্মের প্রবক্তা আবার নিজেই সংগঠক এবং সর্বোপরি নেতৃত্বে তিনিই সমাসীন, এই দুর্লভ ইতিহাসের একমাত্র উদাহরণ রক্তমাংসে তৈরি ইসলামের শেষনবী। রেভারেন্ড ওসওয়ার্থ স্মিথ এই মহান ব্যক্তিত্বের উপর দীর্ঘ-আলোকপাত করে বলেছিলেন, *তাঁর ব্যক্তিজীবনের সরলতা জনজীবনে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিলো।*

মক্কাবিজয়ের পর দশ লাখ বর্গমাইল জুড়ে আরব জনপদ তাঁর পদানত হয়। উত্তরকালে মদীনায় তাঁর গৃহপ্রাঙ্গনে স্বর্ণ-রৌপ্য স্তুপিকৃত হয়। কিন্তু তাঁর জীবনযাপন ছিলো এসব থেকে আলাদা ও অনেক ঊর্ধ্বে। নবীর সংসারের অবস্থা তো এমনই ছিলো, বহুদিন চুলায় আগুন জ্বলেনি। একটানা বহুরাত অনাহারে কেটেছে। খেজুর পাতার বিছানা জুটেছে। তারপরও বিনিদ্র রাত কেটেছে তাঁর প্রভুর প্রতি সিজদাহ্ করে। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, লাখ লাখ জীবন উৎসর্গকারী অনুসারীদের নয়নমণি যেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন সেদিন তাঁর ঘরে যে কটি মুদ্রা ছিলো তার কয়েকটি ঋণ পরিশোধ করতে ব্যয় হয়েছে আর বাকি কয়েকটি এক অভাবী যাচনাকরীকে দিয়ে দেয়াতে ফুরিয়ে যায়। যে ঘরে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হন সেই ঘরটি ছিলো অন্ধকারে নিমজ্জিত। কেননা বাতি জ্বালানোর জন্য একটুখানি তেল ছিলো না সেই ঘরে। অথচ এই ঘর থেকে যে আলোর রশ্মি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো, তাতে বিশ্বজগত আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। অন্ধকারাচ্ছান্ন পৃথিবী আলোর বন্যায় ভেসে গিয়েছিলো।

অনেকে বলেন, সৃষ্টিকর্তার সুন্দরতম সৃষ্টি হলো মহানুভব মানবসৃষ্টি। মুহাম্মাদ সা. সৃষ্টিকর্তার এমন এক সৃষ্টি যার তুলনা করার জন্য তিনি আর কাউকে সৃষ্টি করেননি। প্রতি রক্তকণিকায় তিনি ছিলেন মহৎ। তাঁর অকৃত্রিম মহত্ত্বের জিয়নকাঠি যাকেই স্পর্শ করেছে তিনিই হয়েছেন মহৎ জীবনের অধিকারী। একই

সাথে তিনি আল্লাহর দাস ও বার্তাবাহক। দু'লক্ষাধিক নবীর তালিকায় তাঁর নামটি সর্বশেষ এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী তাঁর অনুসারীরা। কোনো মুসলমানই মুসলমান নয় যদি এই সমস্ত জানা ও অজানা নবীর উপর বিশ্বাস না রাখে।

বিস্ময়কর যেসব মোজেযা তাঁর জীবনে সংঘটিত হয়েছে তার কিছুই তিনি নিজের কৃতিত্ব বলে দাবি করেননি। সবই তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে সংঘটিত বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কত সরল ও আন্তরিকভাবে তিনি নিজেকে প্রথম তাঁর প্রভুর দাস বলে পরিচয় দিতেন এবং পরে তিনি সেই প্রভুর বার্তাবাহক বলে দাবি করেছেন।

যেসব বিজ্ঞানসম্মত কথা তিনি আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে উচ্চারণ করেছেন তা বিস্ময়কর বটে। বহু যুগ পর্যন্ত তা অমুসলিমরা বিশ্বাস করতেও ব্যর্থ হয়েছে। বহু গ্রীক দার্শনিকের তত্ত্ব ও তথ্যকে ভুল প্রমাণ করেন মুসলিম গবেষকরা। এরিস্টটলের মতো মহাপতি পর্যন্ত পদার্থ বিজ্ঞানের প্রমাণ বিহীন তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ সা.-এর অনুসারীরা কুরআনের আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন তারই ফল আজকের এই সভ্যতা, বিজ্ঞানের এই বিশাল বিস্তার। আজকের ইউরোপ আপাদমস্তক মুসলিম মনীষীদের কাছে ঋণী। উম্মি নবীর জ্ঞানপীঠের শিক্ষার্থীরা জগতে যে জ্ঞানের আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত করেছেন তার ছটা যাদের উপর পড়েছে তারা জাতিধর্ম নির্বিশেষে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছেন।

যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কতবার এই কথাটি কুরআনে বলা হয়েছে? অন্তত অর্ধশতাধিকবার। যারা বিশ্বাসী অথচ অকর্মন্য ইসলাম তাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দেয়। আল্লাহ যথার্থই বলেছেন, *তিনিই সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন।* আগে মৃত্যুর কথা বলেছেন, পরে বলেছেন জীবনের কথা। ইসলামে মৃত্যু মানে কোনো কিছুর শেষ নয়। জীবনের মতো মৃত্যুও তাঁর সৃষ্টির অংশ। মৃত্যুর পরের জীবনকে নিয়ে কুরআন যা বলেছে, মুহাম্মাদ সা. যা বলেছেন এখানেই ইসলামের শাশ্বতরূপ মূর্ত হয়ে উঠে। ইসলাম এখানে অনন্য। মৃত্যু বিনাশ নয়। মৃত্যু সামান্য এক সোপান মাত্র। এই বিশ্বাস মুসলিমজাতির ইহকাল ও পরকালের যাত্রাপথকে মহীয়ান করেছে। মুসলিমজাতির বিশ্বাসকে করেছে গৌরবান্বিত।

এই জীবনটাকে দেয়া হয়েছে পরজীবনের জন্য। পরকাল অনন্তকাল। সেই অনন্তকালের ভালো-মন্দ নির্ধারিত হবে ইহকালের আলোকে। তাই মুহাম্মাদ সা.-এর জীবনকাল ছিলো কর্মময়। আল্লাহ বলেছেন, *তোমাদের আমি অযথাই সৃষ্টি করিনি।* মুহাম্মাদ সা.-এর জীবনের একটি মুহূর্তও অযথা ব্যয় হয়নি। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে মাথা পেতে নিয়ে দুর্বারগতিতে জীবনের সব কাজ সাঙ্গ করে বিদায় নিতে হবে আর পরিণতির জন্য দয়াময়ের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে।

মুহাম্মাদ সা. এই একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের নাম। আর পরম দয়াময় এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার নিকট আত্মসমর্পণ যদি ইসলাম হয়, তাহলে আমিও টমাস কার্লাইল, গ্যাটে ও আরো অনেক মনীষীর মতো বলি, *আমরাও তাহলে মুসলিম*।”

সুপ্রিয় পাঠক, এতোক্ষণ পর্যন্ত আপনারা যা পড়লেন তা একজন অমুসলিম হিন্দুধর্মাবলম্বী লেখকের লেখা আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সা. সম্পর্কে একটি পুস্তিকার সারসংক্ষেপ তরজমা। ইংরেজি ভাষায় লিখিত বইটির লক্ষ লক্ষ কপি দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত ইসলামি ব্যক্তিত্ব আহমদ দিদাত সমগ্র ইউরোপে ও আমেরিকায় বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি তার নিজস্ব। তাঁর নাম অধ্যাপক কে এস রামাকৃষ্ণ রাও।

একজন অমুসলিমের কলম সহজ সত্যকে যতো সুন্দরভাবে প্রকাশ করলো অথচ আমাদের মুসলিম নামের কিছু কলঙ্কিত লেখকের কলম থেকে যেভাবে নবীর নামে কলঙ্কিত কালি ঝরে তার কী ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি? এরা কলমের কলঙ্ক। কলমধারীর অন্তর যদি কলুষিত হয় তাহলে তার কলমের কালি যেখানে ঝরবে সেখানেই কলঙ্ক লেপন করবে। যদি অন্তর আলোকদীপ্ত হয় তাহলে তার কলমের কালো কালি উজ্জ্বল আলোকরশ্মি ছড়াবে।

নবীজী সা. নিজেকে আল্লাহর বান্দা বা দাস বলে ডাকাকে সর্বাধিক পছন্দ করতেন। কিন্তু কেমন দাস ছিলেন তিনি? আল্লাহ্ বলেন, *তোমরা আমাকে মানো ও আমার নবীকে মানো*।

নবীজী সা.-কে উম্মি বলা হয়েছে। তিনি কেমন উম্মি ছিলেন? কুরআনুল কারীমের মতো কিতাব– যার জ্ঞানভাণ্ডার জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত, দুনিয়া থেকে আখিরাত পর্যন্ত প্রলম্বিত, সেই মহান কিতাব তাঁকে দেয়া হয়েছে এবং তা শেখানোর জন্য তাঁকে শিক্ষক নিয়োজিত করা হয়েছে।

নবীজী সা. বলেন, *আমি তোমাদেরই মতো মানুষ*। কেমন মানুষ তিনি ছিলেন? আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হিজরতের রাতে বহু উদ্যত তরবারি থেকে বাঁচালেন, সওর পর্বতের গুহায় সন্ধানকারী কাফেরের উন্মুক্ত তরবারি থেকে বাঁচালেন, সেই প্রিয়বন্ধুকে ওহুদের ময়দানে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়ে কী পরীক্ষা করলেন? তরবারির আঘাতে দাঁত ভেঙে গেলো। শিরস্ত্রাণের লোহার আংটা মাথায় বিদ্ধ হলো। সাহাবীরা দাঁত দিয়ে সেই আংটা টেনে তুললে রক্তের বন্যা বইতে শুরু করলো। চোখের সামনে প্রিয়সাহাবীদের নিহত হতে দেখলেন। আল্লাহর নবী সা. যুদ্ধের ময়দানে বাস্তবিকই মানুষ ছিলেন। যেমনটা তিনি বলেছেন, *আমি তোমাদের মতোই মানুষ; পার্থক্য শুধু এতোটুকু, আমার উপর অহী নাযিল হয়।* তাই তো জিহাদের ময়দানে কোনো *বুজুর্গীর* সুযোগ নেই। উন্মুক্ত তরবারি হাতে একজন মানুষকে উপস্থিত হতে হয়, আর এখান থেকেই জান্নাতের দূরত্ব সবচেয়ে কম।

আমরাও মানুষ। আমরা কেমন মানুষ? আমরা এক নতুন প্রকৃতির মানুষ। এক ভিন্ন রঙের মুসলমান। মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে তৃপ্তি পাই। নবীর আশিক হতে অনেক সাধ জাগে। আবার দুনিয়ার আসন-ভূষণ, পদ-পদবি, আয়-উন্নতি থেকে বঞ্চিত হতেও রাজি নই। মানুষের আইন-কানুনের কাছে মাথানত করে আল্লাহর জমিনকে পাপের ভারে অস্থির করে তুলছি। আল্লাহ তাঁর দ্বীনের পথে বান্দাকে আহ্বান করেন। দুনিয়াকে পেছনে ফেলে দিয়ে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে একদল তাজাপ্রাণ যখন পথে নামে তখন আল্লাহর আরেকদল বান্দা ও নবীর উম্মত পথ থেকে তাদের ধরে নিয়ে যায়। জিন্দানখানার বন্দীশালাতেই মৃত্যু নিশ্চিত করে দেয়।

কিন্তু মৃত্যু যে সবকিছু বিনাশ করে দেয় না, তা তো ওই দুর্ভাগারাও জানে। কেননা তারাও *এক প্রকার* মুসলমান। আল্লাহর পথের প্রতি এই বাগাওয়াতি, এই দুঃসাহসিক তস্করবাজি, এই নিষ্ঠুর সন্ত্রাসের কী পরিণতি তা কি মৃত্যুর পূর্বে একবারও তারা জেনে যাবে না? বিচারের নামে প্রহসন, শাসনের নামে দ্বীনের পথে নির্মিত প্রাচীর কতদিন টিকে তা কি তারা দেখে যাবে না? প্রিয়নবী সা. এর বদর ও ওহুদের উত্তরসূরিরা তাঁর কপট অনুসারীদের দ্বারা নিগৃহীত হলে আমরা কবরে হাশরে কী জবাব দেবো? হায়রে আমাদের নবী প্রেম! **কি নিষ্ঠুর ভ্রাতৃঘাতী কাবিল চরিত্র নিয়ে আমরা কবরের দিকে চলেছি**।

প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, *একদল মুজাহিদ কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদ করবে*। তিনি একথা বলেননি, আরেকদল মুসলমান তাদেরকে বাধা দেবে, বন্দী করবে, যাবজ্জীবন শাস্তি দেবে। তবে মুজাহিদের প্রতিপক্ষ নিশ্চয়ই থাকবে, না থাকলে জিহাদ কেন হবে? **সেই প্রতিপক্ষ কারা হবে এইটুকু জ্ঞান যাদের নেই এমন নির্বোধকে হাবিলের কাকও নসিহত করতে লজ্জা পাবে**। সবকর্ম নিয়ে যাচ্ছি তো কবরের দিকেই। নিজবিচারে আপন কৃতকর্মে খুব তৃপ্ত আছি! আল্লাহপাকের নির্দেশিত জিহাদের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছি। নবীজীর অসিয়তকৃত জিহাদের পথ থেকে হাজার বাহানায় সটকে পড়েছি, নবীজির উম্মত হবার দাবি করে নবীজীবনের উপর পানি ঢেলে দিয়েছি। কবরে যাবার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হতে চলেছে। আমরা যাবো কি যাবো না এটা কোনো বিষয় নয়। বরং জানা কথা হলো, মুনকার-নকির প্রশ্ন করবে, উত্তরদাতা আমল অনুসারে জবাব দেবে। কামলিওয়ালা নবীকে নিশ্চিত চিনতে পারবো। কিন্তু ওহুদের যোদ্ধাবেশী রক্তস্নাত নবীকে যদি দেখানো হয়, তাহলে আমরা তাঁকে চিনতে পারবো তো?
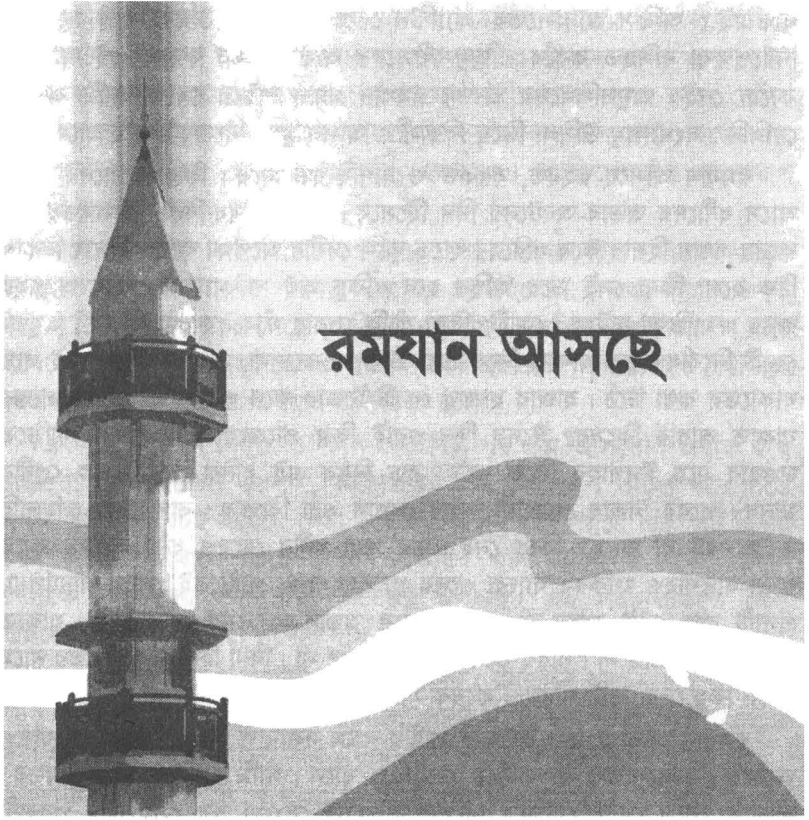
রমযান আসছে। পুণ্যের বারতা নিয়ে রমযান আসছে। অনেক কিছু নিয়ে আসছে। জিনিস পত্রের দাম সকাল-সন্ধ্যা বাড়বে। লালসালুর গিলাফ দিয়ে নিজেদের আড়াল করে দ্বীনের দুশমনরা ভর দুপুরে খানাপিনার আয়োজন করবে। দিনভর খানাদানা বিক্রি করে বিকেলবেলা মুনাফিকের আরেকরূপ প্রকাশ পাবে। গিলাফটাকে খুলে ফেলে টুপী মাথায় বেরিয়ে আসবে। হরেক রকম ইফতার নিয়ে দাওয়ার কাছে বসে পড়বে। ঈমানদারদের *আদুরে* সুরে ডেকে বেচাবিক্রি করতে থাকবে। রোযার দিনের অজুহাতে সারারাত খাবার দোকান খোলা রাখবে। সেহরীটাও কষ্ট করে খাইয়ে দেবে। রোযার মাসে হোটেল মালিকদের অনেক লাভ।

আসছে রোগবালাই। রোযা না রাখার অজুহাত খাড়া রাখা চাই। তাই আলসার আসবে মহামারীর মতো, কেননা রোযা না রাখা তার একমাত্র

দাওয়াই। অফিস-আদালতের ক্যান্টিন-রেস্তোরা জমে উঠবে পর্দা ছাড়াই। নিরপেক্ষরা নসিহত করবে : *অমুসলিমদের অধিকার খর্ব করবে এই অধিকার কারো নেই*। অমুসলিমদের অবশ্য রমযান মাসে বাইরে খেতে আমি কখনো দেখিনি। সংখ্যালঘু উসিলা দিয়ে *বিশ্বাসীরা* আপন মুখে নিজেরাই ছাই মাখে ।

রমযান আসছে রহমত, বরকত ও মাগফিরাত নিয়ে। কিন্তু আমাদের দেশে আসে ধনীদের অভাব-অনটনের দিন হিসেবে। সাধারণ মধ্যবিত্তরা যাকাতের অর্থ কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করে গরিবের হাতে তুলে দেয়ার অপেক্ষা করে। হিসাব নিকাশ ঠিক হলো কিনা সেই ভয়ে অস্থির হবে। কিছু অর্থ সদকায় ব্যয় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাইবে। কোটিপতিরা ফাঁকি দেবার ফাঁক-ফোকর খুঁজবে। অযুত-কোটি নির্বোধপতিরা যাকাত নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও করে না, সাহিবে মাল হলেই পরে যাকাতের কথা উঠে। হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণে ওরা জর্জরিত, ঋণগ্রস্তের যাকাত আবার কিসের? ঈদের দিন ওরাই কিন্তু পাজেরো আর নিশান গাড়িতে সওয়ার হয়ে ঈদগাহর দিকে ছুটে। বড় নিষ্ঠুর এই ধনিক আর বণিক শ্রেণীর মানুষ। পরের টাকায় পোদ্দারী করার নেশায় ওরা বিভোর। বাপদাদার জমিদারি কয়জনেরই বা আছে? কিচ্ছু নেই। তবু ওরা ধনীর চেয়েও ধনী। ওদের কাছে রাজা-বাদশাহও ফকির। ব্যাংক ওদের খাজাঞ্চীখানা; পার্টিতেই ওদের খানাপিনা, প্রপার্টি কত কেউ জানে না। তবু ওদের অভাব-অনটনের শেষ নেই। যাকাত দেবার প্রশ্নই উঠে না। গরিব ওদের দেখাই পাবে না। বিনা হিসাবে যাকাতের নামে যদিও কিছু দেয়, তার পরিমাণ কয়েক মুষ্ঠি ভিক্ষা ছাড়া আর কিছু না।

রমযান আসছে এবং ইফতার পার্টির নামে দলাদলি করার মোক্ষম সুযোগও আসছে। রাজনৈতিক ইফতারের ধুম পড়ে যাবে। দামি উপহার পাওয়া যাবে। এভাবে বেছে বেছে যেভাবে বিয়ের দাওয়াত দেওয়া হয় সেইভাবে পরবর্তী নির্বাচনে কাজে লাগবে এমন নির্বাচিত লোকদেরকে ইফতারে দাওয়াত দেয়া হয়। অফিস-আদলতেও ইফতার পার্টি শুরু হবে। উদ্দেশ্য একই; প্রচ্ছন্নভাবে দলীয় কর্মকাণ্ডকে জোরদার করা– ধর্মীয় বিশ্বাসে ইফতার-সেহরী করানোর রেওয়াজই এখন নেই। একেবারে যে নেই তা নয়; জীবন সায়াহ্নে যখন রোযা রাখার সাধ্য থাকে না কিংবা অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলে একজন মিসকীনের খোঁজ পড়ে। তাকে দু'বেলা খাওয়ানের ব্যবস্থা করতে হয়।

রমযান আসে মদীনায় ও মক্কা মুকাররমায় অনাবিল পবিত্রতা নিয়ে। নবীর দেশে পুরোটাই হয়ে উঠবে পবিত্রতার প্রতীক। আরবের দশগুণ বেশি মুসলমানের বাসভূমিতে আমরা রমযানের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারি না এরও হয়তো কোনো অজুহাত তৈরি করে রেখেছি কেয়ামতের দিন পেশ করার জন্য। সে দেশেও অমুসলিম আছে এবং বহু আছে। কিন্তু দুরাচারি করার দুঃস্বপ্নও কেউ দেখে না। উপবাস নিঃসন্দেহে কষ্টের ব্যাপার, অথচ এই কষ্টকে এতো হাসিমুখে

বরণ করার পরিবেশ কেবল একটি দেশেই বিদ্যমান আছে। রমযানকে ঘিরে এতো আনন্দ, এতো আয়োজন আর কোনো জাতির জীবনে এখন আর নেই। আমার কাছে মনে হয়েছে হজ্জের চেয়েও রমযানের আনন্দ ওদের কাছে বেশি। কারণ হজ্জের মৌসুম প্রায় দশদিন আর রমযানের আনন্দ মাসব্যাপী। হজ্জে ওরা অতিথিসেবক। কিন্তু রমযানে অতিথি, সেবকও। আতিথেয়তার চূড়ান্তরূপ দেখেছি রমযান মাসের আরবে।

আমি বিদেশি, তাই বাঙালি পরিবার থেকে যেমন ইফতারির দাওয়াত আসছিলো তেমনি আরবি পরিবার থেকেও আসছিলো। শেষের দিকে একই দিনে দু'টি করে ইফতারি পেয়ে মুশকিলে পড়লাম। মুশকিল ওরাই আসান করে দিলো। ইফতার ও সেহরীতে ভাগাভাগি করে ফেললো দাওয়াতকে। জীবনে প্রথম সেহরীতে দাওয়াত খাওয়ার অভিজ্ঞতা হলো।

একবার রমযানে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল খুব কম আসলো। অবাক হয়ে বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, কারণ কি? উনি বললেন : ভালো করে পড়ে দেখুন, আসলে রেটই কমিয়ে দেয়া হয়েছে। পনের বছর আগে এই রেট ছিলো এখন আবার সেখানে ফিরে গেছে সরকার। এটা জনগণের প্রতি রমযান উপলক্ষে সরকারের সহানুভূতি- শুভেচ্ছা উপহার। এই সহানুভূতিতে কেউ পিছিয়ে নেই। ব্যবসায়ীরা পণ্যের দাম কমাতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে।

মক্কা-মদীনায় প্রচুর বাঙালির বসবাস এখন। রমজানে মাছের চাহিদা বেড়ে যায়। আমদানিকারকরা চেম্বারকে জানালে, সাথে সাথে আমদানির কোটা বাড়িয়ে দেয়া হয়। সেই সাথে মাছের দাম অন্যসময়ের চাইতে অনেক কমানো হয়।

মদীনায় প্রিয়নবী সা. শুয়ে আছেন। বহু মুসলমান রমযানের ইবাদত সেখানে করার জন্য সমবেত হন। দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জমায়েত, তারাবীহ, উপবাসের কৃচ্ছ্রতা ও গভীর মৌনতা দেখে যথার্থই মনে হয় এমন পরিপূর্ণ আত্মসমর্পিত জাতিকেই তো দয়াময় জান্নাতের বাসিন্দা করবেন। কোটি কোটি মুসলমানের দেশে কোটি কোটি বেনামাজী থাকতে পারলে রোযাদারের সংখ্যা কত হতে পারে তার হিসাব লালপর্দার আড়ালে বেপরোয়া পাপাচার দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়। আমল-আকিদার স্তর অনুযায়ী আমাদের চিন্তা ধারণার ব্যারোমিটারও যথাস্থানে রয়ে গেছে। আরবে রোযার সময় অহেতুক কেউ খাবে এটা চিন্তা করা সম্ভব নয়; আমরা আল্লাহর হুকুমের অমান্যকারীকে প্রতিরোধ করতে পারি- এমন চিন্তাও করতে পারি না। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, এই ধারণার সীমানায়ও আমাদের চিন্তা প্রবেশ করতে পারে না।

দয়াময় আল্লাহর সাথে ভালোবাসার জন্যই যদি আমাদের রোযা থাকার কারণ হয়ে থাকে, তাহলে যারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রকাশ্য

বাগাওয়াতি করে তাদের প্রতি আমাদের আচরণে কি কোনো পরিবর্তনই হওয়া উচিত নয়? সারাদিন চোরাই পথে পর্দা ফেলে হারাম রুজির ধান্দা করে দিনের শেষে তারই অংশ পবিত্র বলে চালিয়ে দিলে মুত্তাকিরা বেকুব বনে যাবে! দুপুরের দস্তরখানায় বিকালে পাগড়ী বেঁধে ইফতারির দোকান খুলবে আর মুমিন মুসলমান তার দোকানে লাইন লাগাবে– এটা কিন্তু প্রিয়বান্দাদের শানের খেলাফ। বিবেক-বুদ্ধি আছে বলেই ঈমান এনেছি; ইনসাফ-বিচার আছে বলেই দ্বীনের উপর পথ চলছি। হায়া-শরম আছে বলেই পর্দাওয়ালার কাছে যেতে ঘৃণা লাগে, ওর ইফতার কেনার চেয়ে পানি দিয়ে ইফতার করা অনেক ভালো। রমযানের সাথে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। তবু বাড়বে। বিশেষ করে শেষ দশদিন বাজারে আগুন লাগবে। কেননা ঈদের লাগামহীন খরচ তুলতে ব্যবসায়ীরা বেপরোয়া হয়ে উঠবে। বছরের যেকোনো সময়ের চেয়ে মুনাফাখোরি রমযানের শেষ দশদিনেই অর্জিত হয়, তার প্রমাণ ব্যবসায়ীদের ব্যালান্স শীটেই পাওয়া যায়।

মাগফিরাতের শেষ দশদিন হারামাইনের দেশের মানুষদের পাগল করে তুলে। কি দিন, কি রাত। দিনে উপবাস, রাতে কদরের সন্ধান। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুই ইবাদতখানা বাইতুল্লাহর মসজিদ ও মসজিদে নববী কানায় কানায় ভরে উঠবে। শেষ দশদিনের রমযান, ইতেকাফ আর কদরের সন্ধান আল্লাহর প্রেমিকদের বিভোর করে দেয়। তারাবীহ ছাড়াও মধ্যরাতের সালাতুল কিয়াম, মাত্র দশরাতের সালাতে কুরআনুল কারীমের সম্পূর্ণ তেলাওয়াত, দশটি রাত লাগাতার জেগে থাকার সুযোগ ভাগ্যবান মুসলমানরাই পেয়ে থাকেন।

ধর্মনিরপেক্ষ দেশে রোযার মাসে দিনে দুপুরে হোটেলে খাওয়ার *সৌভাগ্য* হয়। এখানে আল্লাহর আইন মান্য করা জরুরি নয়। মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ হলে তার জায়গা কোথায় হবে এটা জেনে নেয়াও খুব জরুরি। নইলে *মানবধর্মের* অনুসারীরা ইসলামকে মানবধর্মের প্রতিকূল মনে করবে। মানুষের সৃষ্টিকর্তা মানুষের জন্য যে ধর্ম মনোনীত করেছেন তা যদি মানবধর্ম না হয় তাহলে ধর্মনিরপেক্ষদের কল্পিত মানবধর্মের অনুসারীরা মানুষ নয়; মানুষ হলেও কুরআনের ভাষায়, *ওদের কান আছে শুনে না, চোখ আছে দেখে না, অন্তর আছে বুঝে না। ওরা পশু কিংবা তার চেয়েও অধম।* না খেয়ে থাকার কষ্ট দয়াময় ঠিকই বুঝেন তবু দীর্ঘ একমাস একবেলা না খেয়ে কষ্ট করতে নির্দেশ দেন এই জন্য যে, অনন্তকালের জীবনে তিনি তাঁর অনুগত বান্দাকে নিয়ামতপূর্ণ আহার দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চান। আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জনকারী বান্দার জন্য গজবই একমাত্র পুরস্কার।

রমযান আসছে ঈদের ধুমধাম নিয়ে। রোযা নামায নেই তবু ঈদের আনন্দ-ফূর্তি উপভোগ করা চাই। এই সমাজ চোর ডাকাতদের মুক্তবাজার। রমযানে ওরাও ভয়ে থাকে, কারণ সাহেবদের ঈদের খরচ ওদের জোগান দিতে হয়।

হালাল কামাই করতে পরিশ্রম লাগে, হারাম কামাই করতে অজুহাত লাগে। মিথ্যা অজুহাতে হয়রানির ভয়ে আল্লাহর বান্দারা দয়াময়ের সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে। একজন ঈদ করার জন্য আরেকজনের হৃদপিণ্ডে ছুরি মারার পথ খুঁজে। ঘাড় মটকানোর যখন প্রয়োজন হয় তখন উজানের জন ভাটির জনকে বলে, তুই পানি ঘোলা করছিস বলে আমি পানি পান করতে পারছি না। কেয়ামতের দিন এরাও কি মুজাহিদের সাথে হাউজে কাউসারের কাছে পানি পান করতে দাঁড়াবে? হায়রে দুরাত্মা! দ্বীনকে বেঈমানের কাছে বিক্রি করে দিয়ে কী আশা তুমি করতে পারো! রমযান সাক্ষী আছে, ভাই হয়ে ভাইয়ের পায়ে বেড়ি পরিয়েছো, জিন্দানখানার বাসিন্দা করেছো, জালিম কাফেরের পক্ষ নিয়ে মুমিনকে অতর্কিতে বন্দী করেছো; কাল কেয়ামতের দিন বিচারক আল্লাহ হবেন, রক্ষীরা আল্লাহর হবে, বাদী মুজাহিদ হবে, আসামী হবে তোমরা সবাই। প্রথম সাক্ষী রমযানের মাস হবে এবং বুঝে নাও পরিণতি কি দাঁড়াবে!

আজ মুজাহিদকে সন্ধান করার জন্য পাগল হয়ে পড়েছ, অথচ তোমার নবী সা. মুজাহিদ ছিলেন। উম্মতের একাংশকে কেয়ামত পর্যন্ত মুজাহিদ হবার অসিয়ত করে গেছেন। আজ তালেবে ইলমকে তালেবান বলে গালি দিচ্ছো অথচ তোমার নবী তোমার জন্য, তোমার পিতা-মাতার জন্য, তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য ইলম তলব করা ফরয হওয়ার সংবাদ দিয়ে গেছেন। মুজাহিদ তোমার শত্রু, দেশের শত্রু, জাতির শত্রু– এই কথাটা বুঝানোর জন্য হেন কাজ নেই- যা করছে না। অথচ তোমার বন্ধু তোমার বিশ্বাসকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তোমার পিতামাতার ছিলো আরেক চিন্তা; তোমার জাতিকে নাফরমানির জন্য আল্লাহ তা'আলা পরিবর্তন ও ধ্বংস করে দিতে পারেন এই আশঙ্কায় যারা অস্থির তুমি তাদের পায়ের ধুলোর যোগ্য নও। এই মুসিবতের সময় মুজাহিদ বুক পেতে দিয়েছে তোমাকে রক্ষার জন্য। তার বিনিময়ে যদি এই হয়, তুমি হবে ভ্রাতৃঘাতী কৃতঘ্ন পাপাচারি, তাহলে খুব ভালো করে জেনে নাও, দুনিয়াতে মুজাহিদ আর তোমার এক ঠিকানা ছিলো না। আখেরাতেও এক ঠিকানা হবে না।

কেয়ামতের দিন যদি মসজিদকে আমাদের সম্পর্কে সাক্ষী করা হয়, কুরআনুল কারীমকে যদি সাক্ষী করা হয়, রমযানের মাসকে যদি সাক্ষী করা হয়, তাহলে সত্যবাদি সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে? আর প্রকৃত ব্যাপার তো এটাই, এরা শুধু সাক্ষী নয়, বাদীও হবে। দ্বীনকে নিয়ে এই খেল-তামাসার পর্যায়ে আমরা কেন পৌঁছলাম? আমরা কি এমন কোথাও পৌঁছে গেছি, যাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে: *সুতরাং তারা ফিরে আসবে না*।

রমযান আসলেই নামাযের কাতার বেড়ে যাবে আর রমযান গেলেই সব ভেগে যাবে। জামাতে দাঁড়ালেই তাকাব্বুরির পোশাকটি গুটিয়ে নেবে আর

বেরিয়ে গিয়েই তা ছেড়ে দেবে। নামাযে দাঁড়ালেই টুপীর ঝাঁপি খালি করে ফেলবে। তারপর আবার জড়ো করে রেখে দেবে। শবে বরাতের কদর বুঝবে আর শবে কদরের কোনো ফিকির করবে না। ঈদের শপিং আর কুকিং করতে বাজির ঘোড়া ছুটাবে আর গরিবের কাছে শীতের রাতকে বুঝিয়ে দিয়ে লেপ-তোষকে হারিয়ে যাবে। এরই নাম যদি দ্বীনদারি হয় তাহলে দ্বীনকে বুঝার জন্যে আবার একটু কষ্ট করাই উচিত হবে।

রমযান পবিত্র মাস। বন্দেগীর মাস। অপবিত্রতা ও বাগাওয়াতি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। হোটেল রেস্তোঁরা খোলা রাখার জন্য অনেক মিছিলও হয়েছে। অনেক হুঁশিয়ারিও উচ্চারিত হয়েছে। অবশেষে হ্যাঁ এর দল আর না এর দলে হয়তো কোনো আপোষ হয়েছে। তবে সূরা মুনাফিকুন-এর পবিত্র আয়াতগুলো যথারীতি যথাযোগ্য বান্দাদের প্রতি প্রযোজ্য হয়ে আছে। ইরশাদ হচ্ছে *যখন মুনাফিকগণ তোমার নিকট আসে তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এরা এদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে তা কত মন্দ! এটা এইজন্য যে, এরা ঈমান আনার পর কুফরী করছে। ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে। পরিণামে এরা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।* -আয়াত : ১,২,৩

যে জমিনে মাথা রেখে আমরা দয়াময়কে সিজদাহ করি, তাকে অপবিত্র করার চেতনায় যারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা মুমিনদের জন্য নিতান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ। হোক পুত্র কিংবা কন্যা, হোক ভাই কিংবা বন্ধু। হোক প্রতিবেশি কিংবা সহকর্মী, আপনজন অথবা আত্মীয়। যদি তার সাথে সম্পর্ক দুনিয়া ও আখেরাতকে উজাড় করে দেয়, তার সান্নিধ্য দয়াময়ের সান্নিধ্যের প্রতিকূল হয়, তার সাথে ভালবাসা জন্ম-জন্মান্তরের মাবুদ ও মাশুকের ভালবাসার প্রতিবন্ধক হয়, তার বন্ধন যদি ঈমানের বন্ধনকে দুর্বল করে দেয়, তাহলে এমন আপনজনদের অফাদারিকে একমুষ্টি ছাইয়ের বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দেয়া উচিত।

একবার পথ হারালে পথের দূরত্বই শুধু বাড়ে

মূর্খরা এখন স্বর্গসুখে আছে

যে আল্লাহকে চেনে না এবং জানে না সে মূর্খ। মূর্খ হওয়ার কারণে সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। মূর্খ হওয়ার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। অনেকে হয়তো বিনয় করে নিজেকে বলেন মূর্খ; পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের পরিবর্তে নিজেকে ক্ষুদ্র ও মূর্খ ভাবতে পছন্দ করেন। এটা তাঁদের সততা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে যে মূর্খ সে নিতান্তই দুর্ভাগা। মূর্খ দুই শাস্তির যোগ্য। যেমন কোনো মুসলমান যদি নামাজ পড়তে না জানে, তাহলে না-জানার এক শাস্তি এবং না-পড়ার আরেক শাস্তি। তবে এর বাইরে কিছু মূর্খ আছে যাদেরকে বিশ্বমূর্খ বলা যায়। এদের মূর্খতা বিশ্বজুড়ে মানুষকে লজ্জা দেয়। যেমন ড. আব্দুস সালামের সম্বর্ধনা আমাদেরকে সমস্ত মুসলিমবিশ্বে কলঙ্কিত করেছে। একজন কাদিয়ানীকে আমরা সম্মান করে আমাদের বিশ্বনবীকে কতখানি অপমান করেছি, তার জন্য মূর্খতাই হয়তো দায়ী। তবে সেক্ষেত্রে বড়ধরনের কাফ্ফারা দিতে ব্যর্থ হলে বড় কোনো শাস্তিকে মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ! নিঃশ্বাসে তুমি, বিশ্বাসে তুমি; এই উচ্চারণ যে করেছে, সে মুসলমান নয়। কিন্তু যাদের প্রতি করেছে তারা তো মুসলমান। যাদের নিঃশ্বাসে আল্লাহ, বিশ্বাসে আল্লাহ, তারা কি করে ঐ কুফরী কালামকে সহ্য করতে পারে? পথের একপাশে নামাজীরা এক বিশাল মসজিদে কাতারবন্দী হয়ে সিজদাহ করছে আর অপরপাশে শিখার আগুন নিরবধি জ্বলছে, শিরকের সাথে মুসলমানের এমন সহমরণের আয়োজন কারা করলো? ইসলামের মুক্তবসতি করবো বলে, ঈমান নিয়ে কবরে যাবো বলে যে জমিন আবাদ করেছি, তাকে আজ লগ্নি দেবার দলিল তৈরি করছে কারা একের পর এক? এসব জানলে মুসলমানের শান্তিপ্রিয় জীবন কতখানি বিঘ্নিত হবে?

মূর্খ কালিদাস গাছের ডালের আগার দিকে বসে গোড়ার দিক কাটছে–এই শিশুতোষ গল্প অনেকেই ছোটকালে পড়েছে। পরে কালিদাসের জ্ঞানলাভ হয়েছিলো। মুসলমানকে কালিদাসের মতো মূর্খরা বা পণ্ডিতরা জ্ঞান দিলে বিপদ হতেই পারে।

কুরআনুল কারীমের জ্যোতি যদি মুসলমানের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে শিখার আলো বা মঙ্গলপ্রদীপ দিয়ে অন্তরকে আলোকিত করার পরামর্শ দেবে কালিদাসের মতো মূর্খরা এবং তখন মূর্খরাই রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করবে সঙ্গত কারণেই।

গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে কথা বলা একসময় মহাপাপ ছিলো। সারা বাংলার ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে, চক্রবৃদ্ধি সুদে জর্জরিত করে অগণিত অসহায় মানুষকে যখন সর্বস্বান্ত করে ছাড়লো, তখন গ্রামীণের স্বরূপ প্রকাশ পেলো। গরিবদের প্রতি প্রকৃত দরদ নিয়ে আরেকটি ব্যাংক অতিঅল্পদিনে গ্রামগঞ্জে তাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের প্রশংসা করতে কোনো জনদরদীর মুখ খুলে না। তাদের প্রকল্প দেখতে আমেরিকার ফার্স্ট লেডি কিংবা বিশ্বব্যাংকের কেউ ছুটে আসবে না। কারণ এই ব্যবস্থা মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ফসল। ইসলাম যা হারাম করেছে, তাকে মুসলমানের জন্য হালাল করতে অবিশ্বাসীরা যেমন আগ্রহী, তেমনি কিছু মুসলমানও অতিউৎসাহী। এই দুশমনীতে কেউ যদি বিশ্বের কাছে প্রশংসিত হয়, তাহলে কিছু মুসলমান তার জন্য *নোবেল প্রাইজের* আবদার করে। একদিকে ঘরের শত্রু বিভীষণ আর অন্যদিকে তাদের নির্বোধ সমর্থক, এই অবস্থার বিপাকে পড়ে গরিব আরো গরিব হয়েছে। তারপরও ওদের নসিহত করবে মূর্খরা। আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের দিকে ফিরে আসা মূর্খের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের সৃষ্টিকর্তা মানুষের জন্য বিধান দিয়েছেন। মূর্খরা নিজেদের বিধান নিজেরাই তৈরি করতে পছন্দ করে। তাদের কাছে সংসদ-সংবিধান এসব পবিত্র। ভোট পবিত্র আমানত, গণতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষার্থেও জীবনমরণ সংগ্রাম করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে যা পবিত্র সেই কুরআনুল কারীমের বিধানকে উপেক্ষা করে তারা অপবিত্র জীবনবিধানকে মেনে নিয়েছে। এই মূর্খদের অনুসরণ করলে জাহান্নামই ঠিকানা হবে এটা যারা বুঝে না, তারা আসলে গণ্ডমূর্খ।

কোনো এক ব্যারিস্টারের লেখা প্রায় দেড়কেজি ওজনের একখানি আধা-ইতিহাসমূলক বই পড়েছিলাম। কী আহামরি বর্ণনা। এপার-ওপার দুপারে একাকার হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিলীন হয়ে লেখক কিছু নতুন দিকদর্শন দিতে চেষ্টা করেছেন। এমনকি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজীর সতেরজন সৈনিক ঐতিহাসিক দিগ্‌বিজয়কে তিনি অস্বীকার করে বসেছেন। মুসলমানদের কীর্তিকে বহু মুসলমানই কীর্তি বলে মনে করে না। এমন মুসলমান

নিজেকে মুসলমান বলে গৌরবান্বিত মনে করে না। এরকম মুসলমানকে নিয়ে ইসলামেরও কোনো গৌরব নেই। যে মুসলমানকে ইসলাম সম্মান দেয় না, তার জন্য অসম্মান অদূরেই অপেক্ষা করতে থাকে।

সমাজে বহু গুণী মানুষের নাম শোনা যায়। আল্লাহর পথের পথিকদেরকে নিগ্রহ করেই এরা যশস্বী হয়েছে। কবি, সাহিত্যিক, নেতা, পিতা যতো নামেই তাদের ডাকা হোক না কেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি তাদেরকে বান্দা বলে না ডাকেন, তাহলে যশস্বীরা জাহান্নামে একা যাবে না, একসাথে ওদের ভক্তদেরও নিয়ে যাবে।

মুসলমান যাদের নিয়ে গৌরব করবে, অবিশ্বাসীরা তাদেরকে নানা কৌশলে অপমান করবে এটাই তো নিয়ম। মেরে ফেলতেও দ্বিধা করবে না। একজন মানুষকে মারতে কয় ডজন মিসাইলের প্রয়োজন হয়? জওহর দুদায়েভকে মেরেছে, আবদুল্লাহ আযযামকে মেরেছে, আরো মারবে কিন্তু মুসলমান কাকে মেরেছে? দু'পায়ে ভর করে একটু দাঁড়াবে, পথে গিয়ে চিৎকার দিয়ে একবার আল্লাহু আকবার বলবে, এতোটুকু আশা করাও কি মুসলমানের কাছে যায় না?

সুদান-আফগানিস্তানে মিসাইল দিয়ে আঘাত করলে অন্যদের সাথে কিছু মুসলমান তালি বাজায়। এইসব মূর্খ মুসলমান দুনিয়াতেই স্বর্গসুখ পেতে চায়। অবিশ্বাসী বান্ধবদের ধ্যানধারণায় একাত্ম হওয়ার কোনো কারণই খুঁজে পায় না। সত্তর হাজার বীর সেনানী ট্যাংক মিসাইল নিয়ে যখন প্রবলপ্রতাপে *লড়কে লেংগে আফগানিস্তান* বলে ছুটে আসে তখন মাত্র একহাজার মুজাহিদকে পাঠানো হয় সীমান্ত রক্ষা করতে; যখন দুই লক্ষ সত্তুর হাজার সেনা কুচকাওয়াজ সমাপ্ত করে বাঁশী বাজার অপেক্ষা করছে, তখন সাড়ে চার হাজারের একটি দলকে নির্দেশ দেয়া হয় জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর কাফেলাকে সীমান্তের দিকে ঘুরিয়ে দিতে। সংবাদ শুনে মূর্খেরা অট্টহাসিতে লুটিয়ে পড়ে। মহামূর্খ আর কাকে বলে? আমীরুল মুমিনীনদের ইতিহাস ওরা থোরাই জানে। মূর্খরা যখন স্বর্গসুখে বিভোর থাকে, অল্প সংখ্যক মুমিন তখন জান্নাতের দিকে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলে।

একের ভেতর তিন

খৃস্টানরা যিশু খৃস্টের অনুসারী বলে দাবি করলেও দুর্ভাগ্যক্রমে ওরা খৃস্টধর্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে বহুকাল আগেই। যে *মহামতি* তাদের জন্ম-জন্মান্তরের কপাল পুড়ালেন তাঁর নাম *সেন্ট পল*। এই মহামানবের আবিস্কারই একের ভেতর তিন অথবা তিনের ভেতর এক। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় ঈশ্বরের ধারণা মানুষের মনমগজকে যে বিভ্রান্তিতে নিপতিত করেছে, সেখান থেকে

বেরিয়ে আসার কোনো চেষ্টাই এখন সফল হবার নয়। একবার পথ হারালে পথের দূরত্বই শুধু বাড়ে।

মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা খুব কম হয়নি। ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, স্বদেশ, স্বজাতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে মুসলিম মানসকে বহু ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে। আল্লাহপাকের কুরআন অপরিবর্তনীয়, নবীজীবনের প্রতিটি অনুপরমাণু মুসলিমজাতির কাছে চোখের মনির মতো জ্যোর্তিময় হয়ে আছে। তাই শিকড় কাটা সম্ভব নয় বিধায় একটু এদিক সেদিক সরে গিয়ে কলাকৌশল অবলম্বনের শলাপরামর্শ হরহামেশাই চলেছে। সব ফিকির ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। কারণ কিছু বেআন্দাজ মুসলমান এইসব ঘোরচক্করে যথার্থই ধরা খেয়েছে।

একের ভেতরে তিনের ত্রিশূলে বিধে আছে–পুরো জাতিটাই এখন। ঈমানদার বা বিশ্বাসীর অপর নাম মুসলমান। অন্তরে বাহিরে বিশ্বাসের যে প্রতিভু সেই মুসলমান। তার বিশ্বাসই তার ধর্ম। বিশ্বাস তাকে স্বতন্ত্র কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দিয়েছে। কারণ অন্যকোনো কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তার বিশ্বাসে চিড় ধরিয়ে দিতে পারে না; বিশ্বাসকে লালন করতে সে স্বদেশকে পরিত্যাগ করে হাসিমুখে নির্বাসনকে বরণ করে নেয় অথবা স্বদেশেই বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিশ্বাসী হওয়াই তার সর্বোচ্চ গৌরব। এখানে স্বজাতির কোনো গৌরবই তার কাছে অধিক মূল্যবান নয়। তাই স্বজাতির সব ইহসান সে ফিরিয়ে দিয়ে বিশ্বাসকে আলিঙ্গন করে বিশ্বাসের কোলে মাথা রেখে শান্তি পেতে চায়। বিশ্বাসীর প্রথম ও শেষ পরিচয় সে মুসলমান। প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে সে মুসলমান।

বাঙালি গর্ব করে এইজন্য যে, সে বাঙালি। তার একটি ভাষা আছে। ভাষা সকলের আছে। এমন কোনো প্রাণী নেই যার ভাষা নেই। কিন্তু তার স্তর ও ভেদ আছে। ক্রমানুসারে বাঙালির ভাষার স্থান অনেক উপরের দিকে। বাঙালির বহু বৈশিষ্ট্য আছে, স্বতন্ত্র গুণাগুণ আছে, অতীত ঐতিহ্য আছে, যা তাকে অনেকের কাছে মর্যাদাবান করেছে। তবে অনেক মর্যাদা তার অমর্যাদার কারণও বটে। দু'শো টাকা দিয়ে পান্তা ভাত খেয়ে সে তার মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। হাতে শাঁখা ও মাথায় সিঁদুর পরে শ্যাম রাখা সম্ভব হলেও কুল রাখা দায় হবে এটাও অনেকে বুঝেনি। পানির নামই জল এবং জলের নামই পানি। তবু একজনের কাছে যা পানি আরেকজনের কাছে তা জল। স্ব স্ব স্থানে এই নামকরণ মর্যাদাপূর্ণ, ব্যতিক্রম হলে তা অমর্যাদাপূর্ণ।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি পরিচয়। একটি মানচিত্র, একটি ভূখণ্ড একটি জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা, তাদের পরস্পরের প্রতি আচার-

আচরণ ও দায়দায়িত্বের রীতিনীতি ইত্যাদি ধারণ ও লালন করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে। মানুষের জন্ম একবার হয়। জাতীয়তাবাদের পুনর্জন্ম হতে পারে। আগের জন্মে তার এক পরিচয়, পরের জন্মে আরেক পরিচয় হয়। কোন জন্মে সে ভালো আর কোনো জন্মে সে মন্দ এই দ্বন্দ্বে সে নিজেই দিশাহারা হয়ে পড়ে। জাতীয়তাবাদের আরেক বিপদ তার অহংকার। অনেক জাতিকে যা ধ্বংস করেছে। অনেককে জালিম করেছে। অনেক শত্রুতার বীজ বপন করে এই জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বয়স খুব অল্প। এই শিশু জাতীয়তাবাদকে লালন করতে অনেকেই হিমশিম খাচ্ছে।

একের ভেতর তিন অথবা তিনের ভেতর একের ঘোরপ্যাঁচে পড়ে আমাদের এখন তিন হালতে রূপান্তর ঘটেছে। প্রেমিকার পাল্লায় পড়ে অনেক দুরাচারি মায়ের ইহসানকে ভুলে যায়। বউয়ের ঝাপটা খেয়ে অনেক হতভাগা বাপের হুকুম তামিল করতে ব্যর্থ হয়ে যায়। নিজেকে বাঙালি পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকের এমন দুর্ভাগ্য হয়, তার মুসলিম পরিচয়ের মোহরাঙ্কনটি ঢাকা পড়ে যায়। ছাই দিয়ে আপন মুখমণ্ডল লেপন করলে আপন পিতামাতাও সন্তানকে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হবে। ইসলাম এমন এক জ্যোতি যা অন্তর বাহির সবকিছুকে আলোকিত করে তুলে।

জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে যেখানে মুসলমান পা ফেলবে সেখানেই টর্চের আলোর মতো দ্বীনের আলো তার সাথী হয়ে থাকবে। এমন যে মুসলমান সে কেন অন্যকোনো খোলস পরে তৃপ্ত হতে চায়? যার মা আছে তার জন্য মাসির কাছে থাকার প্রয়োজন পড়ে না। মুসলিম পরিচয় কোনো অনাথ পরিচয় নয়। এই নামের সাথে ঐশ্বর্যের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ঐশ্বর্যের ঐ ভাণ্ডারে বাংলা ভাষা আছে, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা সবই আছে, মাতৃভূমির জন্য ত্যাগ ও দায়িত্ববোধ আছে। মুসলমান অন্যপরিচয়ের খোলস পরলেই তাকে নানা জীবাণু আক্রান্ত করে। যুগে যুগে বহু সংস্কারকের আবির্ভাব এই জন্যই হয়েছে। কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠানের রেশ ধরে এইসব ব্যাধি যখন মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দেয়, তখন দ্বীনের পুনর্জাগরণ ঘটাতে এদল মুজাহিদের আবির্ভাব জরুরি হয়ে পড়ে।

বাঙালি নামের মাধুর্যে, এই নামের নিবিড় আবেশে একটুখানি সুখ পেতে কার না সাধ হয়! যদি এই বাংলার জমিনে তার জন্ম হয়।

আমার এক বন্ধু নিজেকে বাঙালি বলতে এতোই গর্ববোধ করতেন, এই উপমহাদেশের অন্যান্য জাতিকে পর্যন্ত তিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। একবার পশ্চিমবঙ্গে গেলেন বেড়াতে। এপার বাংলা ওপার বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য একইসূত্রে বাঁধা এটাই তো সাধারণ জ্ঞান। তিনি গেলেন খুব খুশি মনে, যেন আত্মীয়-স্বজন দেখতে যাচ্ছেন। ফিরে এলেন একেবারে ক্ষুব্ধ

হয়ে। সেখানে গিয়ে জানলেন তিনি বাঙালি নন, বাঙ্গাল। ওরা মুসলমান বাঙালিকে বলে বাঙ্গাল এবং তুচ্ছার্থেই বলে। শ্লেষ মুখে উচ্চারণ করে। এই উচ্চারণ শুনে তাঁর ব্রহ্মতালু উত্তপ্ত হয়ে গেলো। একেবারে ক্ষ্যাপা হয়ে ফিরে এলেন। এর কারণ কি? কারণ ইসলাম। আমার মধ্যে ইসলাম থাকার কারণে বাঙালিত্বে পূর্ণতা থাকে না। সঙ্গীতে, নৃত্যে আমরা অপুষ্ট। পোষাকে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ অনুষ্ঠানে, আচারে-বিচারে আমরা ব্যতিক্রম, বাঙ্গলায় জন্ম নিয়ে বাঙালি হলেও আমরা মুসলমান তাই আমরা বাঙ্গাল। *যার লাইগা কাইন্দা মরি সেই করলো পর?* বড়ই দুঃখের কথা! তাহলে কি জন্মগতভাবে বাঙালি হওয়া যায় না? ভাষাগতভাবেও যায় না? বোধ হয় যায় না। যেমন, সউদীআরবে জন্মগ্রহণ করলেই সউদী হওয়া যায় না। আরবিতে কথা বললেই আরব হওয়া যায় না। তবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি থাকলে সবই সম্ভব। সউদী হওয়া যায়, বৃটিশ হওয়া যায়। স্বাধীনতার কারণে ও জাতীয়তার প্রয়োজনে আমরা বাংলাদেশি হয়েছি।

মনে হয় জাতীয়তাবাদ খুব শক্ত খুঁটি। এই খুঁটিতে বাঁধা আছে দেশ ও দেশরক্ষা, অর্থনীতি ও রাজনীতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, স্বকীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং ধর্ম। মুসলমানের কাছে কি ইসলামের এই অবস্থান? নয়, নয় এবং কিছুতেই নয়। কখনো নয়। মুসলমানের কাছে ইসলামই খুঁটি। এই খুঁটিতেই বাঁধা থাকবে তার সবকিছু। তার হায়াত, তার মউত। এই খুঁটির জোরেই তার সার্বিক কর্মকাণ্ডের জোর। কোনোকিছুর জন্য ইসলাম, ইসলামের জন্য সবকিছু। রাষ্ট্রের জন্য ইসলাম নয়, ইসলামের জন্য রাষ্ট্র। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পোকা মাথায় নিয়ে একজন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করলেন। এই পদক্ষেপই শেষ পদক্ষেপ হতে পারেতা, কিন্তু হলো না। এটি একটি পদক্ষেপ বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে না। কেননা তিনি নিজেই হা-উপ্লায়ী, হা-উলায়ী। এখন এদিক, তখন ওদিক। এদিকেরও আবার ওদিকেরও। দুদিল বান্দারা কোনো কাজেই কামিয়াব হয় না।

একের ভেতর তিন বা তিনের ভেতর একের রহস্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এক ও অদ্বিতীয় দয়াময়ের স্মরণাপন্ন হতে হবে। তাঁর মনোনীত দ্বীনের উপর একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণই কেবল এসব বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। এই বিভ্রান্তি আমাদের একদলকে বলতে সাহস যুগিয়েছে, তারা আপাদমস্ত বাঙালি। ঘরে বাইরে বাঙালি, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সার্বিক জীবনে বাঙালি, ইসলাম একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়, জীবনের বিশাল কর্মক্ষেত্রে তাকে টেনে আনা নিতান্তই অন্যায়। এই দুঃসাহসকারীরা এখন সমাজের প্রথম কাতারটি দখল করে আছে। স্বঘোষিত জ্ঞানীজনদের এই দলটি যে মোটেই নিরাপদ নয় তা হাবিলের কাক চেষ্টা করেও বুঝতে ব্যর্থ হবে। কেননা জ্ঞানপাপীদের বুঝই তাদের শাস্তি।

দ্বীনকে ধারণ করে যারা ধন্য তারা মুসলমান হওয়াতেই কামিয়াব হবেন। তারা একাধিক অবস্থায় বিলীন বা রূপান্তরিত হন না; দুই বা তিন রূপে তারা নিজেদের পরিচয় দেন না। মুসলমান ছাড়া অন্যকোনো পরিচয় বহন করতে তারা রাজি নন। কেননা জগতের অন্য মুসলমানকে নিয়ে তারা যখন কাতারবন্দী হন, তখন কারো কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় থাকে না।

কবরে যেতে হবে। যাবার দিন বাড়ির যে অবস্থা হবে তাতে অনুমান করা কঠিন হবে না, এ শুধু একটি বিদায়ের ঘটনা নয়, এরপরও কিছু ঘটনা আছে। কবর থকে পরবর্তী সব ঘটনা ঘটবে দুনিয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একমাত্র মুসলিম পরিচয়ই হবে পরকালে মাপকাঠি। কে কত বড় বাঙালি ছিলাম, কে কত বড় জাতীয়তাবাদী ছিলাম এসব তুচ্ছ ব্যাপার সেখানে গুণাগুণতির মধ্যে আসবে না। সব হিসাব-নিকাশ হবে ইসলামের দাড়িপাল্লায়। তাই দুনিয়ার জাতিসত্তা, জাতীয়তা বা জাতীয়তাবাদ সবকিছুই ইসলামের রংয়ে রঞ্জিত হওয়া উচিত। কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সমাজ, রাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইসলামভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ও সেই স্বীকৃতি বাস্তবায়ন করতে আমরা বাধ্য।

স্ববিরোধিতা হঠকারতারই নামান্তর। যে মুসলিম সে আর কিছু হলে তাকে ছাড় দিতে হয়। অন্য চেতনা মুসলিম মানসে ঠাঁই পেলে তাকে দুর্বল করে ছাড়ে। যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলমানকে ইসলামবিহীন করতে একটুখানি সময় নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না।

আল্লাহ পাক আমাদের যে নাম দিয়েছেন, যে পরিচয় দিচ্ছেন তা-ই সর্বোত্তম। অন্যকোনো জঞ্জাল নিয়ে তার কাছে ফিরে গেলে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

দর্পনে দেখ অন্তরের ছবি

কুরআনুল কারীম এমন এক নির্দশন, যার ব্যাপ্তি কেয়ামত পর্যন্ত। পৃথিবীর বিস্ময়, অপরূপ এক দর্পন, যার উপর অনাদিকাল থেকে অনাগতকাল পর্যন্ত আগন্তুক সকল মানুষের ছায়া পড়েছে। আজ যারা বর্তমান কাল তারা অতীত। আমীকাল সহসাই বর্তমান হবে, আবার অতীত হবে। প্রতিটি বর্তমান কালের ছায়া ড়েছে কুরআনুল কারীমে মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রতিটি মানুষের ছবি। মুহূর্তে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে অন্তরের অন্তঃস্থলের প্রতিচ্ছবি। আজকের দুনিয়ার ঘটমান বর্তমান ও আপন ছায়া যথারীতি ফেলে রেখেছে সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনের দর্পনে, যেখানে চোখ রাখলেই ধরা পড়বে অগণিত মানবের চেহারা চরিত্র। সপ্তম শতাব্দীর আবু লাহাবকে যে দর্পনে অনায়াসে সনাক্ত করা সম্ভব ছিলো, আজও

যে কোনো আবু লাহাবকে একই দর্পনে নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা সম্ভব।

এ যুগের মুসলমান কুরআনের আইন-কানুন মানতে প্রস্তুত নয় নানাবিধ করাণে। কুরআনের কাঙ্ক্ষিত আচার-আচরণটুকু মানতেও অপারগ হয়ে পড়েছে হতভাগ্য মুসলমান। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর ব্যবধান মিটিয়ে দিতে সর্বস্ব ত্যাগ করতে কোনো দ্বিধা ছিলো না বিধায় অবিশ্বাসীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। এখন সে ব্যবধান মিটিয়ে দিতে সর্বস্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছে মুসলমান। আর সেজন্য বিশ্বাসীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার সব লক্ষণই পরিস্ফুট হচ্ছে দিনের আলোর মতো। আগুন আর মূর্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে মুসলমান আর তার প্রতিপক্ষও হবে মুসলমান, এই নিষ্ঠুর সত্যের সাক্ষী হয়ে এই বাস্তবতার দলিল নিয়ে আমরা কবরে যাবো, মিজানের সামনে দাঁড়াবো, আবার জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ফরিয়াদও করবো? কুরআনের পাতায় পাতায় শিরকের প্রতি হুঁশিয়ারি ও তার ভয়াবহ পরিণতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তারপরও কুরআনের অনুসরণকারীদেরকে শিরক থেকে বিরত রাখার জন্য সংগ্রাম করতে হয় এই জন্য যে, কুরআনকে মান্যকারীরা কুরআন পড়ে না এবং বুঝে না। বুঝে শুনে যারা অমান্য করে তাদের ব্যাপারে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত দেবার অবকাশ নেই। তবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহকে মেনে যারা বসবাস করবে তারা মূর্তি ভাঙবে, আগুন নিভাবে, দ্বীনের উপর যারা বাগাওয়াতি করে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িত করতে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে।

আদম আ. থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত যতো মানব সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হবে তাদের মধ্যে এমন একজনকেও সৃষ্টি করা হয়নি, যাকে অন্যের সাথে মিল রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ এই বিশাল মানবকুলের প্রতিটি সত্তার পরিচয় দিয়েছে কুরআনুল কারীম অভিনব কৌশলে। সুদূর অতীতের কিংবা দূরতম ভবিষ্যতের সবমানুষ কুরআনের পাতায় জীবন্ত চরিত্র হয়ে আছে। যাকে দেখি, যেখানে দেখি তাকে চিনে নিতে কুরআনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে চেষ্টা করি আর অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি নির্ভুল বিচারে, নিখুঁত সমাধান। অনায়াসে পবিত্র কিতাব তুলাদণ্ডে নিরীক্ষা করে জানিয়ে দেয় দয়াময়ের এই সৃষ্টিটি কতখানি ন্যায়নিষ্ঠ, নিখাঁদ, আর কতটা ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার। দর্পনে প্রতিভাত হয়ে উঠে সে সৃষ্টির সেরা, নাকি নিকৃষ্ট পাপাচারী। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ কুরআনের খেলাফ হয়ে যেতে পারে তবু হুকুমতে এলাহীর মানদণ্ড কুরআনুল কারীমই থাকবে। কোনো অজুহাতে নিক্তির হেরফের হবে না। সমাজ খারাপ, সময় খারাপ, নেতা-নেত্রী খারাপ, আইন-কানুন খারাপ, অতএব আমিও খারাপ অথবা সুযোগের অভাব, বুঝের অভাব, অতএব অভাবের দোষেই আমার ঈমান-আমলের অভাব, এসব বুজরুকি কথা দিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়া যাবে,

ফাঁক-ফোকর কল্পনা করা যাবে, কিন্তু শেষ বিচারে পাকড়াও হওয়া নিশ্চিত হয়ে থাকবে।

যতো বিচিত্র মানুষ চোখে পড়ে, বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী, সব ধরনের মডেল আছে কুরআনে। অধিকাংশই কুরআন পড়ে না, পড়লে অনেক মডেলের রং পরিবর্তন হয়ে দয়ময়ের রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে যেতো। কুরআন না পড়া একবার সয়ে গেলে বিশ্বাসে ফাটল ধরা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠে। তখন ধর্মনিরপেক্ষ হলে বিস্মিত হবার কোনো কারণ থাকবে না। শাসনে-ভাষণে এতো কাপালিক অথচ সবাই রসাতলে যাচ্ছে। তার কারণ কুরআন ওদের পথ প্রদর্শক নয়; অন্যান্য বহু মহাগ্রন্থ পাঠ করে নিজেরাই একসময় থিসিস লিখে ফেলেছে; অতএব সবাই আর্কিমিডিস সবাই নিউটন। এখনো কুরআন বিমুখ হতে যারা বাকি আছে তারাও হয়তো এসব কাপালিকের পেছনে ছুটবে, তাদের আদর্শকে মানবে, তাদের বিজয় কামনা করবে, তবে কুরআনের কথায় যারা প্রত্যয়ী, একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, তারা ভুলেও কখনো ভুল লাইনে দাঁড়াবে না। বিভ্রান্তদের মিছিলে যাবে না, না-হক কথার শ্লোগান দিয়ে আসমান-জমিনের মালিকের রুদ্ররোষে পড়বে না। বিশিষ্ট নাগরিকদের, সুধীজনদের, বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত সমর্থনে তাদের প্রত্যয়নের মাধ্যমে মহাকৃর্তীমান ইত্যাদি হওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কুরআন প্রত্যয়ন না করলে দুনিয়া থেকে যাবার সময় লানত নিয়ে যেতে হবে; মৃত্যুর পর তার জন্য কত মানুষ কান্নাকাটি করেছে এসব কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। কুরআন প্রত্যয়ন করে না বলে একদল মানুষের মর্যাদা পশু কিংবা তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। অতএব কুরআন যে অন্তরের ব্যধিকে প্রকাশ করে দেয়, সেই অন্তরের সান্নিধ্য কামনা করা মুমিনের জন্য আত্মহত্যার শামিল।

কুরআনুল কারীমের উপর চোখ পড়লেই বারবার অসংখ্যবার চোখ পড়বে অবিশ্বাসীদের উপর। আবার পরক্ষণেই চোখ পড়বে বিশ্বাসীদের উপর। এইসব বিশ্বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাদের উপর চোখ পড়বে যারা বারবার মুমিনের নজর কেড়ে নেন। তারা হলেন জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর পথিক, মরণজয়ী মুজাহিদ।

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের রূপ কুরআনুল কারীমে তুলে ধরেছেন, বন্দেগীর যে পথই আমরা ধরি না কেন, কুরআনুল কারীমই বলে দেবে, পথের শেষ কোথায়? মুরব্বীরা এভাবে বলেন বা আমার মুর্শিদ এভাবে করেন; ইসলামের অনুসরনীয় নীতি এরকম নয় বিধায় নবীর ওয়ারিশরা কুরআনের দর্পনে পথ খুঁজেন। জানা পথের চেয়ে অজানা পথ বিপজ্জনক হওয়াই স্বাভাবিক। পথে চলতে গিয়ে অনেকেই এখন পথহারা। পথহারারাই এখন পথ দেখানোর দায়িত্ব নিয়েছে। লেবাস-সুরত এমন ধরেছে যে, একদল পতঙ্গ

তাদের অনুসারী হয়েছে। দ্বীনের সীমান্ত অতিক্রম করে যে চলে গেলো তার অনুসরণ কোথায় নিয়ে ফেলবে এটা বুঝতেই আমাদের সম্মানিত আলিম প্রমুখ শক্ত কথা বলেন এবং সত্যনিষ্ঠ মর্দে মুমিন উলামায়ে দ্বীন প্রকৃত নাম ধরে বাগীদের যখন হাঁক দেন, তখন আহত সাপের মতো ওরা দুমড়াতে থাকে, মোচড়াতে থাকে।

ঈমান-আমলের সাফল্যে জিহাদকে জরুরি করা হয়েছে

ঈমান আমলের হেফাজত করতে মুসলমানরা হিমসিম খাচ্ছে। কোনো রকম আপোষরফায় হয়তো তা সম্ভব হচ্ছে। তবে ঈমান আমলের সাফল্য বলতে যা বোঝায় তা এখন মুসলমানের হাতের নাগাল থেকে বহুদূর অবস্থান করছে। অথচ এই সাফল্যকে অর্জন করার জন্যই মুসলমানকে এতো মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে। এই সাফল্যকে অর্জন করার জন্যই প্রিয় মদিনাকে বারবার পেছনে রেখে সাহাবী সিপাহীগণ পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ছুটে গেছেন দূর-দূরান্তের একের পর এক সীমান্ত অতিক্রম করে। ঈমান-আমলের হেফাজতে তো মদীনা ছিলো অনন্য। সাফল্য যদি মদীনাকেন্দ্রিক যথেষ্ট হতো, তাহলে মদীনায় থাকা যথেষ্ট হত। কিন্তু সাফল্যের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত। শুধু পদব্রজে তৎকালীন পৃথিবীর এক অষ্টমাংশ অতিক্রম করে সাহাবীরা প্রমাণ করেছেন সেই সীমানা পৃথিবীর সকল প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

মুসলমানদের সাফল্য তার দ্বীনের সাফল্য। সাফল্য স্বপ্নে পাওয়া কোনো মহৌষধি নয় বরং তা অর্জন করতে হয় দয়াময়ের প্রদর্শিত পথের উপর অবিচল ও দৃঢ়পদ থেকে। হাজার হাজার বৎসরের মুষ্টিবদ্ধ তরবারিসহ রোম ও পারস্যের দুর্জয় ঘাঁটিকে মুসলমানের পায়ের নীচে রাখা সম্ভব হয়েছে। আর এখন পৃথিবীর পরাশক্তিরা কোন অস্ত্র নিক্ষেপ করে মুসলমানকে ধ্বংস করছে তারা তার নামও জানে না। ত্রিপলী, বাগদাদ, আফগানিস্তান বা সুদানে মিসাইল নিক্ষিপ্ত হলে কিছু মুসলমান আমেরিকার ও তার মিত্রদের শক্তি দেখে চোখে সর্ষেফুল দেখে, মুখে বিস্ময় প্রকাশ করে অন্তরে গর্ববোধ করে।

কারণ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তো বিশ্বেরই গৌরব! আর মুসলমানরা বিশ্বেরই বাসন্দিা। কর্তারা দয়া করে আমাদেরকে দর্শকের ভূমিকা থেকে এখনো বঞ্চিত করেনি এটাও কম ইহসান নয়।

ঈমান আমলের ব্যক্তিগত সাফল্যে কোনো উম্মতই সাহাবী আজমাইনের রা. সমকক্ষ হতে পারবে না। তারপরও মহৎপ্রাণ সাহাবীরা সাফল্য অর্জন করতে অকাতরে জীবন দান করেছেন।

মুসলমানের কামিয়াবীর জন্য জিহাদকে জরুরি করা না হলে প্রিয়নবীর সাহাবীরা জীবনভর এতো দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে পথে প্রান্তরে ছুটতেন না।

ঈমান-আমলের সাফল্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিতে নিহিত করা হয়েছে এবং এই কর্মসূচি থেকে পৃথিবীর এক ইঞ্চি জায়গাও অবিশ্বাসীর করতলে ছেড়ে দেবার অধিকার মুসলমানকে দেয়নি। মাথার সামনে তরবারি রেখে যারা নিদ্রা যাপন করেছেন তাঁদের উপর দয়াময় রাজি ছিলেন। তাঁদেরকে আকাশের নক্ষত্র বলেছেন প্রিয়নবী সা.। একমাত্র তাঁরাই আমাদের অনুসরণীয় পূর্বসূরি।

অন্তরের কলুষ ছড়াতে প্রতিদিন পত্র-পত্রিকা কত কালি ঝরায়, তা তো দেখছি সবাই। পাকিস্তানের আইনসভার শরীয়াহ আইন বিপুল ভোটে পাস হলে আমাদের পত্র-পত্রিকা সংবাদ দেয় *অস্তিত্ব বিপন্ন*। ৯০% পক্ষে এবং যারা অনুপস্থিত তারাও না-এর দলে নয়। তারপরও অস্তিত্ব বিপন্ন!? অতএব সমাধান তো সবজান্তারা দিচ্ছে, বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধি দিচ্ছে।

আমরা পথ পেয়েছি, এমন পায়ের চিহ্নকে চুম্বন করে, যাঁর অনুসরণ আমাদের কর্মেই নিহীত এবং সেই কর্মেই রয়েছে সমাধান। আমাদের একজন পিতৃপ্রতীম শ্রদ্ধেয় শুভাকাঙ্ক্ষী বলে থাকেন, আপনারা মনে করেন দুনিয়াতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আর কোনো পথ নেই, আপনারাই বুঝি সব বুঝেন আর সবাই অবুঝ কিছুই বুঝে না।

আসলেও অবুঝ হয়ে পড়েছি আমরা, আমরা অবুঝ হয়ে পড়েছি দয়াময়ের দেখানো পথের ঠিকানা বুঝে আসার পর। প্রিয়নবীর প্রিয়সাহাবীদের দুঃখ-কষ্টের জীবনকে বুঝে নেবার পর আমরা সত্যিই অন্যসব পথ থেকে মাহরূম হয়ে পড়েছি। অন্যবুঝ থেকে অবুঝ হয়ে পড়েছি দয়াময়ের অসীম বন্ধনে বাঁধা পড়ে।

আল্লাহর আইন থাকবে আর কোনো আইন থাকবে না। সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, পার্লামেন্টের নয়; জাতিসংঘের স্বীকৃতি নয়, আল্লাহর স্বীকৃতি চাই। আল্লাহর দ্বীন গালিব থাকবে, বাতিল পরাজিত থাকবে; এসব কথার প্রকাশ্য ঘোষণা ঈমান-আমলের কোনো মেহনতকারীই দিতে পারবে না যদি তার মধ্যে শাহাদাতের তামান্না না থাকে। ঈমান-আমলের পথকে জিহাদই সুরক্ষা করে, প্রশস্ত করে, তাই তা জরুরি হলে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। যার সাথে বাতিলের দ্বন্দ্ব নেই, অবিশ্বাসীর তফাৎ নেই, যার চোখ আছে দৃষ্টি নেই, কান আছে আওয়াজ নেই, অন্তর আছে বোধ নেই; যে কুরআন পড়ে বুঝেনি, তার জন্য জিহাদ নেই হাবিলের কাকও জানে, মুমিনের একথা অজানা নেই, জিহাদ ছাড়া অন্য পথে মুক্তি নেই।

ঈমান আমল রাখতে হলে লড়াই করে বাঁচতে হবে

যখনই মিছিল দেখি পথের পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি। গগণবিদারী চিৎকারে ওরা আকাশ–বাতাস প্রকম্পিত করে এগিয়ে চলে। বিক্ষুব্ধ শ্লোগানে সবাই যেন ফেটে পড়তে চায়। একটি শ্লোগান প্রায় সব মিছিলেই শুনতে পাই, *লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই।* কী আশ্চর্য, বাঁচার জন্য এরা লড়াই করতে চায়! অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য, বাসস্থানের জন্য মানুষকে লড়াই করতে হবে? কারা ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলো, ওদেরকে ছিন্নবস্ত্র করে দিলো, গৃহহারা করলো?

ওরা জানে না, যারা তাদের দ্বীনকে কেড়ে নিয়েছে তারাই ওদেরকে নিঃস্ব করেছে? মুসলমান নিঃস্ব হয় দ্বীনহারা হলে। আল্লাহপাক ইসলামকে মনোনীত করেননি এইজন্য, তার দ্বীনের অনুসারীরা ভিখারী হবে। তার দ্বীনকে কায়েম করলে কী হয় আর কী হয় না তাকে প্রত্যক্ষ করার জন্যই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেইশ বছরের নবুওয়াতি জীবনকে প্রমাণ হিসাবে রেখে গেছেন।

তাহলে ওরা মিছিল করে কেন? ওরা হয়তো এটাও জানে না, কেয়ামত পর্যন্ত মিছিল করেও, ভাত-কাপড়-বাসস্থানের জন্য লড়াই করেও ওদের ভাগ্য ওরা ফেরাতে পারবে না। চালকে আগুনের উপর ছেড়ে দিলে তা পুড়ে যাবে, ভাত হবে না। আগুন দিয়ে ভাত রান্না হয়, তবে তার জন্য পানি চাই। রান্নার প্রক্রিয়া চাই। বাঁচার জন্য লড়াই চাই, তবে সেই লড়াই বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে হওয়া চাই। জীবনধারণের জন্য, অন্নবস্ত্র বাসস্থানের জন্য লড়াই করা তার বান্দার শানের খেলাফ। বান্দাকে তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। অনেক বড় উদ্দেশ্যকে হাসিল করার জন্য বান্দাকে জীবন দান করেছেন। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ইত্যাদি পার্থিব বস্তু খড়কুটোর মতো পথের উপর পড়ে থাকে। লড়াই করে জগতের ভোগ্যপণ্য সংগ্রহ করলে মানবজন্মের অবমাননা হবে। মুমিনের পায়ের নিচে বস্তুজগত পড়ে থাকে। কখনো সে কিছু তুলে নেয়, কখনো তা ফেলে দেয়।

ভোগবাদী মানুষ আর পশুর মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। কুরআন কোনো কোনো মানুষকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট বলেছে। কেননা অবিশ্বাসী হওয়ার কারণেই তারা ভোগবাদী হয়েছে। যারা বিশ্বাস থেকে যতো দূরে, তারা পশুত্বের ততো নিকটে। অথচ এই ভোগবাদীরাই এখন মুসলমানের কাফেলাকে পথপ্রদর্শন করছে, এরাই এখন অগ্রপথিক।

কিছুলোক বেলুনের বিরাট খোলস দেখে সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে পার পাওয়ার স্বপ্ন দেখে। এই ফাঁকি দুনিয়ায় বুঝতে পারে বুদ্ধিমান মুমিনরা আর কেয়ামতে বুঝবে নির্বোধরা।

শুধু বাঁচার জন্য নয়- ইজ্জতের জন্য, ন্যায়বিচারের জন্য, নিরাপত্তার জন্য, সুখীজীবনের জন্য, দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবীর জন্য লড়াই করতে হবে এবং সেই লড়াই হবে একমাত্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ্ পাকের দ্বীনের মধ্যেই মানুষের সকল চাহিদা ও সাফল্যকে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ইসলাম মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে বলেই ইসলামকে পূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসাবে মেনে নিতে বলা হয়েছে। এই জীবনব্যবস্থার উপর যারা কায়েম থাকতে চান, তারা এখন হুমকির সম্মুখীন। দ্বীনকে পাথেয় করার ব্রত নিয়ে যারা *তালেবান*-তালেবুল ইলম হয়েছে, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার প্রস্তুতি চলছে সর্বত্র। কুরআনের পবিত্র দরসের আঙ্গিনাগুলোকে সংকুচিত করার কুপরামর্শ দিচ্ছে তাগুতের দূতরা।

ইসলামই আমাদের জীবনীশক্তি ও ইসলাম বিপন্ন হলে মুসলমানের মৃত্যু অনিবার্য; তাই লড়াই করতে হবে ইসলামের জন্য এবং এই লড়াই তাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যারা দ্বীনের ও দরসের আঙ্গিনায় অসহায়ের মতো আটকা পড়ে গেছে। যাদের নিরীহ জীবনযাপনের সুযোগে আল্লাহকে অমান্যকারীরা ও আল্লাহর

নির্দেশকে উপেক্ষাকারীরা অনেক প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষমান হয়ে আছে। দুনিয়ার শান্তিকে উপেক্ষা করে বহু পুণ্যবান পিতামাতা তাদের প্রাণপ্রতীম সন্তানকে তালেবে ইলম বানিয়েছেন না খেয়ে মারা যাবার জন্য নয়। বেঘোরে জীবন দেয়ার জন্য নয় অথবা তাড়া খেয়ে অপঘাতে মৃত্যুবরণ করার জন্য নয়। তাদেরকে পাঠানো হয়েছে ঈমানকে হেফাজত করার জন্য, আমলকে জীবনে লালন করার জন্য। ইবাদতকে এক ও অদ্বিতীয় মাবুদের জন্য নিশ্চিত করতে, দয়াময়ের দ্বীনকে বিজয়ী করতে। এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে তারা সমবেত হবে। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তারা লড়াই করবে এবং এই লড়াই তাদের জন্য জরুরি করেছেন আল্লাহ পাক নিজে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, *তোমরা মারো এবং মরো*।

ঈমানকে এখন দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করছি আমরা। যেখানে যে আকিদা পাওয়া যায় তাই খরিদ করে নিজের রঙ পাল্টে ফেলেছি বহু আগে। আমলের মধ্যে জঙ ধরেছে এতো বেশি, বেআমল হালতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে!

আসলে শয়তানকে একশত ভাগ কামিয়াব হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। আল্লাহ পাকের একনিষ্ঠ বান্দাদের কাছে সে ব্যর্থ। আর যাদের কাছে শয়তান পরাজিত হয়, তারা তালেবানে দ্বীন, তারা তালেবানে মাওলা। তাদের দ্বারা দ্বীন বিজয়ী হয়, তারাও কামিয়াব হয়। এটাই আল্লাহর ইচ্ছা, এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

পৃথিবীর মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম জঘন্য পাপ হলো কাবিল কর্তৃক হাবিলকে হত্যা। হাবিলের লাশকে কেমন করে গুম করবে সেই চিন্তায় কাবিল যখন অস্থির তখন আল্লাহ তা'আলা একটি কাক পাঠালেন তাকে নসিহত করতে। কাকটি একটি মৃত কাককে গর্ত খুড়ে মাটি-পাথর চাপা দিচ্ছিলো। এই দৃশ্য দেখে কাবিল অনুতপ্ত হয়ে বললো, *হায়! একটি কাকের বুদ্ধিও আমার নেই!* আজকের দুনিয়ায় যারা ইসলামকে কটাক্ষ করে, হেয় করে তাদের ওই কাকের বুদ্ধিটুকুও নেই। তাদেরকে উপলক্ষ করে এই

হাবিলের কাক